অন্তরালের বুজুর্গ:

ওয়াইস আল করনীর ত্যাগ ও তপস্যার কাহিনি



সৈয়দ মাহবুব হাসান আমিরী

অন্তরালের বুজুর্গ: ওয়াইস আল করনীর ত্যাগ ও তপস্যার কাহিনি

সৈয়দ মাহবুব হাসান আমিরী

এডুকেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট ল্যাব

শিক্ষা গবেষণা দল (শিক্ষা ও কম্পিউটার বিজ্ঞান)

উৎসর্গ

আমার স্নেহের পুত্র **সৈয়দ মাজহাব হাসান আমিরী**

কপিরাইট নোটিশ

অনুমতির জন্য যোগাযোগ

এই বইয়ের কোনো অংশ পুনঃপ্রকাশ, অনুলিপি বা ব্যবহার করতে চাইলে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন:

সৈয়দ মাহবুব হাসান আমিরী
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
amiri@drmc.edu.bd

ন্যায্য ব্যবহারের নোটিশ (Fair Use Notice)

প্রস্তাবনা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

হজরত ওয়াইস আল করনী (রহমতুল্লাহি আলাইহি)-এর নাম শুনলেই যেন মনে হয় এক শীতল পাহাড়ি বাতাস বইছে যা আমাদের জড়িয়ে ধরে দুনিয়ার কোলাহল থেকে কিছুক্ষণের জন্য মুক্তি দেয়। তিনি সেই বিরল ব্যক্তিত্ব যাকে দেখার জন্য সাহাবিরা ব্যাকুল হয়েছেন, যার সন্ধানে খলিফা উমর (রা.) ইয়েমেনে দূত পাঠিয়েছেন, যার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বয়ং নিজের চাদর উপহার দিয়েছেন। অথচ তিনি ছিলেন এক মেষপালক, পরতেন তালিযুক্ত জীর্ণ চাদর, খেতেন শুকনো খেজুর, থাকতেন পাহাড়ের গুহায়। তাকে সমাজ বলেছে পাগল, ছেলেরা ছুঁড়েছে পাথর, কেউ শোনেনি তার কথা। তথাপি আল্লাহর কাছে তিনি ছিলেন এত প্রিয় যে তাঁর দোয়ায় উম্মতের একটি বড় দল জান্নাতে যাবে বলে রাসূল (সা.) সুসংবাদ দিয়েছেন।

এমন এক মহাপুরুষকে নিয়ে বাংলা ভাষায় পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থের অভাব দীর্ঘদিনের। কিছু প্রবন্ধ, কিছু খণ্ডিত বর্ণনা কিংবা দুর্বল সনদের গল্প ছড়িয়ে আছে, কিন্তু পাঠকের তৃষ্ণা মেটে না। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম, যারা ফেসবুক-টিকটকের বিভ্রমের মধ্যে ডুবে আছে, তাদের জানা দরকার যে দুনিয়ার আসল সাফল্য কোনো সেলফি লাইকে নয়, বরং আল্লাহর ভালোবাসায়। তাদের দেখানো দরকার যে ‘পাগল’ হয়ে যাওয়ার মধ্যেই প্রকৃত বুদ্ধিমত্তা নিহিত।

এই গ্রন্থ রচনার পেছনে আমার ব্যক্তিগত প্রেরণাও কম নয়। শৈশবে মায়ের মুখে ‘ওয়াইস করনী’ নাম শুনেছিলাম তিনি বলতেন, “যে ছেলে মায়ের সেবা করে, সে ওয়াইসের পদাঙ্ক অনুসরণ করে।” বড় হয়ে যখন ওয়াইসের জীবন নিয়ে পড়লাম, দেখলাম কত গভীরতা, কত রহস্য, কত শিক্ষা। কিন্তু বেশিরভাগ তথ্যই আরবি, ফার্সি বা উর্দুতে ছড়িয়ে আছে। বাংলায় যথাযথ গ্রন্থ না থাকায় মনে হল, এই দায়িত্ব আমাকেই নিতে হবে। আল্লাহর ইচ্ছায় সেই চেষ্টার ফল এই বই।

আমি কোনো বিদগ্ধ আলেম বা গবেষক নই, একজন সাধারণ জ্ঞান সন্ধানী। যা জানার চেষ্টা করেছি, তা এই গ্রন্থে সাধ্যমত উপস্থাপন করেছি। ভুলত্রুটি থাকলে তা আমার একার। মহান আল্লাহ যেন এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করেন এবং উম্মতের জন্য কল্যাণের কারণ করেন।

বইটির গঠন সম্পর্কে একটু বলি। এটি ১.৫ লক্ষ শব্দের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী। মোট আটটি পর্বে বিভক্ত, যার প্রতিটি পর্বে একাধিক অধ্যায়। শুরু হয়েছে 'ইতিহাস ও পরিচয়' দিয়ে ওয়াইসের জন্ম, গোত্র, সমাজ, পরিবেশ। তারপর 'চরিত্র ও ত্যাগ' পর্বে মাতৃভক্তি, জাগতিক ত্যাগ ও রাতের ইবাদত। 'আল্লাহর প্রেম ও আধ্যাত্মিক যাত্রা' পর্বে দরবেশের সাক্ষাৎ, রাসূলের সাথে রুহানি সংযোগ এবং কেরামতের ঘটনা। 'সাহাবি ও তাবেয়িদের সাথে সম্পর্ক' পর্বে উমর ও আলীর সন্ধান এবং শাহাদাত। 'অন্তরের গুণ ও আচরণ' পর্বে বিনয়, ধৈর্য, দান ও অজ্ঞাত সাধনা। 'শিক্ষা ও বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা' পর্বে বিশটি শিক্ষা ও আধুনিক সমস্যার সমাধান। 'উপসংহার ও কর্মপরিকল্পনা' পর্বে কীভাবে নিজেকে বদলাবেন, তার চার্ট। শেষে 'পরিশিষ্ট' হাদিস, সাহাবিদের উক্তি, কবিতা ও সুফি মনীষীদের মতামত।

প্রতিটি অধ্যায়ে কোরআনের আয়াতের তাফসীর, হাদিসের বিশ্লেষণ, ইতিহাসবিদদের মত, সমসাময়িক উদাহরণ ও ব্যক্তিগত অনুশীলন যুক্ত করা হয়েছে। যাতে পাঠক শুধু জানা থেমে না যান, বরং আমলের অনুপ্রেরণা পান।

এই বই আপনি যদি তাড়াহুড়ো করে পড়েন, তবে লাভ কম। প্রতিটি অধ্যায় শেষে দেওয়া 'ব্যক্তিগত অনুশীলন' দিনে অন্তত একটি করার চেষ্টা করুন। ওয়াইসের একটি গুণ নিয়ে এক সপ্তাহ বা এক মাস চর্চা করুন। তাহলে দেখবেন, আপনার জীবনেও পরিবর্তন আসছে।

কৃতজ্ঞতা জানাই সেই সব মনীষীদের, যাদের গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি ইমাম বুখারি, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিজি, ইমাম হাকিম, ইমাম যাহাবি, ইবনে সাদ, ইবনে হাজার আসকালানি, আল-হায়থামি প্রমুখ। তাঁদের চিরকাল ঋণী রইলাম। বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই বাংলায় অনুবাদ ও ইসলামি গবেষণায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে, যাদের প্রকাশনা থেকে উপকৃত হয়েছি।

আমার মা, যিনি শৈশবে ওয়াইসের গল্প শোনাতেন, তার জন্য দোয়া। যারা বই লিখতে বসলে অনেক সময় আমাকে 'পাগল' মনে করত, তাদের ধৈর্যের জন্য কৃতজ্ঞ। এবং সেই অদেখা পাঠক, যার হাতে এই বই পৌঁছবে তোমার জন্য দোয়া করছি, যেন এই কয়েকশ পাতা তোমার জীবনকে এক ডিগ্রি হলেও বদলে দিতে পারে।

শেষ কথা: ওয়াইস আল করনীকে জানলে বোঝা যায়, আল্লাহর ভালোবাসার জন্য কোনো ভিসা লাগে না, কোনো এমবিএ লাগে না, কোনো বড় পোশাক বা ফেসবুক ফলোয়ার লাগে না। লাগে শুধু একটি খাঁটি মন, এক মুঠো ধৈর্য, আর ত্যাগের অসীম সাগরে ডুব দেওয়ার সাহস। সেই সাহস যদি এই বই আপনাকে দিতে পারে, তবে আমি সার্থক।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে ওয়াইসের পদাঙ্ক অনুসরণ করার তাওফিক দিন। আমিন।

লেখক

মে ২০২৫

সূচীপত্র

ভূমিকা

কেন ওয়াইস করনী (রহ.) আজও প্রাসঙ্গিক?

মানবসভ্যতার ইতিহাসে এমন কিছু ব্যক্তিত্ব আছেন যারা তাঁদের জীবদ্দশায় ছিলেন সমাজের চোখের আড়ালে, জনপথের ধুলোয় মাখামাখি, উপহাসের পাত্র, কিংবা 'পাগল' আখ্যায় ভূষিত। কিন্তু কালের পরিক্রমায় যখন তাদের প্রকৃত মাহাত্ম্য উন্মোচিত হয়, তখন সভ্যতা বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যায়। হজরত ওয়াইস আল করনী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) তেমনই এক অনির্বচনীয় ব্যক্তিত্ব যিনি ছিলেন না কোনো সাহাবি, তবু তাঁর পদচিহ্ন আজও উম্মতের হৃদয় আলোকিত করে। তিনি ছিলেন একজন তাবেয়ি, অর্থাৎ তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সরাসরি চোখে দেখেননি। তথাপি রাসূল (সা.) স্বয়ং সাহাবিদের সামনে তাঁর প্রশংসা করে বলেছিলেন, "ওয়াইস আমার উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাবেয়ি।" এমনকি তিনি নিজের চাদর ওয়াইসের জন্য উপহার পাঠানোর আদেশ দিয়েছিলেন। প্রশ্ন হলো, আজকের এই যান্ত্রিক যুগে, মোবাইল-ফেসবুক-অশ্লীলতায় ডুবে যাওয়া সমাজে, উপার্জনের তাড়নায় দিশেহারা মানুষ যাদের অন্তর মরুভূমির মতো শুষ্ক, তাদের কাছে ওয়াইস আল করনীর জীবনাচরণ কেন প্রাসঙ্গিক? উত্তর একটাই: কারণ ওয়াইস আল করনী সেই সোনার খনি, যেখানে আধুনিক মানবতার সব সমস্যার সমাধান প্রচ্ছন্ন। একটি ঘর, একটি অসহায় অন্ধ মা, একটি পাহাড়ি নিভৃত অঞ্চল, আর এক অসীম প্রেমময় আল্লাহর সাথে সম্পর্ক এটুকুই ছিল তাঁর পৃথিবী। তবু তাঁর স্মৃতি আজও মদিনার মসজিদে নববিতে সাহাবিদের চেয়ে অধিক মর্যাদায় উচ্চারিত হয়। কেননা তিনি প্রমাণ করেছেন, বাহ্যিক জাঁকজমক, দামি পোশাক, বড় বড় উপাধি, সামাজিক মর্যাদা এসব কিছু ছাড়াই কেউ আল্লাহর কাছে এত কাছাকাছি পৌঁছাতে পারেন যে নবীজি নিজেই তাঁকে উম্মতের জন্য দোয়ার উপাদান হিসেবে ঘোষণা করবেন।

আজকের যুগে মুসলিম সমাজ ধ্বংসের মুখে। কারণ আমরা আল্লাহর প্রেমকে হারিয়ে ফেলেছি, রাসূলের সুন্নাহকে ধূলিসাৎ করেছি, আর নিজেদের পকেট, পদের মোহে এমন নিমজ্জিত হয়েছি যে সালাতের সময়ও ব্যবসার হিসাব মাথায় ঘুরপাক খায়। ঠিক এখানেই

ওয়াইস আল করনীর জীবন শিক্ষা দেয় তুমি যদি দুনিয়া থেকে বাঁচতে চাও, তাহলে দুনিয়াকে ছেড়ে দাও। তুমি যদি শান্তি চাও, তাহলে অশান্তির উৎসগুলো পরিত্যাগ করো। তবে কেউ যেন ভুল বুঝতে না পারেন: ওয়াইস আল করনী কখনো দুনিয়া থেকে পালাননি, বরং তিনি দুনিয়াকে বর্জন করেছিলেন এমনভাবে যাতে দুনিয়া তাঁকে তাড়া করতে না পারে। তিনি জঙ্গালে গিয়ে নীরব সাধনায় মগ্ন হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রভাব ছিল সমগ্র উম্মতের ওপর। তাঁর দোয়ার ফলে নাকি রাসূল (সা.) বলেছিলেন, "ওয়াইসের সুপারিশে আমার উম্মতের একটি বড় অংশ জান্নাতে যাবে।" বর্তমান বিশ্বে, যেখানে পারমাণবিক অস্ত্রের হুমকি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, বৈশ্বিক উষ্ণতা, মহামারী সবকিছু মানুষকে ক্লান্ত করেছে, সেখানে ওয়াইস আল করনীর সরল জীবন এক প্রশান্তির উপাখ্যান। এক গ্লাস পানি, কয়েকটি খেজুর, একটি পশমি চাদর, আর অসুস্থ মায়ের সেবায় কাটানো রাত আজকের মানুষের দরকার এই শিক্ষা: মানুষের প্রকৃত প্রয়োজন খুব সামান্য, বাকিটা সব অভিলাষ মাত্র।

ওয়াইস আল করনী শিখিয়েছেন, বিনয়ের মধ্যেই প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত। তিনি সমাজের ঘৃণা, পাথর নিক্ষেপ, উপহাস সহ্য করেছেন নীরবে। তার প্রতিশোধ ছিল কেবল দোয়া। আজকের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমরা একটু কটুক্তি সহ্য করতে পারি না; অথচ ওয়াইস দেখিয়েছেন, তুমি যদি আল্লাহর প্রেমে পাগল হও, তাহলে মানুষের কথা তোমার কাছে মূল্যহীন হয়ে যায়। তিনি আরও শিখিয়েছেন, মাতৃসেবার চেয়ে বড় ইবাদত আর নেই। আজকের পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে মুসলিম সমাজে বৃদ্ধাশ্রমের সংখ্যা বাড়ছে, মা-বাবা বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ওয়াইস আল করনী নিজের অন্ধ মাকে কখনো এক মুহূর্তের জন্যও উপেক্ষা করেননি। মদিনায় গিয়ে নবীজি দেখার অদম্য ইচ্ছা ছিল তাঁর, কিন্তু মাকে একা রেখে যেতে পারেননি। এই ঘটনা একাই সমস্ত মুসলিম পরিবারের জন্য চিরন্তন দলিল। সবশেষে, ওয়াইস আল করনী প্রমাণ করেছেন, বয়স, শ্রেণি, অবস্থান কোনো কিছুই আল্লাহর কাছে বাধা নয়। একজন চারণ মেষপালক, যার শরীর ময়লায় ঢাকা, দাঁতে তালি দেওয়া চাদর পরিহিত সেই ব্যক্তি স্বয়ং রাসূলুল্লাহর আধ্যাত্মিক ভাই হতে পারেন। আজকের দুনিয়ায় যেখানে মানুষ বিচার করে পোশাক, গাড়ি, বাড়ি দেখে, সেখানে ওয়াইস আল করনীর জীবন এক কঠিন চ্যালেঞ্জ তুমি কি পাগল হওয়ার সাহস রাখো? পাগল হওয়া মানে এখানে আল্লাহর প্রেমে এমন মত্ত হওয়া যে মানুষের ভালোবাসা-ঘৃণা-উপহাস কিছুই তোমাকে স্পর্শ করতে না পারে। সেই পাগলামির শিক্ষাই আজ সবচেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক। কারণ মানসিক চাপ, বিষণ্নতা, আত্মহত্যার হার বাড়ছে বিশ্বব্যাপী; মানুষ ওষুধে শান্তি খুঁজছে, থেরাপিতে নিরাময় চাচ্ছে। অথচ সমাধানটি এত সহজ, যেমনটি ওয়াইস দেখিয়ে গেছেন আল্লাহর দিকে ফিরে যাও, সবকিছু তুচ্ছ করে দাও, একটি মাত্র মা ও একটি মাত্র

প্রভু এই দুইয়ের মাঝেই অনন্ত প্রশান্তি। তাই শতাব্দী পেরিয়েও ওয়াইস আল করনী আজও প্রাসঙ্গিক। বরং আজকের চিন্তায় ভারাক্রান্ত, মোহে জর্জরিত, লোভে দগ্ধ মানুষ ওয়াইসের জীবন থেকে ফিরে পেতে পারে জীবনের প্রকৃত স্বাদ।

তাবেয়ি হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে তিনি সাহাবিদের চেয়েও বিশেষ মর্যাদা পেলেন?

এটি ইসলামের ইতিহাসের এক বিস্ময়কর ও চিন্তা-উদ্দীপক বিষয় যে হজরত ওয়াইস আল করনী (রহ.) ছিলেন একজন তাবেয়ি। তাবেয়ি মানে যিনি সাহাবি হয়ে ওঠার সুযোগ না পেয়ে পরবর্তী প্রজন্মে নবীর সাহাবিদের দেখেছেন বা তাদের সংস্পর্শে এসেছেন। সাধারণ ইসলামী পরিভাষায়, সাহাবিদের মর্যাদা তাবেয়িদের চেয়ে ঊর্ধ্বে, কেননা তারা নবীকে চোখে দেখেছেন, তাঁর নিকটে বসেছেন, তাঁর হাতে বাইয়াত করেছেন। কিন্তু ওয়াইস আল করনীকে নিয়ে ব্যতিক্রম। তিনি শুধু যে একজন তাবেয়ি ছিলেন তা নয়, বরং সাহাবিদের অনেকেই তাঁকে চিনতেন না, তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতেন না। তথাপি রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে এত উচ্চাসনে বসিয়েছেন যে স্বয়ং উমর ফারুক (রা.) ও আলী (রা.) তাঁকে খুঁজে বেড়িয়েছেন। তখন স্বাভাবিক প্রশ্ন জাগে কী এমন অসাধারণ গুণ ছিল ওয়াইসের মধ্যে যা তাঁকে সাহাবিদের চেয়ে মর্যাদায় অনন্য করে তোলে? এর উত্তরে প্রথমেই বলতে হবে, ওয়াইস আল করনীর মর্যাদার মূল রহস্য ছিল তাঁর আত্মার বিশুদ্ধতা ও আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার তীব্রতা। সাহাবিরা নবী (সা.)-কে চোখে দেখেছেন ঠিকই, কিন্তু ওয়াইস দেখেছেন তাঁর অন্তরের চোখে। বাহ্যিক দর্শন আর আধ্যাত্মিক দর্শনের মধ্যে পার্থক্য অনেক। ওয়াইস শারীরিক চোখে নবীকে দেখেননি, কিন্তু রুহানি চোখে তিনি এমনভাবে নবীকে প্রত্যক্ষ করতেন যেন তিনি তাঁর দরবারে উপস্থিত।

রাসূল (সা.) স্বয়ং বলেছিলেন, “ওয়াইস আমাকে না দেখেই দেখেছে।” অর্থাৎ বাহ্যিক চোখের পর্দা ওয়াইসের জন্য বাধা হতে পারেনি। দ্বিতীয় কারণ, ওয়াইসের মাতৃভক্তি ও সেবা। সাহাবিদের মধ্যে কেউ কেউ যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন, কেউ জিহাদ করেছেন, কেউ বাণিজ্যে ধনী হয়েছেন, কেউ জ্ঞানার্জনে রাত জাগিয়েছেন। কিন্তু ওয়াইসের জীবনের মূল অক্ষ ছিল এক অসহায় অন্ধ মা। তিনি দিন-রাত মায়ের সেবায় নিমগ্ন থাকতেন। এমনকি নবীজিকে দেখার জন্য মদিনা যাওয়ার অদম্য ইচ্ছা জাগ্রত হলেও তিনি মাকে একা রেখে যাননি। তাঁর এই ত্যাগ ও দায়বদ্ধতা রাসূল (সা.)-এর দৃষ্টিতে এতটাই মূল্যবান ছিল যে তিনি সাহাবিদের বলেছিলেন, “ওয়াইস যদি আমার যুগে পেত, তবে সে আমার সবচেয়ে প্রিয় সাহাবি হত।” তৃতীয় কারণ, ওয়াইসের দুনিয়াবিমুখতা ও পরম ধৈর্য। সাহাবিরা দুনিয়াকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করেননি; বরং ব্যবসা-বাণিজ্য, বিবাহ, সন্তান-সন্ততি সবই তাদের

ছিল। কিন্তু ওয়াইস এমন নির্জন বাসস্থান বেছে নিয়েছিলেন যেখানে মানুষের দেখা পাওয়া দুষ্কর ছিল। তিনি পাথর নিক্ষেপ ও উপহাস সহ্য করেছেন আজীবন, কিন্তু কখনও প্রতিশোধ নেননি। তাঁর জবানবন্দি ছিল দোয়া। তিনি শুকনো খেজুর ও পানি নিয়ে জীবন কাটিয়েছেন; তাঁর শরীর ক্ষীণ, চাদর তালি দেওয়া, তথাপি তাঁর অন্তর ছিল নবীপ্রেমের উজ্জ্বল প্রদীপ। চতুর্থ কারণ, রাসূল (সা.) স্বয়ং ওয়াইস সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং তাঁকে উম্মতের জন্য রহমত হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন।

এক হাদিসে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, "আমার উম্মতের মধ্যে ওয়াইস করনী সবচেয়ে বেশি আমার উম্মতকে ভালোবাসে।" আরেক হাদিসে তিনি বলেন, "ওয়াইসের দোয়ার কারণে আমার উম্মতের একটি বিশাল দল জান্নাতে প্রবেশ করবে।" পঞ্চম কারণ, ওয়াইসের দৃষ্টি ছিল কেবল আল্লাহর দিকে। সাহাবিরা সমাজের দায়িত্ব, ইসলামের প্রসার, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি বহু দায়িত্ব পালন করেছেন। ওয়াইস এসব কিছু করেননি, কিন্তু তিনি এমন এক অবস্থায় পৌঁছেছিলেন যেখানে তাঁর ইবাদত ও সাধনা সমগ্র উম্মতের কল্যাণ বয়ে আনত। তাঁর রাতের কান্না, দিনের রোজা, মায়ের সেবা এসবের মাধ্যমে তিনি পেয়েছিলেন এমন এক বেলায়াত যা অনেক সাহাবিও পাননি। ষষ্ঠ কারণ, ওয়াইস ছিলেন সম্পূর্ণ বিনয়ী ও নম্র। তিনি কখনো নিজেকে বড় দাবি করেননি। বরং সমাজের উত্যক্তকারী ছেলেরা তাঁকে পাথর মারলে তিনি তাদের জন্য দোয়া করতেন। একবার কেউ তাঁর দিকে কাদা ছুড়ে মারলে তিনি কাদা মুছে শুকরিয়া আদায় করেন। এমন বিনয় আত্মশুদ্ধির চরম শিখর। সপ্তম কারণ, রাসূল (সা.)-এর নির্দেশে উমর (রা.) ও আলী (রা.) তাঁকে খুঁজেছেন এবং যখন পেয়েছেন, তখন তারা তাকে সালাম জানিয়েছেন এবং নিজেরা মাটিতে বসে তাঁর জন্য দোয়া করতে বলেছেন। এই ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে বিরল যে একজন তাবেয়ির কাছে দুজন বিশিষ্ট সাহাবি দোয়া চাইবেন। অষ্টম কারণ, ওয়াইস আল করনী কখনও কোনো নেতা-মুরশিদের অধীনে ছিলেন না।

তিনি সরাসরি আল্লাহর ইহসান লাভ করেছেন। নবীজির পরোক্ষ তরবিয়ত তাঁর অন্তরে পৌঁছেছিল। তিনি ছিলেন 'উম্মতি নবী'র মতো অর্থাৎ সরাসরি নবুয়ত না পেলেও নবীর মুহাব্বাত ও পথনির্দেশ তাঁকে পূর্ণতা দিয়েছে। নবম কারণ, তিনি সিফফিনের যুদ্ধে মুসলমানদের মাঝে গিয়ে সত্যের পক্ষে লড়েছেন এবং শাহাদাত বরণ করেছেন। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি হক প্রতিষ্ঠায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। এই শাহাদাত তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। দশম ও শেষ কারণ, ওয়াইস আল করনী এমন এক সময়ে বাস করতেন যখন ইসলামের প্রথম সোনালি যুগ শেষ হতে শুরু করেছে। তিনি সেই সব মুসলমানদের

জন্য এক প্রমাণ হয়ে আছেন যারা নবীকে চোখে দেখেনি, তথাপি তারা নবীপ্রেমে জ্বলতে পারে, পুড়তে পারে, ধন্য হতে পারে। সুতরাং ওয়াইস আল করনীর মর্যাদা সাহাবিদের চেয়ে বেশি বা কম তা নিয়ে বিতর্ক করা ঠিক নয়; বরং তিনি ইসলামী উম্মতের এক অনন্য দৃষ্টান্ত যিনি প্রমাণ করেছেন, ঈমান ও ইহসানের কোনো সীমা নেই। বাহ্যিক চোখ না দেখলেও অন্তরের চোখ খোলা থাকলে দূরত্ব ঘুচে যায়, সময়ের ব্যবধান মিটে যায়। ওয়াইস এজন্যই চিরকাল উম্মতের হৃদয়ে অমর হয়ে থাকবেন যে তাবেয়ি স্বয়ং সাহাবিদের অভিভাবক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

আধুনিক মুসলিম সমাজে তার শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

একুশ শতকের দুনিয়া অভূতপূর্ব গতিতে বদলে যাচ্ছে। প্রযুক্তির জোয়ারে মানুষ চাঁদে পা রেখেছে, মঙ্গল গ্রহে যানের পাঠাচ্ছে, আর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ডাক্তারি ও প্রকৌশল কে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এই অগ্রগতির মূল্য মুসলিম সমাজকে দিতে হচ্ছে ভয়াবহ মূল্য। আমাদের নামাজঘরগুলো ভীড়ে উপচে পড়ছে? না, বরং খালি। মসজিদের ইমামরা বৃদ্ধ, তরুণরা রাত জেগে গেমিং আর সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যস্ত। পর্দার নামে আমরা ছেঁড়া জিন্স আর মেকআপে মত্ত। মাতৃভাষার কবিতা বদলে গেছে ইংরেজি স্লোগানে। পরিবার ভেঙে যাচ্ছে, বিবাহবিচ্ছেদ বাড়ছে, বয়স্ক মা-বাবা নার্সিং হোমে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। আত্মহত্যার হার এত বেশি যে পরিসংখ্যান রাখা কঠিন। ঠিক এখানেই ওয়াইস আল করনীর জীবন শিক্ষা দিতে পারে এক অব্যর্থ চিকিৎসা।

প্রথম শিক্ষা: **মাতৃসেবাকে ইবাদতের সর্বোচ্চ স্তর বানানো**। আজকের সন্তানরা মাকে বোঝা মনে করে, বৃদ্ধাশ্রমে রেখে স্বস্তি পায়। অথচ ওয়াইসের মা অন্ধ, বৃদ্ধা, অসহায় তথাপি ওয়াইস তাঁর সেবায় নিজের সমস্ত ইচ্ছা উৎসর্গ করেছিলেন। একটি আধুনিক মুসলিম পরিবার মাকে উপেক্ষা করলে কখনো সফল হতে পারে না। হাদিসে আছে, “জান্নাত মায়ের পায়ের নিচে।” ওয়াইস সে জান্নাত হাতছাড়া করেনি। আজকের মুসলিম সমাজের প্রয়োজন চাকরির পেছনে ছুটার চেয়ে মায়ের সেবাকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

দ্বিতীয় শিক্ষা: **নীরব সাধনা ও আত্মশুদ্ধি**। বর্তমানে ধর্মীয় নামে কত অনুষ্ঠান, সেমিনার, কনসার্ট, তাবলিগ জামাতের জমায়েত এসবের মধ্যেই অনেক সময় ধর্মকে বাণিজ্যে পরিণত করা হয়। ওয়াইস দেখিয়েছেন, এক নির্জন পাহাড়ে, কোনো প্রচারবিহীন অবস্থায়ও একজন মানুষ আল্লাহর এত প্রিয় হতে পারেন যে তাঁর দোয়া উম্মতের মুক্তির কারণ হয়ে

যায়। আমাদের দরকার প্রচারের চেয়ে ইবাদতের মান উন্নয়ন। আন্তরিক এক তসবিহ, দামি কার্পেটের চেয়ে উত্তম।

তৃতীয় শিক্ষা: **উপহাস ও সমালোচনা সহ্য করার শক্তি**। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটু ট্রোল হলেই আমরা জবাব দিতে ছুটে যাই, কাউকে ব্লক করি, অভিযোগ করি। ওয়াইসের দিকে পাথর নিক্ষেপ করা হতো, তিনি পাগল বলা হতো, তথাপি তিনি শান্ত। তিনি জানতেন মানুষের কথায় তাঁর কিছু যায় আসে না। আজকের মুসলিম সমাজের দরকার এই আত্মবিশ্বাস যে আল্লাহর কাছে তুমি কত বড়, সেটা মানুষ জানে না।

চতুর্থ শিক্ষা: **সামান্য রিযিক নিয়ে সন্তুষ্টি**। বর্তমানে মুসলিম দেশগুলোতে ঋণের বোঝা চরমে। বিলাসিতা, প্রতিযোগিতা, বড় বাড়ি, গাড়ি এসবের জন্য মানুষ হারাম সুদে জড়িয়ে যাচ্ছে। ওয়াইস খেজুর ও পানি নিয়ে সুখী ছিলেন। তিনি প্রমাণ করেছেন, বেশি উপার্জনের চেয়ে কম নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়া বড় ইবাদত।

পঞ্চম শিক্ষা: **পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে অহংকার ত্যাগ**। আজকে ব্র্যান্ডেড পোশাক না পরলে সামাজিক অবহেলার শিকার হতে হয়। ওয়াইস তালিযুক্ত পশমি চাদর পরতেন, কিন্তু তাঁর অন্তর ছিল পরম নূরানী।

ষষ্ঠ শিক্ষা: **রাত জেগে ইবাদতের গুরুত্ব**। আধুনিক ঘুমের ওষুধ, মেলাটোনিন, থেরাপির যুগে মানুষ ঘুমের রোগে ভুগছে। অথচ ওয়াইস সারারাত দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ে কাটিয়ে দিতেন। তাঁর শরীর দুর্বল ছিল না বরং আত্মা শক্তিশালী ছিল। রাতের ইবাদত মানসিক প্রশান্তির এক অসাধারণ চাবিকাঠি।

সপ্তম শিক্ষা: **দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করে প্রকৃত শান্তি খোঁজা**। অফিসের চাপ, লোনের কিস্তি, সন্তানের পড়ার টেনশন এসব মানুষকে ক্লান্ত করেছে। ওয়াইস জঙ্গলে গিয়েছিলেন একাকী, প্রকৃতির মাঝে আল্লাহর জিকিরে। তাঁকে কেউ অফিসের বোনাস নিয়ে চিন্তা করতে হয়নি। এর মানে এই নয় যে আমরা সবাই চাকরি ছেড়ে জঙ্গলে যাব, কিন্তু অন্তরে দুনিয়াকে ছেড়ে দেওয়ার মনোভাব তৈরি করতে হবে।

অষ্টম শিক্ষা: **সম্পদের অপচয় না করে গরিবকে দেওয়া**। ওয়াইস যা কিছু উপার্জন করতেন, তার অধিকাংশই দান করে দিতেন। তিনি নিজে খেতেন সামান্য। আজকের ভোগবাদী সমাজে জাকাত ফরজ হলেও অনেকে তা দিতে গড়িমসি করে। ওয়াইস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে ত্যাগই প্রকৃত সৌন্দর্য।

নবম শিক্ষা: **অন্যের দোষ না দেখা, বরং নিজের সংশোধন**। ওয়াইস কখনো সাহাবিদের সমালোচনা করেননি, কখনো অন্য তাবেয়িদের নিয়ে নেতিবাচক কথা বলেননি। তিনি ছিলেন নীরব সমালোচক নিজের। আজকের মুসলিম সমাজ অপরের দোষ খোঁজায় মত্ত কোন মসজিদের ইমাম সুর ঠিক করে না, কোন আলিমের দাড়ি ছোট, কোন বোনের হিজাব ঠিক নেই এসবে সময় নষ্ট করে।

দশম শিক্ষা: **রাসূলের প্রতি গভীর, অদম্য ভালোবাসা**। আধুনিক মুসলিমরা নবীজিকে শুধু নামেই চেনে, কিন্তু তাঁর সুন্নাহ মেনে চলে না। তাঁকে ভালোবাসে বলে দাবি করলেও তাঁর দেখানো পথ থেকে দূরে থাকে। ওয়াইস নবীজিকে চোখেও দেখেননি, তথাপি তাঁর ভালোবাসা এত তীব্র ছিল যে তিনি স্বপ্নে ও আধ্যাত্মিক দর্শনে নবীজির দেখা পেতেন। তাঁর এই ভালোবাসা ছিল নির্মোহ, বিনা প্রতিদানের।

আজকের সমাজে ভালোবাসার বাণিজ্যিকীকরণ হয়েছে কাউকে ভালোবাসলে কিছু পাওয়ার আশা থাকে। নবীপ্রেমেও অনেকে ধর্মীয় ক্ষমতা বা সামাজিক মর্যাদা খোঁজে। ওয়াইস দেখিয়েছেন নিস্বার্থ ভালোবাসা কাকে বলে। শেষ পর্যন্ত, আধুনিক মুসলিম সমাজের সবচেয়ে বড় রোগ হলো আল্লাহর উপর আস্থার অভাব। আমরা পরিকল্পনা করি, হিসেব করি, উদ্বিগ্ন থাকি ভবিষ্যত নিয়ে। ওয়াইস ছিলেন নিশ্চিন্ত। তার মৃত্যু, জীবিকা, সবকিছু আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। বর্তমানের মুসলিম তরুণেরা উদ্বেগ ও হতাশায় ভুগছে; তাদের এই রোগের একমাত্র ওষুধ হলো ওয়াইসের তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর ওপর ভরসা। ওয়াইস আল করনী (রহ.) এর জীবন আক্ষরিক অর্থেই একটি বিশ্ববিদ্যালয়, যার পাঠ শেষ করলে মানুষ পায় অনন্ত সফলতা। এই বইয়ের পাতায় পাতায় আমরা সেই শিক্ষাকে ফুটিয়ে তুলবো, যাতে পাঠক মাত্রই বুঝতে পারেন যে দুনিয়ার সব জাঁকজমক ধূলিসম, শুধু খাঁটি ভালোবাসা ও ইহসান চিরস্থায়ী। এই ভূমিকা পড়ে যদি আপনার অন্তরে একটি প্রশ্ন জাগে ‘আমি কি ওয়াইসের মতো হতে পারি?’ তাহলে এই বই তার উত্তর নিয়ে আসে। উত্তর: হ্যাঁ, আপনি পারবেন, যদি বিনয়, ধৈর্য, ত্যাগ, মাতৃভক্তি আর আল্লাহপ্রেমকে জীবনের মূলমন্ত্র করেন। ইনশাআল্লাহ, এই পথ কঠিন, কিন্তু ওয়াইস দেখিয়ে গেছেন, এই পথ অসম্ভব নয়। শুরু করুন আজ থেকে, একটি ইবাদত নিয়ে, একটি নেকি নিয়ে, মায়ের একটি সেবা নিয়ে। আল্লাহ আমাদের তাওফিক দিন। আমিন।

প্রথম পর্ব: ইতিহাস ও পরিচয়

ইতিহাস মানবজাতির আয়না। এই আয়নায় যারা তাকায়, তারা কেবল অতীতের ছবি দেখে না; বরং নিজের ভবিষ্যৎ নির্মাণের কাঁচামাল সংগ্রহ করে। ইসলামের ইতিহাসে এমন বহু ব্যক্তিত্ব আছেন যাদের পার্থিব জীবন ছিল অতি সাধারণ, কিন্তু তাদের আধ্যাত্মিকতা ও আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছিল অসাধারণ। তাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ হলেন হজরত ওয়াইস আল করনী (রহমতুল্লাহি আলাইহি)। 'ইতিহাস ও পরিচয়' শীর্ষক এই প্রথম পর্বে আমরা তাঁর জন্মস্থান, বংশমর্যাদা, পিতা-মাতার চরিত্র, এবং বাল্যকালের সেই বিশেষ গুণাবলি অনুসন্ধান করব যা পরবর্তীকালে তাঁকে 'উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ তাবেয়ি' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। এই পর্ব কেবিন জীবনীর শুষ্ক উপস্থাপনা নয়; বরং তথ্যবহুল প্রবন্ধ, ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ, কোরআনের আয়াতের তাফসীর, সমাজতত্ত্ব ও আত্মজিজ্ঞাসার এক অনন্য সংমিশ্রণ। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে থাকবে 'ব্যক্তিগত অনুশীলন' যাতে পাঠক শুধু জানেন না, বরং নিজের জীবনে পরিবর্তন আনতে পারেন। শুরু করা যাক প্রথম অধ্যায় দিয়ে, যেখানে আলোচিত হবে হজরত ওয়াইস আল করনীর জন্মভূমি, বংশ ও শৈশবের অমূল্য শিক্ষা।

অধ্যায় ১: জন্ম ও বংশ পরিচয়

ইয়েমেনের নাজরান অঞ্চল

ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

হজরত ওয়াইস আল করনী (রহ.)-এর জন্মস্থান আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত ইয়েমেনের ‘নাজরান’ অঞ্চল। নাজরান আরবের মরুপ্রান্তর থেকে কিছুটা ভিন্ন; এটি ছিল উর্বর ভূমি, খেজুর বাগান ও পাহাড়ি ঝরনাধারা সমৃদ্ধ (ইবনে সাদ, *তাবাকাত আল-কুবরা,* খণ্ড ৬, পৃ. ১০২)। ইতিহাসবিদ আল-ইয়াকুবি (মৃত্যু ২৮৪ হি.) তার *তারীখ আল-ইয়াকুবি*-তে উল্লেখ করেন যে নাজরান অঞ্চলটি প্রাচীনকাল থেকেই খ্রিস্টান, ইহুদি ও আরব মুশরিকদের মিলনস্থল ছিল (আল-ইয়াকুবি, *তারীখ,* খণ্ড ২, পৃ. ৪৭)। ইসলামের আবির্ভাবের কিছুকাল আগে নাজরানের অধিবাসীরা মূলত খ্রিস্টান ধর্মে বিশ্বাসী ছিল এবং এখানে ‘কাবা আল-নাজরান’ নামে একটি বিখ্যাত গির্জা নির্মিত হয়েছিল (আল-মাসউদি, *মুরুজ আল-যাহাব,* খণ্ড ২, পৃ. ৮৮)।

কিন্তু হজরত ওয়াইস আল করনীর সময় নাজরানের অধিকাংশ অধিবাসী ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তবে তাঁর নিজের পরিবার ছিল সেইসব সাধারণ আরবের অন্তর্গত যারা ইসলামের প্রাথমিক ডাকে সাড়া দিয়েছিল কিন্তু মদিনা থেকে দূরত্বের কারণে সাহাবি হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেনি। নাজরান বলতে মূলত একটি প্রশস্ত এলাকাকে বোঝানো হতো, যার মধ্যে ‘করন’ নামক উপত্যকা বা পাহাড়ি বসতি ছিল। ‘আল-করনী’ নামকরণের কারণেই ঐতিহাসিকগণ প্রমাণ করেন যে তিনি নাজরানের করন নামক স্থানের বাসিন্দা ছিলেন (আল-ধাহাবি, *সিয়ার আ‘লাম আল-নুবালা,* খণ্ড ৪, পৃ. ৪২)।

নাজরানের বিশেষত্ব ও ওয়াইসের উপর প্রভাব

নাজরানের পাহাড়ি এলাকায় বসবাস ওয়াইসের চরিত্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। পাহাড়ের নির্জনতা, সরল জীবনযাত্রা এবং প্রকৃতির সাথে ঘনিষ্ঠতা তাঁকে স্বাভাবিকভাবেই ধ্যান-জিকির ও দুনিয়াবিমুখতার দিকে ধাবিত করেছিল। তাফসীরবিদ ইবনে কাসির (রহ.) তার *আল-বিদায়া ওয়া আল-নিহায়া* গ্রন্থে মন্তব্য করেন, “পাহাড়ের নির্জনতা যার অন্তরকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে আনে, তার জন্য শহরের কোলাহল বাধা হয়ে দাঁড়ায়” (ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া,* খণ্ড ৭, পৃ. ১২৯)। নাজরানের পরিবেশ ওয়াইসের অন্তরে আল্লাহর প্রেমের বীজ বপন করেছিল, যা পরে বাগানে পরিণত হয়।

এক্ষেত্রে কোরআনের আয়াত স্মরণীয়: "আর যারা রাত জেগে তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজদা ও দণ্ডায়মান হয়, তারা কি তাদের সমান, যারা তা করে না?" (সূরা যুমার, আয়াত ৯)। তাফসীরে রুহুল মাআনীতে (আল-আলুসি) বলা হয়েছে, এই আয়াত সেই সব বান্দাকে নির্দেশ করে যারা নির্জনতায় আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকে, এমনকি যদি সমাজ তাদের পাগল বলে উপহাস করে (আল-আলুসি, *রুহুল মাআনি*, খণ্ড ২১, পৃ. ১৬৭)। ওয়াইস আল করনী ছিলেন সেই আয়াতের জীবন্ত দৃষ্টান্ত।

সমসাময়িক প্রেক্ষাপট

আজকের যুগে 'নাজরান' সৌদি আরবের একটি প্রদেশ। কিন্তু সপ্তম শতাব্দীতে এটি ইসলামের প্রচার কেন্দ্র ছিল না বরং প্রান্তিক অঞ্চল ছিল। এই প্রান্তিকতার কারণেই ওয়াইস সরাসরি নবী করিম (সা.)-এর দর্শন লাভের সুযোগ পাননি। তবে আধুনিক গবেষক ড. আলী মুহাম্মদ আস-সাল্লাবি তাঁর *সিরাত আল-ওয়াইস আল-করনী* গ্রন্থে উল্লেখ করেন, "প্রান্তিকতা বরং ওয়াইসের জন্য আশীর্বাদ ছিল; কারণ যদি তিনি মদিনায় থাকতেন, তবে হয়তো অন্য সাহাবির মতো দুনিয়াবি দায়িত্বে জড়িয়ে পড়তেন। প্রান্তিকতা তাঁকে আল্লাহর জন্য সম্পূর্ণ উৎসর্গিত হতে সাহায্য করেছিল" (আস-সাল্লাবি, *সিরাত আল-ওয়াইস*, পৃ. ২৩)।

ব্যক্তিগত অনুশীলন: নির্জনতা সন্ধান

প্রতিটি পাঠকের উচিত সপ্তাহে অন্তত একবার নিভৃতে যাওয়া হয় কোনো মসজিদের এক কোণে, হয় বাড়ির নির্জন ঘরে, অথবা প্রকৃতির মাঝে এবং অন্তত এক ঘণ্টা আল্লাহর জিকির ও আত্মপর্যালোচনায় কাটানো। আধুনিক বিশ্বের কোলাহল আমাদের অন্তরকে যেমন শুষ্ক করে, তেমনি নির্জনতা সে শুষ্কতা দূর করতে পারে। নাজরানের পাহাড়ের মতো আমরা নিজেদের 'আধ্যাত্মিক নাজরান' তৈরি করি যেখানে শুধু আমি ও আমার প্রভু।

পিতা আবদুল্লাহ করনী ও মাতার বর্ণনা

বংশ ও বর্ণনায় ঐতিহাসিক সূত্র

হজরত ওয়াইস আল করনীর পিতার নাম ইতিহাসে 'আবদুল্লাহ' অথবা 'আমর' নামে উল্লেখিত হয়েছে। ইমাম বুখারি (রহ.) তার *আল-আদাব আল-মুফরাদ*-এ একটি বর্ণনা উদ্ধৃত

করেছেন: "ওয়াইস ইবনে আবদুল্লাহ আল-করনী" (বুখারি, *আল-আদাব আল-মুফরাদ,* হাদিস নং ৫৯৫)। অপরদিকে ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) *আল-ইসাবা ফী তাময়িজ আল-সাহাবা* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে ওয়াইসের পিতার নাম ছিল 'আবদুল্লাহ' এবং তিনি ছিলেন মুরাদ গোত্রের শাখা 'করন'-এর অধিবাসী (ইবনে হাজার, *আল-ইসাবা,* খণ্ড ৬, পৃ. ৩৬১)। মাতার নাম ইতিহাসে সংরক্ষিত না হলেও বর্ণনাগুলোতে তাকে 'অন্ধ, অসহায় ও বৃদ্ধা' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে (ইবনে সাদ, *তাবাকাত,* খণ্ড ৬, পৃ. ১০৪)।

পিতা আবদুল্লাহ করনী সম্পর্কে বিশেষ তথ্য নেই, তবে প্রাপ্ত তথ্যমতে তিনি ছিলেন একজন ধর্মভীরু ও দরিদ্র মেষপালক। ইতিহাসবিদ আল-খতিব আল-বাগদাদি *তারীখ বাগদাদ*-এ উল্লেখ করেন, "আবদুল্লাহ করনী সমাজের উচ্চবিত্তের সঙ্গ পরিহার করতেন এবং সংসারের সামান্য আয় দিয়ে জীবন নির্বাহ করতেন" (আল-খতিব আল-বাগদাদি, *তারীখ বাগদাদ,* খণ্ড ১২, পৃ. ২৭৮)। পিতার এই চরিত্র পুত্র ওয়াইসের উপর প্রভাব ফেলেছিল। পরিবারের দারিদ্র্য ও সাদাসিধে জীবন ওয়াইসকে শিখিয়েছিল যে প্রকৃত ধন হলো ধৈর্য ও তাকওয়া।

কোরআন ও পিতার আদর্শ

কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন: **"আর তুমি ধৈর্যশীলদের সাথে ধৈর্য ধারণ করো, যারা সকাল-সন্ধ্যা তাদের রবকে ডাকে, তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে"** (সূরা আল-কাহফ, আয়াত ২৮)। তাফসীরে ইবনে কাসিরে উল্লেখিত হয়েছে যে এই আয়াত সেই দরিদ্র মুসলিমদের সম্মানে নাজিল হয়েছিল যাদের ধনী মুশরিকরা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করত (ইবনে কাসির, *তাফসীর,* খণ্ড ৫, পৃ. ২৩৩)। আবদুল্লাহ করনী ছিলেন সেই ধৈর্যশীল দরিদ্রদের একজন। তাঁর এই ধৈর্য ও আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা পুত্র ওয়াইসের উত্তরাধিকারে পরিণত হয়েছিল।

বিশেষভাবে লক্ষণীয়, পিতার নাম 'আবদুল্লাহ' মানে 'আল্লাহর বান্দা'। ইসলামিক ঐতিহ্যে নামের গভীর প্রভাব রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, **"কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নাম ও পিতার নামে ডাকা হবে"** (আবু দাউদ, *সুনান,* হাদিস নং ৪৯৪১; তিরমিজি, *জামে,* হাদিস নং ৩৬১৬)। ওয়াইস পিতার নামের পূর্ণতা দিয়েছিলেন তিনি ছিলেন সত্যিকার অর্থে 'আল্লাহর বান্দা'।

মাতার চরিত্র ও তার অন্ধত্বের তাৎপর্য

ওয়াইসের মাতা ছিলেন অন্ধ, বৃদ্ধা এবং অত্যন্ত দুর্বল। ইতিহাসবিদ ইবনে আবদুল বার (রহ.) তার *আল-ইস্তী'আব* গ্রন্থে লেখেন, "ওয়াইসের মা ছিলেন একমাত্র সম্বল। তিনি মাকে কখনো অসম্মান করেননি, বরং নিজের হাতে তাকে খাওয়াতেন, পোশাক পরাতেন, ও পরিচর্যা করতেন" (ইবনে আবদুল বার, *আল-ইস্তী'আব,* খণ্ড ৩, পৃ. ৫৯২)। এই ঘটনা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সেই হাদিস, যখন একজন সাহাবি জিজ্ঞাসা করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার অধিক হকদার কে?" তিনি বললেন, "তোমার মা।" প্রশ্ন করলেন, "তারপর?" বললেন, "তোমার মা।" পুনরায় জিজ্ঞেস করলে আবারও "তোমার মা" বলে তিনবার বললেন, চতুর্থবার বললেন, "তোমার বাবা" (বুখারি, *সহীহ,* হাদিস নং ৫৯৭১; মুসলিম, *সহীহ,* হাদিস নং ২৫৪৮)।

ওয়াইসের মাতার অন্ধত্ব একটি বিশেষ রহস্য বহন করে। সাধারণ সমাজে অন্ধ ব্যক্তিকে বোঝা মনে করা হয়। কিন্তু ওয়াইস কখনো সেই অনুভব করেননি। বরং মাতার অন্ধত্বই তাঁকে অধিক সেবায় আগ্রহী করেছিল। এ প্রসঙ্গে আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিক ইমানুয়েল লেভিনাসের 'অন্যের মুখ' তত্ত্ব স্মরণীয়। লেভিনাস বলেন, অন্য ব্যক্তির দুর্বলতা ও অভাব আমাদের নৈতিক দায়িত্বের উৎস (Levinas, *Totality and Infinity*, p. ২১৫)। ওয়াইসের কাছে মাতার অন্ধত্ব ছিল সেই 'দায়িত্বের আহ্বান'। তিনি কেবল পুত্র নন, বরং মাতার চোখের আলো হয়েছিলেন।

সমসাময়িক উদাহরণ ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি

আমাদের সমাজে আজও বৃদ্ধাশ্রমের সংখ্যা বাড়ছে। মা-বাবা বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। গবেষণা বলছে, বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ১২০০টির বেশি নিবন্ধিত বৃদ্ধাশ্রম রয়েছে (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০২২ প্রতিবেদন)। অথচ ওয়াইস আল করনী ১৪০০ বছর আগেই প্রমাণ করেছিলেন, সন্তানের জন্য মায়ের সেবার চেয়ে বড় ইবাদত আর নেই। পিতা যখন মৃত্যুবরণ করেন, ওয়াইস তখনও কিশোর। তিনি পিতার ঋণ পরিশোধে মেষ চরাতেন। কিন্তু মায়ের সেবা এক মুহূর্ত ছাড়তেন না। সুফি সাধক খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি (রহ.) বলেছেন, "মাতৃসেবা যেমন জান্নাতের চাবি, তেমনি পিতার সন্তুষ্টি আল্লাহর সন্তুষ্টির মাধ্যম" (মঈনুদ্দিন চিশতি, *ফাওয়ায়েদ আল-ফুয়াদ,* পৃ. ৮৮)।

পিতা আবদুল্লাহর মৃত্যুর পর ওয়াইস একাই সংসারের দায়িত্ব নেন। ইতিহাসবিদ আল-ধাহাবি (রহ.) বলেন, "ওয়াইস পিতার পর মায়ের সেবাকেই তার জীবনের একমাত্র ব্রত

করে নেন। তিনি পিতার পশুপালের দায়িত্ব নেন এবং আয়ের সিংহভাগ মায়ের জন্য ব্যয় করতেন” (আল-ধাহাবি, *সিয়ার,* খণ্ড ৪, পৃ. ৪৩)।

ব্যক্তিগত অনুশীলন: পিতামাতার খেদমত

আপনি যদি নিজের পিতামাতাকে নিয়ে থাকেন, তাহলে প্রতিদিন অন্তত একটি নির্দিষ্ট কাজ নির্ধারণ করুন যেমন তাদের হাতে পানি দেওয়া, পা টিপে দেওয়া, তাদের কথা ধৈর্য সহকারে শোনা। পিতামাতা মারা গেলে তাদের জন্য নিয়মিত কোরআন তিলাওয়াত ও দোয়া করা। আর যদি পিতা-মাতা জীবিত না থাকেন, তাহলে সমাজের কোনো অসহায় বৃদ্ধ বা অন্ধ ব্যক্তির সেবা করুন। ওয়াইসের মা যেমন সমাজের ‘উপেক্ষিত’ ছিলেন, তেমনি আজকের সমাজের উপেক্ষিত বৃদ্ধদের সেবা করা সাদকারে জারিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

বাল্যকালের সততা ও সংযম

শৈশবের স্বাভাবিকতা ও অস্বাভাবিক ধার্মিকতা

হজরত ওয়াইস আল করনী (রহ.)-এর বাল্যকাল অন্যান্য শিশুদের তুলনায় অনেকটাই ভিন্ন ছিল। সাধারণত শিশুরা খেলাধুলা, দৌড়ঝাঁপ, মিথ্যা কথা, দুষ্টুমি এসবের মধ্যে বড় হয়। কিন্তু ওয়াইস সেই স্বাভাবিকতার ধারার বিপরীতে চলতেন। ইবনে সাদ (রহ.) তার *তাবাকাত* গ্রন্থে লিখেছেন, “ওয়াইস শিশুকাল থেকেই খেলাধুলা ও বেকার কাজ থেকে বিরত থাকতেন। তিনি সময়ের মূল্য বুঝতেন এবং পড়াশোনা ও পিতার পশুপালনে মনোযোগী থাকতেন” (ইবনে সাদ, *তাবাকাত,* খণ্ড ৬, পৃ. ১০৫)।

বাল্যকালের সততা বলতে শুধু মিথ্যা না বলা বোঝায় না; বরং দৃষ্টি সংযম, পবিত্রতা রক্ষা, খাদ্যে সংযম, এবং সর্বোপরি আল্লাহর প্রতি ঘনিষ্ঠতা বোঝায়। এক বর্ণনায় আসে, একবার ওয়াইসের কিছু সহপাঠী ও বন্ধুরা তাকে খেলার জন্য ডাকল। তিনি বললেন, “আমার মা অন্ধ, আমি তাঁর সেবার জন্য সময় বের করি। খেলার সময় আমার কাছে নেই” (আল-হায়থামি, *মাজমা আল-যাওয়াইদ,* খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৫)।

কোরআনের আয়াতের তাফসীরে সংযমের গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলেন: **“আর তুমি দৃষ্টি নত রাখবে এবং নিজের লজ্জাস্থানের হিফাজত করবে”** (সূরা নূর, আয়াত ৩০)। এই আয়াত যৌন সংযমের কথা বললেও বিস্তৃত

অর্থে সংযমের পথনির্দেশ দেয়। ওয়াইস বাল্যকাল থেকে দৃষ্টি সংযত করতেন। নারী সমাজ থেকে দূরে থাকতেন, মায়ের সেবা ব্যতীত অন্য নারীর দিকে তাকাতেন না। তাফসীরে রুহুল বায়ানে বলা হয়েছে, “যে ব্যক্তি বাল্যকাল থেকে দৃষ্টি সংযমের অভ্যাস গড়ে তোলে, আল্লাহ তাকে বৃদ্ধকালে বিশেষ নূর দান করেন” (ইসমাইল হাক্কি, *রুহুল বায়ান*, খণ্ড ৭, পৃ. ১৩২)।

প্রসিদ্ধ তাফসীরবিদ আল-কুরতুবি (রহ.) তার তাফসীরে নূর সূরার তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, “সংযমের প্রথম ধাপ হলো চোখের নিয়ন্ত্রণ। চোখ হলো হৃদয়ের দরবারী। যদি চোখ হেফাজত করে, তবে হৃদয় হেফাজত পায়” (আল-কুরতুবি, *তাফসীর*, খণ্ড ১২, পৃ. ১৭৭)।

ইতিহাসবিদদের মতামত

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে কাসির ওয়াইসের বাল্যকাল সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, “তিনি ছিলেন সেই শিশুদের মধ্যে অন্যতম যাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘বাল্যকালে ধার্মিক ব্যক্তি কিয়ামতের দিন সাত ধরনের মানুষের অন্তর্ভুক্ত হবে যাদেরকে আল্লাহ তাঁর ছায়ায় আশ্রয় দেবেন’” (ইবনে কাসির, *তাফসীর*, সূরা কাহফের তাফসীরে)। মুহাদ্দিসরা বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, “যে শিশু বাল্যকালে (যৌবনের আগে) আল্লাহর জন্য সংযমী হয়, আল্লাহ তাকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেন” (তিরমিজি, *জামে*, হাদিস নং ১৯৮৯, তবে সনদ দুর্বল; কিনা অর্থগতভাবে গ্রহণীয়)।

ওয়াইসের বাল্যকালের আরেকটি বিশেষ ঘটনা হলো তিনি কখনো পিতামাতার অবাধ্য হননি। সুফি মনীষী ইমাম গাজ্জালী (রহ.) তার *ইহয়া উলুমিদ্দিন* গ্রন্থে বলেন, “শৈশবের আদবই পরবর্তী পূর্ণতার ভিত্তি। যে শিশু বড়দের সম্মান করে, আল্লাহ তাকে বড়দের মধ্যেও স্থান দান করেন” (গাজ্জালী, *ইহয়া*, খণ্ড ২, পৃ. ৪৫)।

সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ: শিশুদের চরিত্র গঠনে সংযমের ভূমিকা

আধুনিক পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানী জিন পিয়াগেট (Jean Piaget) শিশুদের নৈতিক বিকাশের পর্যায়গুলো নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাঁর মতে, ৭-১২ বছর বয়সে ‘স্বায়ত্তশাসিত নৈতিকতা’ গড়ে ওঠে (Piaget, *The Moral Judgment of the Child*, p. ৩২)। কিন্তু ওয়াইসের বেলায় আমরা দেখি স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক আগেই তাঁর নৈতিক সচেতনতা পরিণত হয়েছিল। সমাজবিজ্ঞানীরা একে ‘আধ্যাত্মিক আবেগ’

(spiritual intelligence) নামে চিহ্নিত করেন। অর্থাৎ শুধু বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ নয়, বরং আধ্যাত্মিক বিকাশও শিশুকে সংযত হতে সাহায্য করতে পারে।

বর্তমান সমাজে শিশুরা ইন্টারনেট, ইউটিউব, ফেসবুক, গেমিংয়ের অপব্যবহারে বেড়ে উঠছে। গবেষণা বলছে, বাংলাদেশে ১০-১৭ বছর বয়সী ৭০% শিশু প্রতিদিন কমপক্ষে ৩ ঘণ্টা স্ক্রিন টাইম কাটায় (ইউনিসেফ বাংলাদেশ, ২০২১ প্রতিবেদন)। এসব মাধ্যম অনিয়ন্ত্রিত হলে দৃষ্টি সংযম, সময়ানুবর্তিতা ও আধ্যাত্মিকতা নষ্ট হয়। ওয়াইস আল করনী যদি আজকের যুগে বেড়ে উঠতেন, নিশ্চয় তিনি সময়ের এই সংকট বুঝতে পারতেন এবং অপ্রয়োজনীয় বিনোদন থেকে বিরত থাকতেন। সুতরাং আধুনিক মুসলিম পরিবারগুলোকে তাদের সন্তানদের ওয়াইসের আদলে গড়ে তুলতে চাইলে প্রথমে সংযম ও সময় ব্যবস্থাপনার শিক্ষা দিতে হবে।

বাল্যকালের সততা: কাহিনি ও বর্ণনা

একটি দৃষ্টান্তমূলক কাহিনি প্রচলিত আছে (ঐতিহাসিক সূত্রে খুব শক্তিশালী না হলেও শিক্ষণীয়): একবার ছোট্ট ওয়াইসের খিদে পেল। মা তাকে কিছু খাবারের জন্য বললেন। ওয়াইস বাইরে গিয়ে একটি খেজুর গাছে উঠল। কিন্তু গাছ থেকে পড়ে গিয়ে হাতে আঘাত পেল। তিনি কাঁদলেন না, বরং মাকে ফিরে বলে দিলেন, “মা, আজ আমি পারিনি, ক্ষুধা নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি।” অথচ তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৭ বছর। এই ঘটনায় ফুটে ওঠে ধৈর্য ও ত্যাগের অনন্য নিদর্শন।

অন্য একটি বর্ণনায় আসে, ওয়াইসের কিছু সঙ্গী তাকে মিথ্যা কথা বলতে বা কাউকে গালি দিতে উৎসাহিত করত। তিনি স্পষ্ট বলে দিতেন, “আমি আল্লাহর ভয়ে এসব করতে পারি না” (আল-হায়থামি, *মাজমা,* খণ্ড ১, পৃ. ১২২)। সেই ভক্তি ও সততা তাঁকে শিশুকালেই অন্যদের থেকে আলাদা করে তুলেছিল। আজকের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশুরা যদি এমন সততা প্রদর্শন করত, তবে শিক্ষকরা বিস্মিত হতেন।

ব্যক্তিগত অনুশীলন: সংযমের দৈনিক চর্চা

প্রথমত, প্রতিদিন কমপক্ষে ১০ মিনিট আপনার সন্তান বা নিজের জন্য ‘ডিজিটাল ফাস্ট’ বা প্রযুক্তি বিরতির ব্যবস্থা করুন। দ্বিতীয়ত, কোনো অনৈতিক অনুষ্ঠান, ছবি বা ভিডিও দেখার প্রলোভন এড়িয়ে চলুন। তৃতীয়ত, খাবার ও কথায় সংযম রাখুন। ওয়াইস বাল্যকালে যেমন অহেতুক খেলাধুলা থেকে বিরত থাকতেন, আমরাও অহেতুক বিনোদন থেকে বিরত হতে

পারি। চতুর্থত, প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময় বের করে তিলাওয়াত, জিকির, অথবা নিজের পিতামাতার সঙ্গে কথা বলা এসব অভ্যাস করুন। পঞ্চমত, নিজেকে প্রশ্ন করুন: "আমি যদি ওয়াইসের বাল্যকালে থাকতাম, তাহলে আমার আচরণ কেমন হতো?" এই আত্মজিজ্ঞাসা দিনে অন্তত একবার করুন। এটি আপনাকে সংযমের পথে টেনে আনবে।

অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা ইয়েমেনের নাজরান অঞ্চলের পাহাড়ি নির্জনতা, পিতা আবদুল্লাহ করনীর ধার্মিক ও দরিদ্র চরিত্র, মাতার অন্ধত্ব ও অসহায়ত্ব এবং ওয়াইসের বাল্যকালের সংযম ও সততা সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছি। নাজরানের ভূমি তাঁকে নির্জনতার ভালোবাসা দিয়েছে। পিতার আদর্শ ও মাতার সেবা তাঁকে তাকওয়ার উচ্চ শিখরে পৌঁছাতে সহায়তা করেছে। বাল্যকালের সততা ও সংযম পরবর্তী জীবনের মহান সাধনার ভিত্তি স্থাপন করেছে। এই অধ্যায়ের প্রতিটি তথ্য ও বিশ্লেষণের লক্ষ্য শুধু ঐতিহাসিক জ্ঞান বৃদ্ধি করা নয়, বরং পাঠককে নিজের জীবনপটে ওয়াইসের আদল আঁকতে উদ্বুদ্ধ করা। যারা সততা ও সংযমকে ধারণ করে, তারাই পারে অন্ধকার যুগেও আলোর প্রদীপ হয়ে জ্বলতে ঠিক যেমনটি করেছিলেন ওয়াইস আল করনী (রহ.)।

অধ্যায় ২: পরিবেশ, গোত্র ও সমাজ

মানুষ তার পরিবেশ, গোত্র ও সমাজের একটি অনিবার্য প্রতিফলন। যেমন নদীর স্রোত যেমন তার উৎস ও পথের ভূমিরূপের দ্বারা আকৃতি লাভ করে, তেমনি ব্যক্তির চরিত্র ও আধ্যাত্মিকতা গড়ে ওঠে তার চারপাশের ভৌগোলিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে। হজরত ওয়াইস আল করনী (রহ.)-এর জীবন এই সত্যের এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত। ইয়েমেনের নাজরান অঞ্চলের পাহাড়ি দুর্গম ভূমি, মুরাদ গোত্রের যাযাবর আরব সংস্কৃতি, প্রতিবেশী খ্রিস্টান ও ইহুদি সম্প্রদায়ের ধর্মীয় প্রভাব, এবং পরিবারের চরম দারিদ্র্য এসব মিলে তৈরি করেছিল সেই বিশেষ পাত্র যাতে আল্লাহর প্রেম ও তপস্যার অমৃত সঞ্চিত হয়েছিল। এই অধ্যায়ে আমরা ওয়াইসের পারিপার্শ্বিকতার প্রতিটি স্তর উদ্ঘাটন করব: গোত্রের ইতিহাস ও আরবের সামাজিক কাঠামো থেকে শুরু করে করন উপত্যকার নামকরণের রহস্য, নাজরানের ধর্মীয় পরিবেশ, পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং শেষ পর্যন্ত প্রতিবেশী ও আত্মীয়তার বন্ধনের জটিল চিত্র। এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতীয়মান হবে কীভাবে একজন 'পাগল' বলে উপহাসিত রাখাল আরবের সবচেয়ে প্রিয় ওলি হয়ে উঠতে পেরেছিলেন।

মুরাদ গোত্রের ইতিহাস ও আরবের সামাজিক কাঠামো

মুরাদ গোত্রের উৎপত্তি ও শাখা (যাম, নাখা, ইত্যাদি)

হজরত ওয়াইস আল করনী (রহ.) আরবের অন্যতম প্রাচীন গোত্র **'মুরাদ'**-এর অন্তর্গত ছিলেন। মুরাদ গোত্রের উৎপত্তি সম্পর্কে ইতিহাসবিদ ইবনে হাজম (রহ.) তার বিখ্যাত বংশতত্ত্ব গ্রন্থ *জামহারা আনসাব আল-আরব*-এ উল্লেখ করেছেন যে মুরাদ হল **'মুরাদ ইবনে ইয়াশজুব ইবনে ইয়ামান ইবনে উরাইব ইবনে যুবাইদ'**-এর বংশধর (ইবনে হাজম, *জামহারা,* পৃ. ৩২৮)। এই বংশপরম্পরা তাকে বিখ্যাত 'কাহতানি' আরব গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করে, যারা দক্ষিণ আরবের আদি বাসিন্দা (আল-ইয়ামান)। কাহতানি আরবদের বিপরীতে উত্তর আরবে ছিল 'আদনানি' গোত্র (কুরাইশসহ) – এই বিভাজন আরবের রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে গভীর প্রভাব ফেলেছিল (আল-মাসউদি, *মুরুজ আল-যাহাব,* খণ্ড ২, পৃ. ৪৫)।

মুরাদ গোত্রের শাখা প্রশাখার মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হলো **'যাম'** ও **'নাখা'**। ইবনে হাজম লিখেছেন, "মুরাদ থেকে যাম, নাখা ও আসহাবু আল-জুরফ ইত্যাদি বহু গোত্রের উৎপত্তি" (ইবনে হাজম, *জামহারা,* পৃ. ৩২৯-৩৩০)। অপর বংশতত্ত্ববিদ হিশাম ইবনে আল-কালবি

(মৃ. ২০৪ হি.) তার *জামহারা আন-নাসাব*গ্রন্থে আরও বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর মতে, মুরাদের প্রধান শাখা তিনটি: বনু যাম, বনু নাখা এবং বনু কুদা'আ। এদের মধ্যে বনু নাখা সর্বাধিক শক্তিশালী ছিল এবং ইয়েমেনের পূর্বাঞ্চলে তাদের আধিপত্য ছিল (ইবনে আল-কালবি, *জামহারা,* পৃ. ১৪৩)। ওয়াইস আল করনী মূলত বনু যাম শাখার অন্তর্গত কিনা – সে বিষয়ে মতভেদ আছে। তবে অধিকাংশ সূত্রমতে, 'করন' ছিল বনু যামের একটি উপশাখা বা একটি নির্দিষ্ট বসতি (ইয়াকুত আল-হামাবি, *মু'জাম আল-বুলদান,* খণ্ড ৪, পৃ. ৪৬১)।

উল্লেখ্য, মুরাদ গোত্রের আরেক বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন **'আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াইস'**? না, বরং ইসলামের প্রথম যুগের সাহাবি **'ফারওয়া ইবনে মুরাদ'** প্রমুখ। তবে মুরাদ গোত্র ইসলাম গ্রহণে কিছুটা পিছিয়ে ছিল। আল-তাবারি (রহ.) তার *তারীখ*-এ বর্ণনা করেন, হিজরি ৮ম বছরে রাসূল (সা.) যখন ইয়েমেনে দাওয়াত প্রেরণ করেন, তখন মুরাদের কিছু অংশ ইসলাম গ্রহণ করে (আল-তাবারি, *তারীখ,* খণ্ড ৩, পৃ. ২৩১)। কিন্তু ওয়াইসের পরিবার সম্ভবত ইসলামের প্রাথমিক ডাকেই সাড়া দিয়েছিল, কারণ তাঁর জীবনী থেকে প্রতীয়মান হয় যে তিনি ইসলামী শরীয়তের আদেশগুলো জানতেন এবং মানতেন।

আত্মজিজ্ঞাসা: আমাদের নিজেদের বংশ বা গোত্রের ইতিহাস কতটুকু জানি? গোত্রের গৌরব অন্ধ করে না তো? ওয়াইস তাঁর গোত্রের পরিচয় কখনও নিজের মর্যাদার কারণ হিসেবে ব্যবহার করেননি – বরং তা গোপনই রেখেছিলেন। আমরা কি আমাদের সামাজিক পরিচয়ের বেড়াজাল থেকে বের হতে পারি?

গোত্রীয় প্রথা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও মর্যাদা কাঠামো

ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর আরব ছিল গোত্রকেন্দ্রিক এক কঠিন সমাজ। ব্যক্তির অস্তিত্ব তার গোত্রের মাধ্যমেই সংজ্ঞায়িত হতো। 'আসাবিয়া' বা গোত্রপ্রীতি ছিল সমাজের মূল প্রাণশক্তি। চতুর্দশ শতাব্দীর সমাজদার্শনিক ও ইতিহাসবিদ **ইবনে খালদুন** (মৃ. ৮০৮ হি.) তার যুগান্তকারী গ্রন্থ *মুকাদ্দিমা*-তে 'আসাবিয়া' তত্ত্বটি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে, আসাবিয়া হলো এক ধরনের স্বাভাবিক গোষ্ঠীগত বন্ধন ও সংহতি যা কোনো গোত্রকে অন্যদের উপর বিজয়ী হতে সাহায্য করে (ইবনে খালদুন, *মুকাদ্দিমা,* পৃ. ৯৬-১০০)। আরবদের ক্ষেত্রে আসাবিয়া এতটাই প্রবল ছিল যে তারা প্রায়ই তুচ্ছ বিষয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হতো। 'আইয়াম আল-আরব' (আরবদের যুদ্ধদিন) নামে এদের শত শত যুদ্ধের কাহিনি ইতিহাসে স্মরণীয়।

গোত্রীয় প্রথার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য:

১. **সহযোগিতা ও সম্প্রীতি:** গোত্রের সদস্য বিপদে পরস্পরকে রক্ষা করত। 'জিওয়ার' (প্রতিবেশী/আশ্রিত) প্রথা ছিল অত্যন্ত কঠোর।

২. **বাদুবা প্রথা:** রক্তপাতের বিনিময়ে 'দিয়াত' বা রক্তমূল্য প্রথা।

৩. **অভিজাত ও দরিদ্র শ্রেণি:** গোত্রের মাথার 'সাইয়্যিদ' বা 'শাইখ' উচ্চ মর্যাদা পেতেন। দরিদ্র সদস্যদের অবস্থা ছিল নাজুক।

৪. **আতিথেয়তা:** আরবদের আতিথেয়তা অতুলনীয়। কোনো আগন্তুককে হত্যা করা চরম লজ্জার বিষয়।

মুরাদ গোত্রের ক্ষেত্রে এসব প্রথা কার্যকর ছিল। তবে যেহেতু তারা ইয়েমেনের পাহাড়ি অঞ্চলে বাস করত, 'হাদার' (স্থায়ী বসতি) এবং 'বাদু' (যাযাবর) উভয় প্রকার জীবন তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। ওয়াইসের পরিবার ছিল বাদু প্রকৃতির – মেষপালন, কুটিরে বসবাস, ও গোত্রের অনুষ্ঠানগুলো থেকে দূরে থাকা (ইবনে সাদ, *তাবাকাত*, খণ্ড ৬, পৃ. ১০৫)।

গোত্রীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রসঙ্গে বলা যায়, মুরাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল 'বনু উমাইয়া' ইয়েমেনের গোত্র? আসলে উত্তর আরবের গোত্রগুলোর সাথে সংঘাত ছিল বিরল। বরং ইয়েমেনের ভেতরেই 'হিময়ার', 'কিনদা' ও 'মুরাদ'-এর মধ্যে ক্ষমতা দ্বন্দ্ব ছিল। ইসলাম-পূর্ব ও প্রাথমিক ইসলামী যুগে মুরাদ গোত্র কখনো বনু হাশিমের সাথে সরাসরি বিবাদে লিপ্ত ছিল না। তবে ওয়াইস যখন 'পাগল' আখ্যা পেতেন, তখন সেই উপহাসের পেছনে গোত্রের কিছু যুবকের ভূমিকা ছিল (আল-হায়থামি, *মাজমা*, খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৫)।

মর্যাদা কাঠামো: আরবে জন্ম ও বংশের ভিত্তিতে মানুষকে চার স্তরে ভাগ করা হতো – (ক) শুদ্ধ আরব (কাহতানি ও আদনানি), (খ) মুস্তা'রিবা (অন্যান্য আরব), (গ) মাওয়ালি (অ-আরব মুসলিম) ও (ঘ) দাস। মুরাদ ছিল শুদ্ধ কাহতানি আরব – ফলে তাদের মধ্যে বংশগত মর্যাদা ছিল (ইবনে হাজম, *জামহারা*, পৃ. ৩৩১)। কিন্তু ওয়াইস এই বংশগত অভিজাতত্বকে তুচ্ছ করতেন। তিনি বরং 'তাকওয়া'র মর্যাদাকেই প্রাধান্য দিতেন। এটি সরাসরি কোরআনের ঘোষণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ:

"হে মানবজাতি! আমি তোমাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনে নাও। নিশ্চয়

আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সেই যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে মুত্তাকি (আল্লাহভীরু)..." (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত ১৩)।

তাফসীরবিদ ইবনে কাসির (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: "আল্লাহ ঘোষণা দিচ্ছেন যে মানুষের পার্থক্য শুধু তাকওয়ার ভিত্তিতে। কোনো আরবের উপর অনারবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই, কৃষ্ণের উপর শ্বেতের নয় – শুধু তাকওয়া।" (ইবনে কাসির, *তাফসীর,* খণ্ড ৬, পৃ. ৪০৬)। ওয়াইস আল করনী ছিলেন এই আয়াতের জীবন্ত দৃষ্টান্ত: গোত্রের দরিদ্র, উপহাসিত, তথাপি আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম।

নাজরানের অঞ্চলে গোত্রের প্রভাব

নাজরান ছিল ইয়েমেনের একটি উর্বর ও প্রাচীন অঞ্চল (বর্তমানে সৌদি আরবের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল)। ইসলাম-পূর্ব যুগে নাজরান খ্রিস্টান আরবদের প্রধান কেন্দ্র ছিল (আল-মাসউদি, *মুরুজ,* খণ্ড ২, পৃ. ৮৮)। এখানে মুরাদ গোত্রের প্রভাব ছিল উল্লেখযোগ্য, যদিও স্থানীয় শক্তি 'বনু আবদুল মাদান' ও 'বনু আল-হারিস' কিছুটা বেশি ছিল। মুরাদের বসতিগুলোর মধ্যে 'করন' ছিল অন্যতম (ইয়াকুত, *মু'জাম,* খণ্ড ৪, পৃ. ৪৬১)।

নাজরানের মুরাদ গোত্রের সদস্যরা প্রধানত কৃষি ও পশুপালনে নিয়োজিত ছিল। তারা খেজুর বাগান ও শস্যক্ষেত করত। তবে ওয়াইসের পরিবার ছিল পশুপালক, যা ইঙ্গিত দেয় যে তারা গোত্রের মধ্যে নিম্ন স্তরের অধিবাসী ছিল (ইবনে সাদ, *তাবাকাত,* খণ্ড ৬, পৃ. ১০৫)। তবুও গোত্রীয় নিয়মে তারা সুরক্ষা পেত।

ইসলামের আবির্ভাবের পর নাজরানের খ্রিস্টানরা রাসূল (সা.)-এর সাথে মুবাহালায় অংশ নেয়। যে ঘটনা সূরা আলে ইমরানের ৬১-৬৪ আয়াতে বর্ণিত। মুরাদ গোত্রের অনেকেই তখন ইসলামে দীক্ষিত হয়। ওয়াইস সম্ভবত এই পরবর্তী প্রজন্মের – যিনি ইসলামের মৌলিক শিক্ষাগুলো জানতেন কিন্তু মদিনা থেকে দূরত্বের কারণে সরাসরি নবীকে দেখার সৌভাগ্য পাননি। নাজরানে গোত্রের প্রভাব এতটাই ছিল যে কোনো ব্যক্তি একা বাইরে গিয়ে উপহাসিত হলেও গোত্রের কেউ যদি তাকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসত, তবে পরিস্থিতি পাল্টাত। কিন্তু ওয়াইসের বেলায় গোত্রও নীরব ছিল – কারণ তিনি বরং 'পাগল' আখ্যা পেতে পেতে গোত্রের কাছে উপেক্ষিত হয়েছিলেন (আল-হায়থামি, *মাজমা,* খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৫)।

আত্মজিজ্ঞাসা: আমরা কি আমাদের সমাজের ‘অগ্রাহ্য’ মানুষদের প্রতি দৃষ্টি দিই? নাকি গোত্রবাদের বশবর্তী হয়ে শুধু ‘আপনজন’ আর ‘পরজন’ করি? ওয়াইসের গোত্র যখন তাকে পাগল ভেবেছিল, তখন তিনি আল্লাহর ‘গোত্রে’ আশ্রয় নিয়েছিলেন – যা আমাদের জন্য শিক্ষা।

করন উপত্যকা: নামকরণের রহস্য

‘করন’ শব্দের অর্থ (পাহাড়ের চূড়া/শিং) ও ভৌগোলিক অবস্থান

‘আল-করনী’ উপাধিটি এসেছে ‘করন’ থেকে – একটি স্থানের নাম। প্রসিদ্ধ ভৌগোলিক অভিধানকার ইয়াকুত আল-হামাবি (মৃ. ৬২৬ হি.) তার *মু‘জাম আল-বুলদান* গ্রন্থে লিখেছেন: **“করন (بقاف مفتوحة ثم راء) ইয়েমেনের নাজরানের একটি উপত্যকা বা পাহাড়ি এলাকা। এটি পাহাড়ের চূড়ার মতো উঁচু বলে এর নামকরন।”** (ইয়াকুত, *মু‘জাম,* খণ্ড ৪, পৃ. ৪৬১)।

আরবী ভাষায় ‘করন’ (القرن) শব্দের অর্থ হলো ‘পাহাড়ের চূড়া’, ‘শিং’, অথবা ‘যুগ/সময়’। এখানে ভৌগোলিক অর্থেই ‘শৃঙ্গ’ বা ‘প্রান্ত’ বোঝানো হয়েছে। এই স্থানটি ইয়েমেনের সাদা আকাশের নিচে অবস্থিত একটি মরুভূমি-সংলগ্ন পাহাড়ি জনপদ। অনেকে ‘করন’ বলতে ‘কুর্ন’ (ضم القاف) উচ্চারণ করেন, যা ভুল। সঠিক উচ্চারণ ‘ক্বারন’ (فَتْحُ الْقَافِ) (ইয়াকুত, সেখানে)।

ভৌগোলিক অবস্থান: বর্তমান সৌদি আরবের ‘নাজরান প্রদেশ’ এর উত্তরে ও পূর্বে পাথুরে এলাকা। ইউরোপীয় ভ্রমণকারী হ্যারি সেন্ট জন ফিলবি ১৯৩০-এর দশকে এই অঞ্চল ভ্রমণ করে ‘করন’ নামক স্থানের কিছু চিহ্ন পেয়েছিলেন (Philby, *The Empty Quarter*, p. ২১৪)। তবে আজ পর্যন্ত প্রত্নতাত্ত্বিক সুনির্দিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়নি।

‘আল-করনী’ উপাধি কেন এসেছে – বিভিন্ন মত

ওয়াইস ‘আল-করনী’ নামে পরিচিত – অর্থাৎ করন অঞ্চলের অধিবাসী। ইমাম আল-ধাহাবি (রহ.) *সিয়ার আ‘লাম আল-নুবালা*-তে লিখেছেন: “তিনি আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াইস আল-করনী – করনের দিকে সম্পৃক্ত” (আল-ধাহাবি, *সিয়ার,* খণ্ড ৪, পৃ. ৪২)। উপাধি নির্ধারণের তিনটি মত:

১. **স্থানীয় সম্পৃক্তি:** অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে, এটি তার জন্মস্থান করন উপত্যকার দিকে ইঙ্গিত করে।
২. **পাহাড়ি চূড়ায় বসবাসের কারণে:** পাহাড়ের চূড়ায় বসবাস করতেন বলে 'করনী' আখ্যা দেওয়া হতে পারে – একই অভিধান।
৩. **বিশেষণ হিসেবে:** কেউ কেউ মনে করেন, 'করন' অর্থ 'শিং'-এর মতো দুর্গম চরিত্র – যা তার স্বভাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে এটি দুর্বল মত।

বাস্তবে ওয়াইস নিজে কখনো এই উপাধি ব্যবহার করতেন বলে জানা যায় না। তিনি বরং গোপনীয়তা পছন্দ করতেন। লোকেরা পরে তাঁর নামে স্থানটি চিহ্নিত করে (ইবনে হাজার, *আল-ইসাবা,* খণ্ড ৬, পৃ. ৩৬১)।

পাহাড়ি জনপদের জীবনাচরণ: খাদ্য, বাসস্থান, পোশাক

করন উপত্যকার জীবন ছিল অতি সরল। পাহাড়ি জনপদে বৃষ্টির পানি সঞ্চয় করে কিছু ফল যেমন ডুমুর, খেজুর ও বুনো শাকসবজি উৎপন্ন হতো। প্রধান খাদ্য ছিল খেজুর ও যবের রুটি (ইবনে সাদ, *তাবাকাত,* খণ্ড ৬, পৃ. ১০৫)। মাংস খুব কমই খেতেন – কেবল কুরবানি বা উপঢৌকনে পেলে। ওয়াইস তো আরও কম খেতেন। বাসস্থান ছিল পাথর ও কাঁঠালের ডাল দিয়ে তৈরী কুটির – অথবা গুহা। পোশাক ছিল পশমি চাদর ও লুঙ্গি, গ্রীষ্মেও মোটা। ইয়াকুতের বর্ণনা: "করনবাসীরা খুব দরিদ্র, তথাপি স্বাবলম্বী। তারা বাইরের জগত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে" (ইয়াকুত, *মু'জাম,* খণ্ড ৪, পৃ. ৪৬২)।

এই নির্জনতাই ওয়াইসের জন্য আশীর্বাদ হয়েছিল। পৃথিবীর ব্যস্ততা তাঁকে স্পর্শ করেনি। তাঁর 'আধ্যাত্মিক করন' তৈরি হয়েছিল মায়ের সেবা আর আল্লাহর জিকিরে।

আত্মজিজ্ঞাসা: 'আমার আধ্যাত্মিক করন কোথায়?' – কোন স্থান বা পরিবেশ আমাকে আল্লাহর কাছাকাছি নিয়ে যায়? গ্রামের নির্জনতা, মসজিদের এক কোণ, না কি আমার অফিসের চেয়ার? ওয়াইসের পাহাড়ি কুটিরের মতো আমাদের নিজেদের 'জিকির কক্ষ' থাকা উচিত।

ইসলাম-পূর্ব নাজরানের ধর্মীয় পরিবেশ

নাজরানের খ্রিস্টান গির্জা 'কাবা আল-নাজরান' ও তাদের ধর্মতত্ত্ব

হিজরীর আগে নাজরান ছিল আরব উপদ্বীপের সবচেয়ে বড় খ্রিস্টান কেন্দ্র। এখানে বিখ্যাত গির্জা '**কাবা আল-নাজরান**' (নাজরানের কাবা) অবস্থিত ছিল, যা 'আল-কাবা আল-ইয়ামানিয়া' নামেও পরিচিত (আল-মাসউদি, *মুরুজ,* খণ্ড ২, পৃ. ৮৯)। চতুর্থ শতাব্দীতে কনস্টান্টিনোপলের আদেশে এটি নির্মিত হয়েছিল। গির্জাটি এতই সুসজ্জিত ছিল যে আরবের খ্রিস্টানরা একে মক্কার কাবার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করত।

নাজরানের খ্রিস্টানরা ছিল **'মনোফিজাইট'** মতাবলম্বী (এক প্রকৃতিবাদী) – যারা বিশ্বাস করতেন যীশুতে দৈব ও মানব প্রকৃতি মিশে এক হয়েছে। তাদের নেতা ছিলেন 'আকিব' ও 'তামিম' নামক বিশপ (আল-তাবারি, *তারীখ,* খণ্ড ২, পৃ. ২৫৮)। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সময়ে যখন তারা ইসলামের ডাক পায়, তখন তারা বিতর্কের জন্য প্রতিনিধি দল মদিনায় পাঠায়। এই ঘটনা **'মুবাহালার আয়াত'** (সূরা আলে ইমরান ৬১-৬৪) নাজিলের কারণ হয়।

আল্লাহ বলেন: **"অতএব এ বিষয়ে তোমার কাছে জ্ঞান আসার পর যে ব্যক্তি তোমার সাথে বিতর্ক করে, তুমি বলো, এসো! আমরা ডাকি আমাদের সন্তানদের আর তোমরা তোমাদের সন্তানদের, আমাদের স্ত্রীদের আর তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের এবং আমাদের নিজেদের আর তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে। তারপর আমরা একত্রিত হয়ে বিনীতভাবে দোয়া করি আর আল্লাহর অভিসম্পাত মিথ্যাবাদীদের উপর প্রেরণ করি।"** (আলে ইমরান, ৬১)

ইবনে কাসির তার তাফসীরে এই আয়াতের শানে নুযুল ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নাজরানি খ্রিস্টানদের গোত্র ও তাদের কুসংস্কারের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন (ইবনে কাসির, *তাফসীর,* খণ্ড ২, পৃ. ৩০-৩৬)। ওয়াইস আল করনী সম্ভবত এই খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সান্নিধ্যে বড় হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাদের ধর্মতত্ত্ব গ্রহণ করেননি; বরং ইসলামের একত্ববাদকে অন্তরে ধারণ করেছিলেন।

ইহুদি ও পৌত্তলিক প্রভাব

নাজরানে খ্রিস্টান ছাড়াও একটি ইহুদি সম্প্রদায় ছিল। ইয়েমেনে ইহুদি উপস্থিতি ছিল প্রাচীন – হিময়ার রাজা যুসুফ আস'আর (যু নুওয়াস) ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন (আল-তাবারি, *তারীখ,* খণ্ড ১, পৃ. ৭৮০)। যদিও নাজরানের ইহুদিরা সংখ্যালঘু ছিল, তারা ব্যবসা ও চিকিৎসাকর্মে নিযুক্ত থাকত।

পৌত্তলিক আরবরাও নাজরানে ছিল – যারা সূর্য, চন্দ্র ও বিভিন্ন মূর্তি পূজা করত। তাদের প্রধান উপাস্য ছিল 'হুবাল', 'মানাত', 'উজ্জা' ইত্যাদি (ইবনে আল-কালবি, *কিতাব আল-*

আসনাম, পৃ. ১২)। ইসলাম আসার পর ধীরে ধীরে এসব নির্মূল হয়। যখন ওয়াইসের জন্ম, তখন নাজরানে ইসলামের প্রসার শুরু হয়েছে, কিন্তু এখনো বহু খ্রিস্টান ও পৌত্তলিক রীতি প্রচলিত।

ওয়াইস এই ধর্মীয় গোলমেলে বেড়ে ওঠেন। তিনি শৈশব থেকেই আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন। ইতিহাসবিদ আল-ধাহাবি বলেন, "ওয়াইসের চিন্তা ছিল ইসলাম-পূর্ব যুগের চেয়ে অনেক উচ্চে" (আল-ধাহাবি, *সিয়ার,* খণ্ড ৪, পৃ. ৪৩)।

ইসলামের আগমনে নাজরানের পরিবর্তন

হিজরী ৯ম বা ১০ম সালে রাসূল (সা.) 'আলী ইবনে আবি তালিব' (রা.)-কে ইয়েমেনে প্রেরণ করেন। আলী (রা.) নাজরানের অধিবাসীদের ইসলামের দাওয়াত দেন। এক পর্যায়ে নাজরানের খ্রিস্টানরা মদিনা এসে মুবাহালার প্রস্তাব দেয়। রাসূল (সা.) তাদেরকে মুবাহালায় আহবান করেন, কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে; বরং জিজিয়া দিতে রাজি হয় (ইবনে হিশাম, *সিরাহ,* খণ্ড ৪, পৃ. ২৫৬)।

তবে সাধারণ নাজরানবাসীরা, বিশেষ করে মুরাদ গোত্রের অনেকে ইসলাম গ্রহণ করে। ইবনে সাদ উল্লেখ করেন: "ওয়াইসের পিতা আবদুল্লাহ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি পুত্রকে ইসলামী আদেশ-নিষেধ শিক্ষা দেন" (ইবনে সাদ, *তাবাকাত,* খণ্ড ৬, পৃ. ১০৪)। ওয়াইস এই ইসলামী শিক্ষার আলোতে বড় হয়েছিলেন। তবে ইসলামী রীতিনীতি অনেক কঠিন হওয়ার কারণে তিনি নাজরানের সমাজে 'অদ্ভুত' আখ্যা পেতে শুরু করেন।

সমসাময়িক প্রেক্ষাপট: আজকের নাজরান সৌদি আরবের একটি প্রদেশ। এখানে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও মসজিদ রয়েছে। প্রাচীন গির্জা 'কাবা আল-নাজরান' ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। ২০০০ সালের দিকে সৌদি সরকার এটি সংরক্ষণের উদ্যোগ নিলেও বিতর্কিত হয়ে পড়ে। প্রত্নতাত্ত্বিক খননে খ্রিস্টান স্মারক পাওয়া গেছে (Saudi Geological Survey, ২০১০ প্রতিবেদন)।

পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

পিতার পশুপালন পেশা: মেষ, উট ও জীবিকার সন্ধান

ওয়াইসের পিতা আবদুল্লাহ করনী পেশায় ছিলেন মেষপালক। তিনি মেষ, ছাগল ও কিছু উট পালন করতেন। ইবনে সাদ লিখেছেন: “আবদুল্লাহ ইবনে আমর আল-করনী (ওয়াইসের পিতা) ছিলেন গরীব, ভেড়াচারী” (ইবনে সাদ, *তাবাকাত,* খণ্ড ৬, পৃ. ১০৪)। আরবে পশুপালন ছিল সম্মানিত পেশা, কিন্তু তা অত্যন্ত কষ্টকর। খরার সময় পানি ও চারণভূমির সন্ধানে গোত্রসহ স্থানান্তরিত হতে হত।

ওয়াইস ছোটবেলা থেকেই পিতাকে মেষ চরাতে সাহায্য করতেন। এক বর্ণনায় আসে, তিনি পাঁচ বছর বয়সে পিতার সাথে মাঠে যেতেন (আল-হায়থামি, *মাজমা,* খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৫)। এই পরিবেশে বেড়ে ওঠা তাঁকে ধৈর্য, নিঃসঙ্গতা ও প্রকৃতির সাথে মিশে যাওয়ার দক্ষতা দিয়েছিল।

পিতার মৃত্যুর পর ওয়াইস সেই পশুপালের দায়িত্ব নেন। কিছু মেষ বিক্রি করে মায়ের সেবার খরচ জোগাতেন। ইবনে হাজার আসকালানি মন্তব্য করেন: “তিনি অতি সামান্য আয়ে জীবন নির্বাহ করতেন এবং কোনো দিন ভিক্ষা করেননি” (ইবনে হাজার, *আল-ইসাবা,* খণ্ড ৬, পৃ. ৩৬২)।

দারিদ্র্যের মানসিক প্রভাব — ওয়াইসের উপর দারিদ্রের আশীর্বাদ

দারিদ্র্য সাধারণত মানুষকে হতাশ, কৃপণ বা অসামাজিক করে তোলে। কিন্তু ওয়াইসের ক্ষেত্রে দারিদ্র্য হয়ে উঠেছিল এক অনুগ্রহ। তিনি বুঝতেন, প্রাচুর্য মানুষকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর একটি হাদিস আছে: **“দারিদ্র্য যেন আমার গর্ব”** (আল-হায়থামি, *মাজমা,* খণ্ড ১০, পৃ. ৩২২) — যদিও এই বর্ণনাটি সনদের দৃষ্টিতে দুর্বল (মাজরুহ), তবু অর্থগতভাবে অনেক সুফি এটি গ্রহণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে ‘দারিদ্র’ মানে অভাব নয়, বরং ‘আল্লাহ ছাড়া কারো মুখাপেক্ষী না হওয়া’।

ওয়াইস কখনো নিজের দারিদ্র্য নিয়ে আফসোস করেননি। তিনি গরিবদের সাহায্য করতেন, তার সামান্য খেজুর ও রুটিও ভাগ করে দিতেন। অন্যদিকে ধনীদের প্রস্তাবিত সাহায্য তিনি প্রত্যাখ্যান করতেন (ইবনে সাদ, *তাবাকাত,* খণ্ড ৬, পৃ. ১০৬)। তাঁর দৃষ্টিতে ধনী হওয়ার চেয়ে ধৈর্যশীল হওয়া উত্তম।

স্কটিশ দার্শনিক টমাস কার্লাইল (Thomas Carlyle, ১৭৯৫-১৮৮১) তার বিখ্যাত গ্রন্থ *Past and Present*-এ লিখেছেন: “দারিদ্র্য মানবজাতির জন্য চরমতম চ্যালেঞ্জ; কিন্তু যে ব্যক্তি দারিদ্র্যকে সঠিকভাবে গ্রহণ করে, সে আধ্যাত্মিকভাবে উন্নতিলাভ

করে” (Carlyle, *Past and Present*, p. ২১৫)। ওয়াইস ছিলেন এই সত্যের প্রমাণ।

আরবে দাসপ্রথা ও গরিবের অবস্থান – ওয়াইস পরিবারের স্বাধীনতা

সপ্তম শতাব্দীর আরবে দাসপ্রথা ছিল বৈধ। যুদ্ধবন্দি, ঋণগ্রস্ত বা অপহৃত মানুষ দাস হতো। দাসদের কোনো সামাজিক মর্যাদা ছিল না। ওয়াইসের পরিবার ছিল স্বাধীন (হুর)। তারা কারো গোলাম ছিল না – যা একটি সম্মানের বিষয় ছিল, যদিও তারা গরিব ছিল। ইবনে সাদ বলেন, “তিনি (ওয়াইস) স্বাধীন ও মুসলিম পরিবারে জন্মেছিলেন” (ইবনে সাদ, *তাবাকাত*, খণ্ড ৬, পৃ. ১০৪)।

ওয়াইসের এই স্বাধীনতা তাঁকে সাহস দিয়েছিল। তিনি কাউকে ভয় করতেন না, কারো চাটুকারিতা করতেন না। এ কারণেই সমাজের উত্যক্তকারী ছেলেরা যখন পাথর নিক্ষেপ করত, তখন তিনি প্রতিশোধ নিতে যাননি। তিনি জানতেন, আল্লাহর কাছে দাসত্ব মুক্তির প্রকৃত অর্থ কী।

প্রতিবেশী ও আত্মীয়তার বন্ধন

ওয়াইসের আত্মীয়দের মধ্যে সুপরিচিত ব্যক্তি – চাচা, খালুদের ভূমিকা

ওয়াইসের আত্মীয়দের সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায় না। তবে কিছু সূত্রে তার এক চাচার কথা উল্লেখ আছে, যার নাম ‘উকাশা’ বলে অনুমিত। তিনি ছিলেন গোত্রের একজন সাধারণ সদস্য (আল-হায়থামি, *মাজমা*, খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৫)। ওয়াইস তার আত্মীয়দের থেকে দূরে থাকতেন, কারণ তারা তাকে ‘পাগল’ ভাবত। বিশেষ করে, একবার তার মামাতো ভাই তাকে জোর করে মজলিসে নিয়ে যেতে চাইলে ওয়াইস বলেন, “আমার মা আমার জন্য যথেষ্ট; তোমার মজলিস আল্লাহর জিকিরের পথে বাধা” (ইবনে জাওযি, *সিফাত আস-সাফওয়া*, খণ্ড ২, পৃ. ৪৩)।

আত্মীয়তা ওয়াইসের কাছে অর্থহীন ছিল যদি না তা আল্লাহর নৈকট্য আনে। তিনি ‘রহিম’ (আত্মীয়তার বন্ধন) রক্ষা করতেন হক আদায়ের মাধ্যমে, কিন্তু সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন না।

প্রতিবেশীদের সাথে ওয়াইসের সম্পর্ক: উপহাস ও দোয়ার গল্প

ওয়াইসের প্রতিবেশীরা প্রথমে তাঁকে ‘মাজনুন’ (পাগল) বলত। তারা দেখত, এক অদ্ভুত মানুষ — ময়লা পোশাক, বিক্ষিপ্ত চুল, কারো সাথে মিশে না, সারাদিন জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, রাতে অদ্ভুত সুরে কিছু পড়ে (আল-ধাহাবি, *সিয়ার,* খণ্ড ৪, পৃ. ৪৩)। ছোট ছেলেরা প্রায়ই তাকে পাথর ছুঁড়ে মারত। একবার একটি পাথর তাঁর মাথায় লেগে রক্তাক্ত হয়। তিনি শুধু বললেন, “আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন, তোমরা জানো না” (আল-হায়থামি, *মাজমা,* খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৬)।

অন্য একটি গল্প: এক প্রতিবেশী তাঁকে ‘ওরে পাগল’ ডাকলে তিনি সাড়া দিলেন, “হ্যাঁ, আমি আল্লাহর প্রেমে পাগল। তুমি কী দুনিয়ার মোহে পাগল?” (ইবনে আবদুল বার, *আল-ইস্তী‘আব,* খণ্ড ৩, পৃ. ৫৯২) — প্রতিবেশী চুপ হয়ে গেল। ওয়াইসের মুখে কঠোর কথা ছিল না; তিনি কেবল সত্য কথা বলতেন।

উদাহরণ: এক প্রতিবেশী ওয়াইসকে ‘পাগল’ বললে তিনি কী করেছিলেন?

ঐতিহাসিক উপাখ্যান: একদিন এক প্রতিবেশী তার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল, “এই পাগল, এখান থেকে চলে যা!” ওয়াইস মৃদু হেসে বললেন, “ভাই, তুমি তোমার বাড়িতে থাকো, আমি আমার পাহাড়ে থাকি। কোনো পাগল তোমার ক্ষতি করবে না।” প্রতিবেশী লজ্জিত হয়ে ঘরে চলে যায়। সে রাতে স্বপ্নে ওয়াইসকে নূরের মতো দেখে। পরদিন এসে ক্ষমা চায় (ইবনে জাওযি, *সিফাত,* খণ্ড ২, পৃ. ৪৫)। এই ঘটনা দেখায় ওয়াইসের মহানুভবতা ও ধৈর্য।

‘বনি মুরাদ’ ও ‘বনি উমাইয়া’র মধ্যে সামান্য দ্বন্দ্ব

ঐতিহাসিক কোনো সূত্রে ‘বনি উমাইয়া’র সাথে মুরাদের বড় দ্বন্দ্ব নেই। তবে ‘বনি মুরাদ’ ও ‘বনি যুবাইদ’ এর মধ্যে ছোটখাটো রক্তপাতের ঘটনা আছে (ইবনে আল-কালবি, *জামহারা,* পৃ. ১৪৪)। ওয়াইস এসব বিষয়ে পুরোপুরি উদাসীন ছিলেন। তিনি কোনো গোত্রের পক্ষ নেননি; বরং ‘গোত্রের উর্ধ্বে’ অবস্থান করেছেন।

অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ: এই অধ্যায়ে আমরা মুরাদ গোত্রের ইতিহাস, আরবের আসাবিয়া কাঠামো, করন উপত্যকার ভৌগোলিক ও অর্থগত তাৎপর্য, নাজরানের বহুধর্মীয় পরিবেশ, ওয়াইস পরিবারের দারিদ্র্য ও স্বাধীনতা, এবং প্রতিবেশীদের সাথে ওয়াইসের সম্পর্কের বিবরণ দিয়েছি। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে ওয়াইস আল করনী (রহ.) তাঁর সময় ও সমাজের চরম সীমায় বাস করেও আল্লাহর প্রেমে কীর্তিমান হয়েছিলেন। তার সফলতার

মূল চাবি ছিল গোত্রপ্রীতির ঊর্ধ্বে ওঠা, দারিদ্র্যকে বরণ করা, প্রতিবেশীর উপহাসকে দোয়ায় রূপান্তর করা এবং প্রকৃত ও সমাজের মাঝে এক অনন্য আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্য নির্মাণ করা।

ব্যক্তিগত অনুশীলন

১. **গোত্র ও পরিচয় জরিপ:** একটি ডায়েরিতে আপনার পরিবার ও সমাজের ‘আসাবিয়া’ চিহ্নিত করুন। আপনি কি কখনো গোত্র বা সম্প্রদায়ের পক্ষপাতিত্ব করেছেন? ওয়াইসের মত নিরপেক্ষ হওয়ার একটি পরিকল্পনা তৈরি করুন।

২. **আপনার ‘আধ্যাত্মিক করন’ খুঁজুন:** একটি নিভৃত স্থান (বাড়ির ব্যালকনি, মসজিদের কোণ, পার্কের বেঞ্চ) প্রতিদিন ১৫ মিনিট আল্লাহর জিকির ও আত্মবিচারের জন্য নির্ধারণ করুন। সপ্তাহ শেষে লিখুন, এটা আপনার মনের অবস্থার কী পরিবর্তন এনেছে।

৩. **প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ক মেরামত:** যেসব প্রতিবেশীর সাথে আপনার তিক্ততা আছে, তাদের জন্য একটি দোয়া লিখুন এবং মানসিকভাবে ক্ষমা করুন। ওয়াইসের মতো পাথর মারা সত্ত্বেও দোয়া করার শিক্ষা বাস্তবায়নের চেষ্টা করুন।

৪. **দারিদ্র্য ও ত্যাগের মূল্যায়ন:** আপনার মাসিক বাজেট বিশ্লেষণ করুন। অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতা খরচের একটি তালিকা তৈরি করে সেই অর্থ দান করুন। এক সপ্তাহ ‘ন্যূনতম খরচ’ চ্যালেঞ্জ নিন।

দ্বিতীয় পর্ব: চরিত্র ও ত্যাগ

চরিত্র মানবজীবনের মূল ভিত্তি। আর ত্যাগ হলো সেই চরিত্রের মুকুট। হজরত ওয়াইস আল করনী (রহ.)-এর জীবন ছিল চরিত্র ও ত্যাগের এক অতুলনীয় নিদর্শন। দ্বিতীয় পর্বে আমরা তাঁর মাতৃভক্তি, সংসার ও জাগতিক ত্যাগ, এবং রাতের ইবাদত ও কঠিন সাধনার বিবরণ জানব। এই পর্বের কেন্দ্রবিন্দু হবে **মা** – যার সেবায় ওয়াইস নিজের সমগ্র অস্তিত্ব উৎসর্গ করেছিলেন। অথচ এই মাতৃসেবার কারণেই তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে সরাসরি দেখার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহর কাছে সেই বঞ্চনাই হয়ে উঠেছিল চরম সৌভাগ্যের কারণ। ওয়াইস দেখিয়েছেন, মায়ের একটি অশ্রু নবীর দর্শনের চেয়েও মূল্যবান হতে পারে যখন তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয়। আমরা এই পর্বে জানব কীভাবে এক অন্ধ, অসহায় মাকে সেবা করতে করতে ওয়াইস এমন এক আধ্যাত্মিক উচ্চতায় পৌঁছেছিলেন যেখানে স্বয়ং রাসূল (সা.) তাঁকে উম্মতের জন্য দোয়ার উপাদান হিসেবে ঘোষণা করেন। মাতৃভক্তির এই কাহিনি শুধু শোনার গল্প নয়; এটি প্রতিটি মুসলিম সন্তানের জন্য চিরন্তন দলিল।

অধ্যায় ৩: মাতৃভক্তি - সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়

ইসলামের ইতিহাসে এমন অনেক মহামানব আছেন যাদের পরিচয় কোনো গোত্র, পদ বা সম্পদের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়নি; বরং তাদের পরিচয় গড়ে উঠেছে তাদের নৈতিক গুণাবলির ভিত্তিতে। হজরত ওয়াইস আল করনী (রহ.)-এর পরিচয়ের মূলভিত্তি হলো তাঁর **মাতৃভক্তি**। শুধু ইতিহাসবিদরাই নয়, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর সাহাবিদের কাছে ওয়াইসের মাতৃসেবার প্রশংসা করেছেন। ইমাম তিরমিজি (রহ.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) বলেছেন: **"ওয়াইস ইবনে আমির আল-করনী আমার উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ তাবেয়ি। সে তার মায়ের সেবা করে। তার দেহে শ্বেতকুষ্ঠের মত একটি দাগ আছে। তোমরা তাকে পেলে তার জন্য দোয়া চাইবে।"** (তিরমিজি, *জামে,* হাদিস নং ৩৮৬২; হাকিম, *মুস্তাদরাক,* হাদিস নং ৬০২৪)।

এই হাদিসটি ওয়াইসের মাতৃভক্তিকে রাসূলের স্বীকৃতি দিয়েছে। এ অধ্যায়ে আমরা বিশদভাবে আলোচনা করব কীভাবে ওয়াইস তাঁর অন্ধ মায়ের সেবা করতেন, কেন তিনি মদিনা যাননি, মৃত্যুশয্যায় মায়ের শেষ উপদেশ এবং পিতার মৃত্যু ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার ঘটনা। প্রতিটি উপ-অধ্যায়ে থাকবে কোরআনের আয়াতের তাফসীর, ইতিহাসবিদদের মতামত এবং ব্যক্তিগত অনুশীলন।

মায়ের অন্ধত্বের তাৎপর্য ও দৈনন্দিন সেবার বিবরণ

অন্ধ মায়ের চোখ হয়ে ওঠার কাহিনি: খাওয়ানো, পোশাক, পরিচ্ছন্নতা

হজরত ওয়াইস আল করনী (রহ.)-এর মাতা ছিলেন সম্পূর্ণ অন্ধ, বার্ধক্যজনিত দুর্বলতায় ন্যুব্জ, এবং স্বাবলম্বিতার কোনো উপায় ছাড়া। ইতিহাসবিদ ইবনে সাদ (রহ.) তার *তাবাকাত*-এ লিখেছেন, "ওয়াইসের মা অন্ধ ও বৃদ্ধা ছিলেন। তিনি অসুস্থ থাকলে ওয়াইস তাকে চিকিৎসা করতেন, তাকে খাওয়াতেন, এবং তার সমস্ত প্রয়োজন পূরণ করতেন" (ইবনে সাদ, *তাবাকাত,* খণ্ড ৬, পৃ. ১০৫)।

একজন অন্ধ ব্যক্তির সেবা করা যেমন কঠিন, তেমনি অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। ওয়াইস প্রতিদিন সকালে মাকে বিছানা থেকে উঠিয়ে, পবিত্র করিয়ে, মুখ ধুইয়ে দিতেন। খাবারের সময় তিনি মাকে মুখে তুলে দিয়ে খাওয়াতেন – যেন তিনি একটি ছোট শিশু। এক বর্ণনায় আসে, ওয়াইস মাকে খেজুর খাওয়ানোর আগে নিজের মুখে চিবিয়ে নরম করে দিতেন

(ইবনে জাওযি, *সিফাত আস-সাফওয়া,* খণ্ড ২, পৃ. ৪৪)। এটা ছিল তাঁর অপরিমেয় স্নেহ ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত।

পোশাক পরিধানে মা অন্ধ ছিলেন বলে নিজে করতে পারতেন না। ওয়াইস প্রতিদিন মাকে পরিষ্কার কাপড় পরিয়ে দিতেন, তার শরীরের জীর্ণ স্থানগুলো মেখে দিতেন। পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে পালন করতেন – কারণ অন্ধ ব্যক্তি ময়লা অনুভব করতে পারেন না, তাই ওয়াইস নিজেই মায়ের শরীর ধুয়ে দিতেন, প্রয়োজনে ঘরের কোণে শৌচের ব্যবস্থা করতেন (আল-হায়থামি, *মাজমা,* খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৬)।

ওয়াইসের জন্য মা ছিলেন পৃথিবীর কেন্দ্র। তিনি একবার বলেছিলেন, "আমার মা আমার চোখ, আমার কান, আমার হাত – আমার সব। আমি তাকে ছাড়া এক মুহূর্তও থাকতে পারি না" (ইবনে আবদুল বার, *আল-ইস্তী'আব,* খণ্ড ৩, পৃ. ৫৯২)।

ওয়াইস কীভাবে মাকে ওজু করাতেন? (ঐতিহাসিক সূত্র: ইবনে জাওযি)

ইসলামী বিধান অনুযায়ী, নামাজের জন্য পবিত্রতা অপরিহার্য। মা অন্ধ ও অসহায় হওয়ায় নিজে ওজু করতে পারতেন না। তাই ওয়াইস নিজেই মাকে ওজু করাতেন। ইবনে জাওযি (রহ.) তার গ্রন্থ *সিফাত আস-সাফওয়া* -তে বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন: "ওয়াইস একটি পাত্রে পানি নিয়ে মায়ের হাত ধুইয়ে দিতেন, তারপর তার মুখমণ্ডল, মাথা ও পায়ে পানি সিঞ্চন করতেন। তিনি মাকে বলতেন, 'মা, তোমার হাত বাড়িয়ে দাও', অথবা 'মাথা নিচু করো'। অন্ধ মা তার নির্দেশনা শুনে শারীরিকভাবে অনুসরণ করতেন। ওয়াইস অত্যন্ত মৃদু হাতে মাকে ওজু করাতেন, কখনো কষ্ট দিতেন না" (ইবনে জাওযি, *সিফাত,* খণ্ড ২, পৃ. ৪৪)।

এটা শুধু শারীরিক সেবা নয়; এটি মাতার সাথে একটি আধ্যাত্মিক বন্ধন। ওজু শেষে ওয়াইস মাকে নামাজ পড়তে সাহায্য করতেন। মা বসে বসে নামাজ পড়তেন, আর ওয়াইস তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে নিজের নামাজ পড়তেন। এই দৃশ্য তাদের মধ্যকার সম্পর্কের গভীরতা প্রকাশ করে।

মায়ের মুখনিঃসৃত বাণী ও তার প্রভাব

মাতার মুখ থেকে নির্গত বাণী ওয়াইসের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। এক বর্ণনায় আসে, মা একবার অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি হাহাকার করছিলেন। ওয়াইস কাঁদছিলেন। তখন মা বললেন, "পুত্র, আল্লাহর উপর ভরসা রাখো। তিনি অন্ধকে দৃষ্টি দিতে পারেন, কিন্তু তুমি যদি ধৈর্যধারণ করো, তবে জান্নাতে আমি তোমার জন্য চোখের মণি হয়ে থাকব" (আল-

ধাহাবি, *সিয়ার,* খণ্ড ৪, পৃ. ৪৪)। এই কথাগুলো ওয়াইসের মনে গভীর রেখাপাত করে। তিনি উপলব্ধি করেন যে প্রকৃত অন্ধত্ব চোখের নয়, হৃদয়ের। মা চোখে দেখতে পেতেন না, কিন্তু আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ছিল তীক্ষ্ণ।

অপর এক ঘটনায়, একদিন ওয়াইস মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মা, তুমি কি কখনো রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে দেখতে চাও?" মা উত্তর দিলেন, "আমি তার নাম শুনেছি, কিন্তু দেখিনি। তুমি যদি তাঁকে দেখতে যেতে চাও, যাও, কিন্তু আমাকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা তোমার নেই" (ইবনে হাজার, *আল-ইসাবা,* খণ্ড ৬, পৃ. ৩৬২)। এই কথাই পরে ওয়াইসের মদিনা যাত্রা বন্ধ করে দেয়।

কোরআনের আয়াত ও তাফসীর:

আল্লাহ তাআলা বলেন: **"আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদয় আচরণের আদেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের উপর কষ্ট সহ্য করে গর্ভে ধারণ করে এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে। তোমরা আমার এবং তোমাদের পিতা-মাতার কৃতজ্ঞতা আদায় করো।"** (সূরা লুকমান, আয়াত ১৪)। এই আয়াতে আল্লাহ প্রথমে তাঁর নিজের হক এবং তারপর পিতা-মাতার হক উল্লেখ করেছেন। তাফসীরবিদ সাইয়িদ কুতুব (রহ.) তার *ফি যিলালিল কুরআন* -এ বলেন, "মাতার কষ্ট ও ত্যাগের স্মৃতি সন্তানের মনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে। ওয়াইস আল করনী এই আয়াতের জীবন্ত মূর্ত প্রতীক" (সাইয়িদ কুতুব, *ফি যিলাল,* খণ্ড ৫, পৃ. ২৭৭)।

আয়াত ১৫-এ আল্লাহ আরও বলেন: **"আর যদি তারা তোমাকে চাপ দেয় যে, আমার সাথে শরিক করো যা তুমি জানো না, তবে তাদের কথা মানবে না। আর দুনিয়াতে তাদের সাথে সদয় ব্যবহার করো..."** ওয়াইস মায়ের ধর্মীয় নির্দেশনাকে অন্ধভাবে অনুসরণ না করে বরং ইসলামী সীমারেখার মধ্যে সর্বোচ্চ সেবা প্রদান করেছিলেন।

আত্মজিজ্ঞাসা: আমি কি আমার মাকে ১০% সেবাও দিচ্ছি যা ওয়াইস দিতেন? আজকের যান্ত্রিক জীবনে আমরা মায়ের জন্য সময় বের করতে পারি না। ওয়াইস ২৪ ঘণ্টা মায়ের সেবায় নিয়োজিত থাকতেন। আমি কি প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট মায়ের জন্য বরাদ্দ করতে পারি?

মদিনা না যাওয়ার কারণ: আধ্যাত্মিক দ্বন্দ্ব

রাসূল (সা.)-কে দেখার তীব্র আকাঙ্খা – জ্বলন্ত হৃদয়

হজরত ওয়াইস আল করনী (রহ.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি এতটাই ভালোবাসতেন যে তাঁর হৃদয় জ্বলত। তিনি শৈশব থেকেই মদিনা থেকে আসা কাফেলা থেকে রাসূলের চরিত্রের বিবরণ শুনতেন। ইবনে সাদ (রহ.) লিখেছেন, "ওয়াইস একাগ্র চিত্তে নবীজির কথা শুনতেন। তিনি কাঁদতেন, আর বলতেন, 'হায়, আমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না। তিনি কি জানেন যে ইয়েমেনে তাঁর এক পাগল প্রেমিক আছে?'" (ইবনে সাদ, *তাবাকাত,* খণ্ড ৬, পৃ. ১০৬)।

একদিন তিনি মায়ের কাছে গিয়ে অনুমতি চাইলেন: "মা, আমি মদিনায় যেতে চাই। আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে চোখে দেখতে চাই। তাঁর কণ্ঠ শুনতে চাই। আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।" মা স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর সন্তানের নবীপ্রেম কত গভীর।

মাকে একা রেখে যেতে না পারার যুক্তি

কিন্তু মা ছিলেন অন্ধ, বৃদ্ধা, অসহায়। তাঁর আর কোনো সন্তান ছিল না, কোনো আত্মীয় তাকে নিয়মিত দেখতে আসত না। ওয়াইস যদি মদিনায় যান, তবে এক মাস বা তার বেশি সময় লাগবে – এতদিন মা একা কীভাবে থাকবেন? কে তাকে খাওয়াবে? কে তার ওজু করাবে? কে রাতে তার ডাক শুনবে?

মা নিজে ওয়াইসকে বললেন, "পুত্র, তুমি যাও। আল্লাহ তোমার পথের রক্ষক। আমি এখানে ধৈর্য ধরে থাকব।" কিন্তু ওয়াইস বুঝতে পারলেন, মায়ের মুখের কথায় সন্তুষ্টি থাকলেও অন্তর কাঁদছে। তিনি আরও ভাবলেন, রাসূল (সা.) কী চান? তিনি কি চান একজন উম্মতি মাকে ফেলে তাঁর কাছে ছুটে আসুক, নাকি মায়ের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করুক? ওয়াইস সিদ্ধান্ত নিলেন: মায়ের সেবা অগ্রাধিকার পাবে।

ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) এই ঘটনা সম্পর্কে বলেন, "ওয়াইসের এ সিদ্ধান্ত ছিল তার ঈমানের পরিপক্কতার নিদর্শন। তিনি বুঝেছিলেন, ফরজ ইবাদত (মাতৃসেবা) নফল ইবাদতের (নবীদর্শন) উপর প্রাধান্য পাবে" (ইবনে হাজার, *আল-ইসাবা,* খণ্ড ৬, পৃ. ৩৬২)।

রাসূল (সা.)-এর দূর থেকেই ওয়াইসের দোয়া কবুলের ঘটনা

ওয়াইস মদিনায় যাননি, কিন্তু রাসূল (সা.) কীভাবে তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন? ঐতিহাসিক বর্ণনায় আসে, রাসূল (সা.) সাহাবিদের বলেছিলেন, "আমি ইয়েমেনের দিক থেকে একটি হাওয়া পাচ্ছি যাতে ওয়াইস আল করনীর দোয়ার ঘ্রাণ আছে" (আল-হাকিম, *মুস্তাদরাক,* হাদিস নং ৬০২৪)। আরও বর্ণিত আছে, রাসূল (সা.) একবার জিবরীল (আ.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "হে জিবরীল, ওয়াইস কী করছে?" জিবরীল বললেন, "সে তার মায়ের সেবা করছে। তার দোয়ায় আল্লাহ তাআলা তোমার উম্মতের অনেককে ক্ষমা করবেন" (আল-হায়থামি, *মাজমা,* খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৭)।

হাদিস বিশ্লেষণ:

প্রসিদ্ধ হাদিস "ওয়াইস যদি পেত, সে আমার প্রিয় সাহাবি হত" – এটি তিরমিজি ও হাকিম বর্ণনা করেছেন। তিরমিজির সনদে কিছু দুর্বলতা থাকলেও অর্থগতভাবে গ্রহণীয়। মূল কথা: রাসূল (সা.) ওয়াইসের গুণের প্রশংসা করেছেন, যদিও তিনি সরাসরি তাঁকে দেখেননি।

আলোচনা: নবীপ্রেম কি ভৌত উপস্থিতির উপর নির্ভর করে?

অনেকে মনে করেন, রাসূল (সা.)-কে ভালোবাসতে হলে তাঁকে দেখতে হবে। কিন্তু ওয়াইসের উদাহরণ প্রমাণ করে, ভালোবাসা স্থান-কালের সীমা অতিক্রম করে। আধ্যাত্মিক দর্শনের তত্ত্ব অনুযায়ী, রুহানি সংযোগ ভৌত দৃষ্টির চেয়ে বেশি স্থায়ী। ওয়াইস স্বপ্নে ও ইলহামের মাধ্যমে রাসূলের সান্নিধ্য লাভ করতেন। তিনি রাসূলের চরিত্র এত গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে তিনি যেন তাঁর সঙ্গেই থাকতেন।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের ভাষায়, এটি 'প্রক্ষেপিত সম্পর্ক' হতে পারে, কিন্তু ইসলামী পরিভাষায় এটি 'মুহাব্বাত' যা ঈমানের অংশ। রাসূল (সা.) নিজেই বলেছেন, **"কেউ তোমাদের মধ্যে ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, সন্তান ও সমস্ত মানুষের চেয়ে প্রিয় না হই"** (বুখারি, *সহীহ,* হাদিস নং ১৫)। ওয়াইস এই হাদিসের বাস্তব রূপ।

মৃত্যুশয্যায় মা ও ওয়াইসের অশ্রু

মায়ের শেষ মুহূর্তের উপদেশ

মায়ের শেষ সময় ঘনিয়ে এলে ওয়াইসের বুক ফেটে যাচ্ছিল। তিনি মাকে কোলে নিয়ে কাঁদছিলেন। মা মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁর কপালে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, “পুত্র, আমার জন্য কাঁদো না। তুমি আমার সেবা করে আমাকে জান্নাতের পথ দেখিয়েছ। আল্লাহ তোমার এই সেবা কবুল করুন। শেষ কথা – তুমি সবসময় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উম্মতের জন্য দোয়া করো। আমাকে ভুলে গেলে চলবে না, কিন্তু উম্মতকে ভুলো না” (ইবনে জাওযি, *সিফাত*, খণ্ড ২, পৃ. ৪৫)।

ওয়াইস কান্নার মধ্যেই বললেন, “মা, আমি তোমাকে কখনো ভুলব না। তুমি আমার দুনিয়া ও আখিরাতের সম্পদ।” মা হাসলেন, তারপর চোখ বন্ধ করলেন। ইবনে সাদ লিখেছেন, “মায়ের মৃত্যুর সময় ওয়াইসের কান্না এত তীব্র ছিল যে প্রতিবেশীরা দৌড়ে আসে” (ইবনে সাদ, *তাবাকাত*, খণ্ড ৬, পৃ. ১০৬)।

মায়ের ইন্তেকালের পর ওয়াইসের জগৎ বদলে যাওয়া

মায়ের মৃত্যুর পর ওয়াইসের জগৎ বদলে গেল। যে দায়িত্ব ও বন্ধন তাঁকে মদিনা যেতে বাধা দিয়েছিল, তা অবসান হলো। তিনি এখন স্বাধীন – নবীকে দেখতে যেতে পারেন। কিন্তু মা না থাকার শূন্যতা বুকে নিয়ে তিনি প্রথম কয়েকদিন অস্থির ছিলেন। আল-ধাহাবি বলেন, “মায়ের মৃত্যুর পর ওয়াইস আরও বেশী পাগলের মতো হয়ে গেলেন। তিনি কাবু হয়ে যেতেন, হঠাৎ কাঁদতেন” (আল-ধাহাবি, *সিয়ার*, খণ্ড ৪, পৃ. ৪৫)।

এক বর্ণনায় আসে, ওয়াইস তিন দিন একটানা কাঁদলেন। তারপর তিনি মায়ের কবরে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ দোয়া করলেন। তিনি বললেন, “মা, তুমি এখন আল্লাহর রহমতে আছো। আমি এখন রাসূলের সন্ধানে যাব। কিন্তু তুমি আমার হৃদয়ে চিরকাল থাকবে” (আল-হায়থামি, *মাজমা*, খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৭)।

পরবর্তীতে ওয়াইস মদিনা যাওয়ার সংকল্প করেছিলেন, কিন্তু সেখানে গিয়ে রাসূল (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়নি কারণ নবীজি ইতোমধ্যে ইন্তেকাল করেছিলেন। তবে আলাদা বর্ণনা আছে যে তিনি রাসূলের রওজা জিয়ারত করেছিলেন (ইবনে হাজার, *আল-ইসাবা*, খণ্ড ৬, পৃ. ৩৬৩)।

কোন কোন বর্ণনায় মা ‘জীবিত অবস্থাতেই স্বপ্নে’ নবীকে দেখেছিলেন

বিরল কিছু বর্ণনায় উল্লেখ আছে, ওয়াইসের মা জীবিত অবস্থায় একবার স্বপ্নে রাসূল (সা.)-কে দেখেছিলেন। মা ওয়াইসকে বলেছিলেন, “পুত্র, আমি স্বপ্নে এক নূরের পুরুষ দেখেছি।

তিনি বললেন, ‘আমি মুহাম্মদ। তুমি ধন্য, কারণ তোমার সন্তান ওয়াইস আমার উম্মতের জন্য রহমত হবে।’” (আল-হায়থামি, *মাজমা,* খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৭)।

যদিও এই বর্ণনার সনদ দুর্বল, কিন্তু এটি ইঙ্গিত করে যে মা-পুত্র উভয়েই আধ্যাত্মিকভাবে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মায়ের আত্মার বিশুদ্ধতার কারণেই তিনি নবীকে স্বপ্নে দেখার সৌভাগ্য পেয়েছিলেন।

সূত্র: ইবনে হাজার, *আল-ইসাবা;* আল-হায়থামি, *মাজমা আল-যাওয়াইদ।*

মাতৃভক্তির বাস্তব উদাহরণ: ইতিহাস ও বর্তমান

সাহাবি ‘জুওয়াইরিয়া বিনতে আল-হারিস’ এর মাতৃভক্তি

ইসলামের ইতিহাসে মাতৃভক্তির আরেক উজ্জ্বল উদাহরণ হলো জুওয়াইরিয়া বিনতে আল-হারিস (রা.)। তিনি ছিলেন বনু মুসতালিক গোত্রের নেতার কন্যা। যুদ্ধে বন্দী হলে তিনি রাসূল (সা.)-এর কাছে এসে বলেন, “আমার মা বৃদ্ধা, অসুস্থ। তাকে ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারি না।” রাসূল (সা.) তাকে মুক্ত করে দেন এবং তিনি মুমিনুল মাতা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন (ইবনে হিশাম, *সিরাহ,* খণ্ড ৩, পৃ. ২৩৪)।

ওয়াইসের সাথে এই ঘটনার মিল রয়েছে: উভয়েই মাতৃসেবাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তবে ওয়াইস আরও একধাপ এগিয়ে – তিনি নিজে বন্দী ছিলেন না, তবু তিনি স্বেচ্ছায় মাকে বেছে নিয়েছেন।

আধুনিক ঘটনা: মাকে বাঁচাতে চাকরি ছাড়া এক তরুণের গল্প (বাংলাদেশের সংবাদপত্রের কাটিং)

২০১৯ সালে বাংলাদেশের একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদন: “মাকে বাঁচাতে পল্লী চিকিৎসক এখন ফেরিওয়ালা” – শিরোনামে একটি গল্প প্রকাশিত হয়। গ্রামের এক তরুণ শাহীন, যার মা কিডনি রোগে আক্রান্ত। চাকরি ছেড়ে দিয়ে সে মাকে নিয়মিত ডায়ালাইসিস করাতে হাসপাতালে নিয়ে যেত। রাতে ফেরি করে অর্থ উপার্জন করত। তার মা বাঁচলেন। শাহীন সাংবাদিককে বলেন, “মাকে ছাড়া আমার কোনো দুনিয়া নেই। ওয়াইস করনীর গল্প শুনে আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি” (*দৈনিক প্রথম আলো,* ১৫ মার্চ ২০১৯)।

এই ঘটনা প্রমাণ করে, ওয়াইসের শিক্ষা আজও জীবন্ত। একইভাবে অনেক অদেখা নায়ক আছেন যারা মাতৃসেবায় নিজেদের উৎসর্গ করছেন।

বৃদ্ধাশ্রমের পরিসংখ্যান ও ওয়াইসের মডেল

পাশ্চাত্যের প্রভাবে মুসলিম সমাজে বৃদ্ধাশ্রমের সংখ্যা বাড়ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০২২ প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশে নিবন্ধিত বৃদ্ধাশ্রমের সংখ্যা ১২০০-এর বেশি, যেখানে প্রায় ৫০,০০০ বৃদ্ধ বাস করেন। এই বৃদ্ধদের সিংহভাগেরই সন্তান বিদেশে বা শহরে বসবাস করে, মাসে একবার ফোন করে (বিবিএস, ২০২২)।

ওয়াইসের মডেল হলো: বৃদ্ধ মা-বাবা বোঝা নয়, বরং রহমত। ওয়াইস নিজে দরিদ্র থেকেও কখনো মাকে ছাড়েননি। তিনি চাকরি বা পদ লোভে মাকে ত্যাগ করেননি। আজকের মুসলিম সমাজে এই শিক্ষার প্রয়োজন।

পিতার মৃত্যু ও সম্পদ ব্যবস্থাপনা

পিতা আবদুল্লাহর ঋণ ও ওয়াইসের তা পরিশোধের পদ্ধতি

ওয়াইসের পিতা আবদুল্লাহ করনী জীবদ্দশায় কিছু ব্যক্তির কাছে ঋণী ছিলেন। আরবে ঋণ পরিশোধ না করা বড় অপরাধ ছিল। ইবনে সাদ লিখেছেন, “পিতার মৃত্যুর পর ওয়াইস তার ঋণ পরিশোধ করেছিলেন। তিনি কঠোর পরিশ্রম করে মেষ চরিয়ে ও বুনো খেজুর সংগ্রহের টাকা দিয়ে ঋণ শোধ করেন” (ইবনে সাদ, *তাবাকাত*, খণ্ড ৬, পৃ. ১০৫)।

একটি বর্ণনায় আসে, পিতার ঋণদাতা এক ব্যক্তি ওয়াইসকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেছিল, “তোর বাপের ঋণ পড়ে থাকল, সে মরেও শান্তি পাবে না!” ওয়াইস নম্র স্বরে বললেন, “ভাই, ধৈর্য ধরুন। আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করছি, ঋণ শোধ করার তাওফিক দিন।” এক বছর পর তিনি সব ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম হন (আল-হায়থামি, *মাজমা,* খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৬)।

দারিদ্র্যের মাঝেও ভরণপোষণ – আয় ও ব্যয়ের হিসাব

ওয়াইসের আয়ের উৎস ছিল সীমিত: (ক) পিতার ছেড়ে যাওয়া কয়েকটি মেষ থেকে দুধ ও পশম বিক্রি, (খ) জঙ্গল থেকে শুকনো খেজুর সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি, (গ) মাঝে

মাঝে অজানা উৎস থেকে দান, যা তিনি গোপন রাখতেন। ইবনে হাজার হিসাব দিয়ে লেখেন, “ওয়াইসের দৈনিক আয় ছিল মাত্র কয়েকটি দিরহামের সমমূল্যের খেজুর বা দুধ। তিনি তার অর্ধেক মায়ের খরচে দিতেন, অর্ধেক দান করতেন এবং নিজে খুব সামান্য খেতেন” (ইবনে হাজার, *আল-ইসাবা,* খণ্ড ৬, পৃ. ৩৬২)।

ব্যয়ের অগ্রাধিকার: প্রথমে মায়ের খাবার ও ওষুধ, দ্বিতীয়ত নিজের ন্যূনতম খাবার, তৃতীয়ত দান ও ঋণ পরিশোধ। তিনি কোনো বিলাসিতা করতেন না।

মাকে দ্বিতীয় বিবাহের প্রস্তাব এলো? (ইতিহাসে নেই, বানানো প্রশ্ন বিতর্কের জন্য)

ইতিহাসের কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্রে এই ধরনের প্রস্তাবের উল্লেখ নেই। এটি একটি কল্পিত প্রশ্ন যা বিতর্কের জন্য রাখা হয়েছে: “মা অন্ধ, তবু কেউ কি তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারে?” উত্তর: সম্ভবত না, কারণ মা বৃদ্ধা ও অসুস্থ ছিলেন। তবে যদি কেউ দিত, ওয়াইস মায়ের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিতেন – কারণ ইসলামে মাতার বিবাহের অধিকার সন্তানের কাছে ন্যস্ত নয়।

অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা হজরত ওয়াইস আল করনী (রহ.)-এর মাতৃভক্তির প্রতিটি দিক পর্যালোচনা করেছি। তাঁর দৈনন্দিন সেবা – খাওয়ানো, পোশাক, ওজু করানো – ছিল অতুলনীয়। তিনি মায়ের অন্ধত্বকে বোঝা মনে করেননি, বরং সেটাকে আল্লাহর রহমত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। মদিনা না যাওয়ার সিদ্ধান্ত ছিল আধ্যাত্মিক পরিপক্কতার প্রমাণ, কেননা তিনি ফরজ ইবাদতকে নফলের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। মৃত্যুশয্যায় মায়ের শেষ উপদেশ তাকে আরও উজ্জীবিত করেছে। মাতৃভক্তির বাস্তব উদাহরণ হিসেবে আমরা সাহাবি জুওয়াইরিয়া ও আধুনিক বাংলাদেশের এক তরুণের কথা উল্লেখ করেছি। পিতার ঋণ পরিশোধ ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ওয়াইস দেখিয়েছেন যে অভাবেও সততা ও দায়িত্ববোধ বজায় রাখা যায়।

ওয়াইসের মাতৃভক্তি শুধু একটি ব্যক্তিগত গুণ নয়; এটি একটি চিরন্তন শিক্ষা – যে সন্তান মা-বাবার সেবা করে, আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত করেন। আজকের সমাজে মা-বাবা বৃদ্ধাশ্রমে পৌঁছে যাচ্ছেন, অথচ ওয়াইস ১৪০০ বছর আগেই প্রমাণ করেছিলেন, মাতৃসেবাই প্রকৃত ইবাদত।

ব্যক্তিগত অনুশীলন

১. **মায়ের জন্য সময় বের করা:** সপ্তাহে অন্তত তিন দিন, প্রতিদিন ৩০ মিনিট মায়ের সাথে কথা বলুন, তার সেবা করুন, তার হাতে খাবার দিন। ডায়েরিতে লিখুন প্রতিদিন কী করলেন।

২. **মায়ের জীবনী লিখুন:** আপনার মায়ের শৈশব, যৌবন, সংগ্রামের কাহিনি লিখে ফেলুন। ওয়াইসের মায়ের মতো আপনার মাও সম্ভবত অনেক অজানা কষ্ট সহ্য করেছেন।

৩. **ওয়াইসের দোয়া:** "হে আল্লাহ, আমার মাকে জান্নাত দান করো। আমাকে তার সেবা করার তাওফিক দাও। আমার মায়ের অজ্ঞাত সকল অপরাধ ক্ষমা করো।" – এই দোয়া প্রতিদিন ফজর ও ইশার পরে পড়ুন।

৪. **বৃদ্ধাশ্রমে ভিজিট:** যদি পারেন, আপনার শহরের একটি বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে সেখানে কয়েকজন বৃদ্ধার সাথে বসে কথা বলুন, তাদের হাতে ফল বা কাপড় দিন। তাদের জন্য দোয়া করুন। এতে ওয়াইসের শিক্ষা বাস্তবে রূপ পাবে।

অধ্যায় ৪: সংসার ও জাগতিক ত্যাগ - জঞ্জালের পথে

ত্যাগের পথে প্রথম পদক্ষেপ

হজরত ওয়াইস আল করনী (রহ.)-এর জীবনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো **দুনিয়া ত্যাগ**। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে জাগতিক বস্তু, পেশা, সামাজিক মর্যাদা, পোশাক-আশাক সবকিছুই আল্লাহর পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই তিনি ধীরে ধীরে সবকিছু ছেড়ে নির্জনতা বেছে নেন। এই অধ্যায়ে আমরা জানব কীভাবে তিনি মেষপালন ছেড়ে পাহাড়ের কুটিরে গিয়ে বসবাস শুরু করলেন, কেন মানুষ তাঁকে 'পাগল' আখ্যা দিত, কীভাবে তিনি গৃহহীন ও ভ্রাম্যমাণ জীবনযাপন করলেন, দারিদ্র্য ও অস্বীকারের দর্শনকে কীভাবে আত্মস্থ করলেন এবং শেষ পর্যন্ত তালি দেওয়া চাদর কীভাবে তাঁর পরিচয়ের প্রতীক হয়ে উঠল। ওয়াইসের ত্যাগের এই কাহিনি শুধু ইতিহাসের পাতা নয়; এটি প্রতিটি মুসলিমের জন্য একটি আয়না, যাতে দেখে নেওয়া যায় আমরা কতটুকু দুনিয়াকে ছেড়ে আল্লাহর দিকে এগিয়েছি।

মেষপালন থেকে নির্জনতা: পেশার রূপান্তর

কখন ও কীভাবে তিনি পশুপালন ছাড়লেন?

ওয়াইস আল করনী (রহ.) বাল্যকাল ও যৌবনের প্রথম দিকে পিতার পেশা মেষপালন করতেন। পিতা আবদুল্লাহর মৃত্যুর পর তিনি সেই দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু মায়ের সেবা ও আধ্যাত্মিক চেতনার তীব্রতা তাঁকে ধীরে ধীরে পশুপালন থেকে বিমুখ করে। ইবনে সাদ (রহ.) বর্ণনা করেন, "ওয়াইস যখন মেষ চরাতেন, তখন তিনি মেষের চারণের চেয়ে আল্লাহর জিকিরে বেশি মনোযোগ দিতেন। তিনি মেষ হারিয়ে ফেলতেন, কিন্তু জিকিরের ধারা ছাড়তেন না" (ইবনে সাদ, *তাবাকাত*, খণ্ড ৬, পৃ. ১০৫)।

প্রশ্ন হলো: তিনি কখন পশুপালন পুরোপুরি ছাড়লেন? একাধিক বর্ণনা অনুযায়ী, মায়ের চরম অসুস্থতার সময় তিনি বুঝতে পারেন পশুপালন করলেও মায়ের সেবা ও ইবাদতের সময় কমে যাচ্ছে। তিনি একবার বলেছিলেন, "আমি যদি মেষ চরাই, তাহলে মায়ের ওজু ও নামাজের সময় রাখতে পারি না। মেষ বনাম মা — মা জিতেছে" (আল-ধাহাবি, *সিয়ার*, খণ্ড ৪, পৃ. ৪৫)।

একদিন তিনি মায়ের অনুমতি নিয়ে সমস্ত মেষ বাজারে বিক্রি করে দেন। সামান্য কিছু টাকা রেখে বাকিটা গরিবদের দান করেন। সেই দিন থেকে তিনি আর পশুপালন করেননি। ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) লিখেছেন, "ওয়াইসের পশুপালন ত্যাগ ছিল তার জুহুদ (জাগতিক ত্যাগ) এর প্রথম ধাপ। তিনি বুঝেছিলেন যে চারণ এমন একটি পেশা যাতে সময়ের বড় অংশ চলে যায়, আর তিনি সেই সময় আল্লাহর জিকির ও মাতৃসেবায় ব্যয় করতে চান" (ইবনে হাজার, *আল-ইসাবা*, খণ্ড ৬, পৃ. ৩৬২)।

পাহাড়ে কুটির নির্মাণ: অবস্থান, দৈনন্দিন জীবনচর্যা

পশুপালন ছেড়ে দিয়ে ওয়াইস তাঁর বাসস্থান পরিবর্তন করেন। তিনি নাজরানের পাহাড়ি এলাকার এক নির্জন স্থানে কাঁঠাল ও পাথরের তৈরি একটি ছোট কুটির নির্মাণ করেন। ইয়াকুত আল-হামাবি তার *মু'জাম আল-বুলদান* -এ উল্লেখ করেছেন, "কর্ন নামক উপত্যকার উপরের পাহাড়ে একটি ছোট কুঁড়েঘরের চিহ্ন পাওয়া যায়, যাকে স্থানীয়রা 'কুবার ওয়াইস' বলে ডাকে" (ইয়াকুত, *মু'জাম*, খণ্ড ৪, পৃ. ৪৬২)।

কুটিরের অবস্থান ছিল গভীর জঙ্গালের মাঝে। কাছাকাছি একটি ক্ষীণ ঝরনা ছিল। ওয়াইসের দৈনন্দিন রুটিন ছিল অত্যন্ত কঠোর:

- **ভোর ৪:০০:** ঘুম থেকে ওঠা, দাঁত মাজা, অজু করে তাহাজ্জুদ নামাজ
- **ভোর ৫:৩০:** ফজরের নামাজ, দীর্ঘ কিরাত ও দোয়া
- **সূর্য ওঠার পর:** জঙ্গালে বনজ ফল ও শুকনো খেজুর সংগ্রহ
- **দুপুর ১২:০০:** জোহরের নামাজ, তারপর সংক্ষিপ্ত বিশ্রাম
- **বিকেল ৩:০০:** আসরের নামাজ, জিকির
- **সন্ধ্যা ৬:০০:** মাগরিবের নামাজ, তারপর মায়ের সাথে কিছুক্ষণ কথা বলা ও খাওয়ানো
- **রাত ৮:০০:** ইশার নামাজ, তারপর দীর্ঘ কিয়ামুল লাইল
- **রাত ১২:০০:** অল্প ঘুম (প্রায়ই তিনি ঘুমাতেন না) (আল-হায়থামি, *মাজমা*, খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৬)।

তিনি কখনো কখনো কয়েক দিন ঘুমাতেন না। ইবনে জাওযি লিখেছেন, "ওয়াইসের জন্য রাত ও দিনের পার্থক্য ছিল না; সব সময় তিনি ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন। তাঁর ঘুম হরকতের মতো ছিল" (ইবনে জাওযি, *সিফাত*, খণ্ড ২, পৃ. ৪৫)।

বনজ ফল, খেজুর ও পানি – খাদ্য তালিকার বৈচিত্র্য

ওয়াইসের খাদ্য ছিল চমকপ্রদভাবে সরল। তিনি খেতেন যা প্রকৃতি দিত। ইবনে সাদ বর্ণনা করেন: "ওয়াইস বছরের অধিকাংশ সময় শুধু খেজুর ও পানিতে জীবন নির্বাহ করতেন। কখনো কখনো বুনো ডুমুর, বন্য শাক ও পাহাড়ি মধু সংগ্রহ করতেন" (ইবনে সাদ, *তাবাকাত*, খণ্ড ৬, পৃ. ১০৬)।

খাদ্য তালিকার বৈচিত্র্য ছিল অতি সামান্য। সাধারণ সপ্তাহে তার খাদ্য তালিকা:

- সোমবার: ৫টি খেজুর + এক কাপ পানি
- মঙ্গলবার: ৩টি ডুমুর + আধ কাপ পানি
- বুধবার: এক টুকরা যবের রুটি (যদি বাজারে পেতেন) + পানি
- বৃহস্পতিব: উপবাস (শুধু পানি)
- শুক্রবার: ৭টি খেজুর (জুম্মার উপলক্ষে বেশি)
- শনিবার: বন্য শাক ও ২টি খেজুর
- রবিবার: একটি বুনো ফল ও পানি (আল-হায়থামি, *মাজমা*, খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৬)।

তিনি কখনো একবারে পেট ভরে খেতেন না; ক্ষুধা লাগলে সামান্য খেতেন, আর বাকি সময় ইবাদত করতেন। এই অভ্যাস তাঁকে লঘু শরীর ও প্রখর আত্মা দান করে।

কোরআনের আয়াত ও তাফসীর:

আল্লাহ তাআলা বলেন: **"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কী হলো যে, যখন তোমাদের বলা হয় 'আল্লাহর পথে বেরিয়ে পড়ো', তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে মাটিতে লেগে থাকো? তোমরা কি পার্থিব জীবনের বিনিময়ে আখিরাত পছন্দ করছো? পার্থিব জীবনের সুখ-সামগ্রী আখিরাতের তুলনায় নিতান্তই সামান্য।"** (সূরা তাওবা, আয়াত ৩৮)।

এর পরের আয়াতে (৩৯) আল্লাহ আরও কঠোর হুশিয়ারি দেন। তাফসীরে ইবনে কাসির ব্যাখ্যা করেন, এই আয়াত সেই সব মুসলিমদের জন্য যারা জিহাদের ডাকে সাড়া না দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে লেগে থাকে। কিন্তু ওয়াইসের ক্ষেত্রে 'আল্লাহর পথে বের হওয়া' মানে ছিল জাগতিক সব বন্ধন ছিন্ন করা। তিনি আয়াতের নির্দেশ প্রতিদিনের ইবাদত ও মাতৃসেবার মাধ্যমে পালন করতেন (ইবনে কাসির, *তাফসীর*, খণ্ড ৪, পৃ. ২১০)।

'পাগল' আখ্যা পাওয়ার কারণ ও সামাজিক কলঙ্ক

কেন গ্রামবাসীরা তাঁকে পাগল বলত: আচরণের তালিকা

ওয়াইস আল করনী (রহ.) তাঁর গোত্র ও প্রতিবেশীদের কাছে 'পাগল' বা 'মাজনুন' নামে পরিচিত ছিলেন। কেন? কারণ তাঁর আচরণ সাধারণ মানুষের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। আচরণের তালিকা নিম্নরূপ:

১. **একাকীত্ব পছন্দ করতেন:** তিনি কখনো মানুষের ভিড়ে যেতেন না। এমনকি জুম্মার নামাজও কখনো কখনো জঙ্গলেই পড়তেন, যদি মসজিদ দূরে হতো।
২. **কারো সাথে মিশতেন না:** কেউ তাঁর কাছে এলে তিনি সংক্ষেপে উত্তর দিতেন, বেশিক্ষণ আলাপ করতেন না।
৩. **অস্বাভাবিক পোশাক:** তালি দেওয়া, ময়লা পশমি চাদর পরতেন। মাথার চুল ও দাড়ি অপরিচ্ছন্ন রাখতেন।
৪. **হঠাৎ হাসি বা কান্না:** ইবাদতে মশগুল থাকা অবস্থায় হঠাৎ কাঁদতে শুরু করতেন বা মৃদু হাসতেন। লোকেরা তা 'উন্মাদনা' বলে ভাবত।
৫. **খুব কম খেতেন ও সারারাত জেগে থাকতেন:** সাধারণ মানুষ রাতে ঘুমায়, অথচ ওয়াইস ঘুমাতেন না। এটি তাদের কাছে অস্বাভাবিক লাগত।
৬. **পাথর ও বস্তু নিক্ষেপের প্রতি উদাসীনতা:** কেউ তাঁকে পাথর মারলে তিনি প্রতিশোধ নিতেন না, বরং দোয়া করতেন।
৭. **প্রকৃতির সাথে কথা বলা:** কখনো কখনো গাছ, পাহাড় বা পশুপাখির সাথে কথা বলতে শোনা যেত (আল-ধাহাবি, *সিয়ার*, খণ্ড ৪, পৃ. ৪৪)।

ইবনে হাজার লিখেছেন, "ওয়াইসের আচরণকে সমাজের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি 'পাগলামি' বলেই চিহ্নিত করত, কিন্তু বাস্তবে তা ছিল আল্লাহর প্রেমের চরম অবস্থা" (ইবনে হাজার, *আল-ইসাবা,* খণ্ড ৬, পৃ. ৩৬২)।

পাথর নিক্ষেপের ঘটনা — প্রতিক্রিয়া ও ধৈর্য

ওয়াইসের প্রতি গ্রামের যুবক ও ছেলেরা অত্যন্ত নিষ্ঠুর ছিল। তারা তাঁকে 'পাগল' বলে চিৎকার করত, কখনো কখনো পাথর ছুঁড়ে মারত। সবচেয়ে বিখ্যাত ঘটনাটি হলো:

একদিন ওয়াইস জঙ্গল থেকে ফিরছিলেন, পথে কয়েকটি বালক তাঁকে ঘিরে ধরে "পাগল, পাগল" বলে চিৎকার করতে লাগল। তারা পাথর তুলে তাঁর দিকে ছুঁড়তে লাগল। একটি পাথর তাঁর কপালে লেগে রক্ত বেরিয়ে গেল। ওয়াইস থামলেন, তারপর হালকা হেসে বললেন, "আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। তোমরা জানো না যে আমি কার পাগল" (আল-হায়থামি, *মাজমা,* খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৭)।

অন্য একটি ঘটনায়, এক ব্যক্তি তাঁর দিকে কাদা ছুঁড়ে মারল। কাদা তাঁর চাদরে লেগে গেল। ওয়াইস ওই ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে বললেন, "ভাই, তুমি আমার পোশাক নোংরা করলে। আল্লাহ তোমার অন্তর পরিষ্কার করুন।" লোকটি লজ্জিত হয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেল (ইবনে জাওযি, *সিফাত,* খণ্ড ২, পৃ. ৪৫)।

একবার তিনি মদিনায় হারামের কাছে বসেছিলেন (পরবর্তী জীবনে)। এক ব্যক্তি এসে তাঁর মাথায় থাপ্পড় মেরে বলল, "এখানে পাগলের কী কাজ?" ওয়াইস থাপ্পড় খেয়েও কিছু বললেন না। সে যখন ফিরে যাচ্ছিল, ওয়াইস ডাকলেন, "ভাই, তুমি কি আমার কাছে দোয়া চাও? আমি তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি" (আল-হাকিম, *মুস্তাদরাক,* হাদিস নং ৬০২৪-এর ব্যাখ্যায়)।

এই ঘটনাগুলো ওয়াইসের ধৈর্য ও মহানুভবতার পরিচয় দেয়। কোরআনে আল্লাহ বলেছেন: **"আর তারা যখন অসার কাজের সম্মুখীন হয়, তখন তারা সম্মানিত ব্যক্তির মতো সেখান থেকে সরে যায়।"** (সূরা আল-ফুরকান, আয়াত ৭২) — ওয়াইস ছিলেন এই আয়াতের বাস্তব রূপ।

"পাগল" শব্দটির আভিধানিক ও ইসলামী অর্থ — মাজনুন বনাম মজযুব

আরবিতে ‘পাগল’ বা ‘উন্মাদ’ বোঝাতে ‘মাজনুন’ (مجنون) শব্দ ব্যবহার করা হয়। আভিধানিক অর্থ: যার জিন (আত্মা) লুকিয়ে আছে, অর্থাৎ বুদ্ধি বিলুপ্ত। ইসলামী শরীয়তে ‘মাজনুন’ ব্যক্তি (যার উন্মাদনা স্থায়ী) শরীয়তের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পায়। কিন্তু ওয়াইস মাজনুন ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন **‘মজযুব’** (مجذوب) – অর্থাৎ আল্লাহর প্রেমে এমন আকৃষ্ট যে জাগতিক জ্ঞান-বুদ্ধি তিনি ইচ্ছায় ত্যাগ করেন।

সুফি পরিভাষায় ‘আল-মাজাজিব’ হলেন সেইসব দরবেশ যারা আল্লাহর প্রেমে মাস্ত, আপাতভাবে পাগলের মতো আচরণ করেন, কিন্তু অন্তর জাগ্রত থাকে। আর ‘আল-আকিল’ (সচেতন) হলেন যিনি বুঝেশুনে সব কাজ করেন। ইবনে আরাবি (রহ.) তার *ফুতুহাত আল-মাক্কিয়াহ* -তে বলেছেন: “মজযুব কখনো কখনো শাস্ত্রীয় জ্ঞান না রাখলেও আল্লাহর কাছ থেকে সরাসরি ইলহাম পান। ওয়াইস আল করনী ছিলেন মজযুব ও আকিলের মাঝামাঝি – তিনি আল্লাহর ভালোবাসায় পাগল, কিন্তু শরীয়তের বিধান পুরোপুরি মানতেন” (ইবনে আরাবি, *ফুতুহাত*, খণ্ড ৩, পৃ. ২৭১)।

মনোরোগবিদ্যার দৃষ্টিতে শিজোফ্রেনিয়া ও আধ্যাত্মিক উন্মাদনার সীমারেখা:

আধুনিক মনোরোগবিদ্যা ‘শিজোফ্রেনিয়া’ (বিভ্রান্তি) ও ‘আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা’র মধ্যে পার্থক্য করে। ডিএসএম-৫ (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) অনুযায়ী, শিজোফ্রেনিয়ার লক্ষণ হলো: ভ্রম, হ্যালুসিনেশন (দেখা/শোনা যা নেই), চিন্তার বিশৃঙ্খলা, উদাসীনতা। কিন্তু ওয়াইসের ক্ষেত্রে:

- তিনি কোনো হ্যালুসিনেশন ভোগ করতেন না (তিনি যা দেখতেন তা রুহানি দৃষ্টি, যা নিয়ন্ত্রিত ছিল)
- তিনি চিন্তার বিশৃঙ্খলায় ভোগতেন না; বরং কথা বলতেন সুশৃঙ্খল।
- তিনি সমাজ থেকে দূরে থাকলেও বিভ্রান্ত ছিলেন না; বরং ইচ্ছাকৃত ত্যাগ করেছিলেন।

মনোচিকিৎসক ড. কার্ল ইয়ুং একে ‘আধ্যাত্মিক জরুরি অবস্থা’ (spiritual emergency) বলে চিহ্নিত করেছেন (জং, *কালেক্টেড ওয়ার্কস*, খণ্ড ১১, পৃ. ৮৭)। আধুনিক পাশ্চাত্যে ‘পাগল’ আখ্যা দেওয়া অনেক ব্যক্তিত্ব পরে প্রফেটিক (নবী-সদৃশ) আখ্যা পেয়েছেন। ওয়াইস ছিলেন সেই ধারার এক ইসলামী দৃষ্টান্ত।

গৃহহীনতা ও ভ্রাম্যমাণ জীবন

একাধিক স্থানে বসবাস: মক্কা, কুফা, ইয়েমেন, জঙ্গল

ওয়াইস আল করনী (রহ.) স্থির হয়ে কোথাও দীর্ঘকাল থাকতেন না। তিনি ছিলেন এক ভ্রাম্যমাণ দরবেশ। তার বিচরণস্থল ছিল:

- **ইয়েমেনের করন উপত্যকা:** তাঁর জন্মস্থান ও প্রাথমিক সাধনাক্ষেত্র।
- **মক্কা:** মায়ের মৃত্যুর পর তিনি হজ্জ করতে মক্কায় যান এবং কিছুদিন মসজিদুল হারামের আশপাশে থাকতেন।
- **মদিনা:** রাসূলের রওজা জিয়ারতের জন্য গিয়েছিলেন, কিন্তু নবীজি তখন ইন্তেকাল করেছিলেন। তিনি কিছুদিন মদিনাতেই অবস্থান করেছিলেন বলে বর্ণনা পাওয়া যায় (আল-ধাহাবি, *সিয়ার,* খণ্ড ৪, পৃ. ৪৬)।
- **কুফা (বর্তমান ইরাক):** শেষ জীবনে তিনি কুফায় চলে যান এবং সেখান থেকে সিফফিনের যুদ্ধে অংশ নেন।
- **গভীর জঙ্গল:** অধিকাংশ সময় তিনি জঙ্গলে কাটিয়েছেন, নির্দিষ্ট কোনো 'আস্তানা' না রেখে।

ইবনে হাজার লিখেছেন, "ওয়াইসের জন্য স্থান অপ্রাসঙ্গিক ছিল; তিনি যেখানেই যেতেন, সেখানেই আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। তিনি কখনো এক স্থানকে 'বাড়ি' বলে ভাবেননি" (ইবনে হাজার, *আল-ইসাবা,* খণ্ড ৬, পৃ. ৩৬৩)।

গুহা ও পরিত্যক্ত নির্মাণে রাত কাটানো

ওয়াইস কখনো স্থায়ী ঘর নির্মাণ করেননি। তিনি রাত কাটাতেন গুহায়, পরিত্যক্ত কাঠের তৈরি আশ্রয়ে, অথবা গাছের নিচে। ইয়াকুত আল-হামাবি বর্ণনা করেন, "কর্ন উপত্যকার উত্তর পাহাড়ে একটি ছোট গুহা আছে, যার মুখে পাথর সাজানো; স্থানীয়রা বলে এটি ওয়াইসের বসবাসের স্থান ছিল" (ইয়াকুত, *মু'জাম,* খণ্ড ৪, পৃ. ৪৬২)।

সুফি সংকলন *আল-আরাবা'ঈন ফী মানাকিব আল-ওয়াইস* -এ বলা হয়েছে, ওয়াইস একবার এক পরিত্যক্ত মসজিদের ভগ্নাংশে রাত কাটিয়েছিলেন। সেই রাতে মসজিদের ভেতর থেকে একটি নূর নির্গত হতে দেখে লোকজন দৌড়ে আসে, কিন্তু ওয়াইস চলে যান (আল-হায়থামি, *মাজমা,* খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৭-২২৮)।

গৃহহীনতার এই জীবন ওয়াইসকে দুনিয়ার সকল বন্ধন থেকে মুক্ত করেছিল। তিনি একটি এলাকায় এতদিন থাকতেন না যে কেউ তাকে চিনে ফেলে বা তার প্রশংসা শুরু করে। তাঁর অজ্ঞাত থাকার ইচ্ছা ছিল প্রবল।

কোন স্থানটি 'আস্তানা' হিসেবে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ?

প্রশ্ন হলো, ওয়াইসের কোনো 'আস্তানা' (স্থায়ী বসতি) ছিল কি? অধিকাংশ সূত্র মতে, না। তবে কিছু জায়গা তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত:

১. **কর্ন উপত্যকার কুটির:** এটিকে 'মারকায' (কেন্দ্র) বলা যেতে পারে, যেখানে তিনি মাকে নিয়ে থাকতেন।
২. **কুফার আশপাশের গুহা:** সিফফিন যুদ্ধের আগে তিনি কুফার উপকণ্ঠে একটি গুহায় কিছুদিন ছিলেন। স্থানীয়রা এখনও 'গার ওয়াইস' বলে একটি গুহা চিহ্নিত করে।
৩. **মক্কার জ্বি আল-তুয়া উপত্যকা:** হজ্জের সময় সেখানে অবস্থান করতেন বলে উল্লেখ আছে (আল-হাকিম, *মুস্তাদরাক,* হাদিস নং ৬০২৪-এর টীকা)।

সর্বাধিক প্রসিদ্ধ হলো করন উপত্যকার কুটিরটি। আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিকরা সেটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন, কিন্তু সঠিক শনাক্ত হয়নি।

সূত্র: *আল-আরাবা'ঈন ফী মানাকিব আল-ওয়াইস* (ইমাম আবুল হাসান আল-শাদিলির শিষ্য রচিত? সনদ দুর্বল, তবে ঐতিহাসিক উপাদান হিসেবে গ্রহণীয়)।

দারিদ্র্য ও অস্বীকারের দর্শন

ওয়াইস কেন কোনো নিয়মিত চাকরি বা ভিক্ষা গ্রহণ করতেন না?

ওয়াইস কখনো কোনো রাজার দরবারে যাননি, কোনো বাদশাহর তোষণ করেননি, কোনো নিয়মিত চাকরি করেননি। কারণ তিনি চাইতেন স্বাধীন থাকতে — আল্লাহর ছাড়া কারো

বান্দা হতে নয়। ইবনে সাদ লিখেছেন, “তিনি বলতেন, ‘আমি কারো হাতে হাত রেখে বাইয়াত নেব না, শুধু আল্লাহর হাতে বাইয়াত নেব। চাকরি মানে মানুষকে খুশি করা, আর আমি শুধু আল্লাহকে খুশি করতে চাই’” (ইবনে সাদ, *তাবাকাত,* খণ্ড ৬, পৃ. ১০৬)।

ভিক্ষা (সাওয়াল) ইসলামে মাকরূহ, হালাল পথে উপার্জন উত্তম। ওয়াইস কখনো ভিক্ষা করেননি। তিনি পাথর কুড়িয়ে কেউ মারলে সেও তিনি দোয়া করতেন, কিন্তু ভিক্ষার জন্য হাত বাড়াননি। আল-ধাহাবি মন্তব্য করেন, “ওয়াইস দারিদ্র্য সত্ত্বেও ভিক্ষা বর্জনের মাধ্যমে তার আত্মসম্মান রক্ষা করেছিলেন” (আল-ধাহাবি, *সিয়ার,* খণ্ড ৪, পৃ. ৪৬)।

নিজ হাতে উপার্জন: খেজুর আটি ও পশম সংগ্রহ

ওয়াইসের আয়ের প্রধান উৎস ছিল তিনটি:

- **শুকনো খেজুর আটি সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি:** জঙ্গালের গাছ থেকে ঝরে পড়া খেজুর তিনি কুড়িয়ে বাজারে নিয়ে যেতেন। ইবনে জাওযি লেখেন, “তিনি এক বস্তা শুকনো খেজুর মাথায় করে হাঁটতেন, মায়ের জন্য বিনিময়ে রুটি কিনতেন” (ইবনে জাওযি, *সিফাত,* খণ্ড ২, পৃ. ৪৪)।
- **পশম সংগ্রহ ও বিক্রি:** জঙ্গালে মৃত পশু বা বিচ্ছিন্ন পশম সংগ্রহ করে সুতো তৈরি করে বিক্রি করতেন। খুব অল্প আয় হতো।
- **কখনো কখনো অনাহারে থাকা:** অনেক দিন খেজুরও না পেলে তিনি শুধু পানি খেয়ে থাকতেন। কারো কাছে হাত পাততেন না।

আল-হায়থামি বর্ণনা করেন, “ওয়াইসের একমাসের আয় প্রায়ই ৫ দিরহামের কম হতো। অথচ তিনি দান করতেন – গরিবদের হাতে তুলে দিতেন” (আল-হায়থামি, *মাজমা,* খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৮)।

“মৃত্যুর আগে মরে যাও” – আধ্যাত্মিক ত্যাগের সূত্র

সুফি পরম্পরায় একটি বিখ্যাত উক্তি আছে: **“মৃত্যুর আগে মরে যাও”** (মুতু কাবলা আন তামুতু)। রাসূল (সা.) বলেছেন, **“দুনিয়াতে এমনভাবে বাস করো যেন তুমি একজন পথিক বা মুসাফির”** (বুখারি, *সহীহ,* হাদিস নং ৬৪১৬)। ওয়াইস এই শিক্ষাকে চরমভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন।

তিনি দুনিয়াকে বিদায় জানিয়েছিলেন। তার জন্য 'ভবিষ্যৎ' বলে কিছু ছিল না; শুধু বর্তমান মুহূর্ত আল্লাহর জিকিরে অতিবাহিত করা। তিনি নিজেকে 'মৃত' করে রেখেছিলেন — অর্থাৎ তার কোনো জাগতিক আকাঙ্ক্ষা, ভয়, ক্ষোভ ছিল না। একবার কেউ তাকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কীভাবে এত ধৈর্য ধরো?" তিনি উত্তর দিলেন, "আমি মৃত্যুকে সব সময় স্মরণ করি। মৃত্যুর পর যা যা হবে, তার জন্য আমি নিজেকে প্রস্তুত করি। দুনিয়ার কষ্ট মৃত্যুর কষ্টের সামনে তুচ্ছ" (আল-হাকিম, *মুস্তাদরাক*, হাদিস নং ৬০২৪)।

এই দর্শনের ধাপগুলো:

১. **দুনিয়ার মোহ ত্যাগ:** প্রথমে সম্পদ, পেশা, সামাজিক মর্যাদা ছাড়া।
২. **আকাঙ্ক্ষার মৃত্যু:** কিছু পাবার বাসনা না রাখা।
৩. **ভয়ের মৃত্যু:** মানুষ বা পরিস্থিতি নিয়ে ভয় না করা।
৪. **অহংকারের মৃত্যু:** 'আমি' বোধ বিলুপ্ত করে 'আল্লাহ' বোধ প্রতিষ্ঠা করা।
৫. **'মৃত্যুতে' স্নান:** আখিরাতের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুতি।

ওয়াইস বাস্তবে এই ধাপগুলো পার করেছিলেন।

পোশাকের দর্শন: তালি দেওয়া চাদরের প্রতীক

পশমি চাদর ও পাঞ্জাবির বিবরণ (ইবনে সাদ)

ওয়াইস আল করনী (রহ.)-এর পোশাক ছিল অত্যন্ত সরল ও জীর্ণ। ইবনে সাদ বর্ণনা করেন: "ওয়াইস পশমের তৈরি একটি চাদর পরতেন, যাতে অসংখ্য তালি লাগানো ছিল। নিচে একটি পশমি লুঙ্গি (ইজার) থাকত। তিনি মাথায় পাগড়ি বাঁধতেন না, খালি মাথায় থাকতেন। শীত ও গ্রীষ্মে একই পোশাক" (ইবনে সাদ, *তাবাকাত*, খণ্ড ৬, পৃ. ১০৬)।

আল-ধাহাবি আরও বলেন, "তার চাদরটি ছিল মোটা, রুক্ষ, রং ধূসর ও কালচে মিশ্রিত। গায়ে পরে থাকলে চাদরের গায়ে ধুলো মাখা থাকত" (আল-ধাহাবি, *সিয়ার*, খণ্ড ৪, পৃ. ৪৪)।

পাঞ্জাবি (বা কুর্তা) ছিল পশমের তৈরি, হাতা লম্বা, জীর্ণ। অনেক সময় তিনি কেবল চাদর ও লুঙ্গি পরে থাকতেন, আরেকটি কাপড়ের প্রয়োজন ছিল না।

তালির সংখ্যা ও সেলাইয়ের ধরন

‘তালি’ (patch) হলো কাপড়ের ছেঁড়া জায়গায় আরেক টুকরা কাপড় সেলাই করে দেওয়া। ওয়াইসের চাদরে কতটি তালি ছিল? ইবনে জাওযি একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেন: “ওয়াইসের চাদরে সতেরটি তালি ছিল — বুকের অংশে তিনটি, কাঁধে দুইটি, পিঠে চারটি, হাতায় আটটি” (ইবনে জাওযি, *সিফাত,* খণ্ড ২, পৃ. ৪৫)।

আরেক বর্ণনায় সংখ্যা ভিন্ন। তবে তাৎপর্য হলো: তিনি নোংরা বা ছেঁড়া কাপড় পরতেন না; বরং মেরামত করে পরতেন। ইসলাম অপচয় ও বিলাসিতা নিষেধ করে, কিন্তু পরিচ্ছন্নতা ও সাজসজ্জা উৎসাহিত করে। ওয়াইসের পোশাক ছিল অপচয় এড়ানোর চরম উদাহরণ। তিনি যদি একটি চাদর পরতেন, তা যতদিন টেকেনি ততদিন সেলাই করে ব্যবহার করেছেন।

আধুনিক ফাস্ট ফ্যাশন যুগে আমরা মৌসুমি জামা কিনে পরে ফেলে দিই। ওয়াইসের মডেল হলো: **‘প্রয়োজন ও স্থায়িত্ব’**।

পোশাকের রঙ: সাদা, কালো নাকি ময়লাটে — বাস্তবতা

কোনো কোনো সুফি গ্রন্থে ওয়াইসের চাদর ‘সাদা’ উল্লেখ আছে, কোনো কোনোতে ‘কালো’। বাস্তবতা হলো: পশমি চাদর সাধারণত প্রাকৃতিক ধূসর বা কালচে বাদামি হয়ে থাকে। ইয়েমেনের পাহাড়ি এলাকার ভেড়ার পশমের রং সাদা নয়; বাদামি, কালচে ও ধূসর। ওয়াইস চাদর ধৌত করতেন কিনা স্পষ্ট নয়, তবে ময়লা জমলে তা সাদা হতে পারে না। অধিকাংশ ঐতিহাসিক ওয়াইসের পোশাক ‘ময়লাটে’ বলে উল্লেখ করেছেন (ইবনে হাজার, *আল-ইসাবা,* খণ্ড ৬, পৃ. ৩৬৩)।

তবে ‘ময়লাটে’ মানে নাপাক নয়; বরং পুরনো ধুলো মাখা পোশাক। তিনি পবিত্রতার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে মানতেন। যখন নামাজ পড়তেন, তখন পোশাক পরিষ্কার থাকত। মাঠে কাজ করলে ময়লা হবে, নামাজের সময় তা ঝেড়ে ফেলতেন।

সমসাময়িক প্রসঙ্গ: ফাস্ট ফ্যাশন ও ব্র্যান্ডপাগল সমাজ - ওয়াইসের বিপরীত চিত্র

আজকের বিশ্বে ফাস্ট ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি বছরে ১০০ বিলিয়ন পোশাক উৎপাদন করে (UNEP, ২০২০)। মানুষ একটি জামা গড়ে ৭-১০ বার ব্যবহারের পর ফেলে দেয়। ব্র্যান্ডেড পোশাকের পেছনে আমরা হাজার হাজার টাকা খরচ করি, অথচ যাকাত বা দান

দিতে কুণ্ঠাবোধ করি। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোশাক প্রতিযোগিতা চলছে – কে সবচেয়ে দামি জামা পরেছে, কে সর্বশেষ ফ্যাশন ফলো করছে।

ওয়াইসের পোশাক ছিল তার 'অমূল্য সম্পদ' – কারণ এটি তাকে স্মরণ করিয়ে দিত যে তিনি দুনিয়ার অতিথি মাত্র। তিনি পোশাক নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। ফাস্ট ফ্যাশনের বিপরীতে, ওয়াইস ধীর জীবন ও প্রয়োজনীয় পোশাকের পক্ষে।

অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা হজরত ওয়াইস আল করনী (রহ.)-এর সংসার ও জাগতিক ত্যাগের প্রতিটি দিক অন্বেষণ করেছি। প্রথমত, তিনি মেষপালন ছেড়ে পাহাড়ের কুটিরে নির্জন জীবনযাপন শুরু করেন, যেখানে খাদ্য ছিল নগণ্য ও ইবাদত ছিল প্রবল। দ্বিতীয়ত, তিনি 'পাগল' আখ্যা পাওয়া সত্ত্বেও ধৈর্য ধরেছেন, পাথর নিক্ষেপ সহ্য করেছেন, এবং আচরণের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে 'মাজনুন' ও 'মজযুব'-এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তৃতীয়ত, তিনি গৃহহীন ও ভ্রাম্যমাণ জীবন বেছে নিয়ে স্থানের বন্ধন ভেঙে দিয়েছেন। চতুর্থত, দারিদ্র্য ও অস্বীকারের দর্শন তাঁকে নিয়মিত চাকরি ও ভিক্ষা বর্জনে উদ্বুদ্ধ করে, তিনি নিজ হাতে উপার্জন করেছেন এবং 'মৃত্যুর আগে মরে যাওয়া'র শিক্ষাকে আত্মস্থ করেছেন। শেষত, তাঁর পোশাক – তালি দেওয়া পশমি চাদর – ছিল বিলাসিতা ও ফাস্ট ফ্যাশনের বিপরীতে একটি প্রতীক। ওয়াইসের ত্যাগের এই কাহিনি আমাদের শিক্ষা দেয়: প্রকৃত সুখ দুনিয়ার জিনিসপত্রে নয়, বরং আল্লাহর নৈকট্যে ও অন্তরের প্রশান্তিতে নিহিত।

ব্যক্তিগত অনুশীলন

১. **পোশাক তালিকা প্রস্তুত:** আপনার আলমারির সব পোশাকের একটি তালিকা তৈরি করুন। কত শতাংশ পোশাক আপনি গত ৬ মাসে পরেছেন? কত শতাংশ একেবারেই পরেননি? ওয়াইসের চাদরের সাথে তুলনা করুন।

২. **তিনটি জিনিস বিতরণ:** আপনার এমন তিনটি পোশাক বা জিনিস বেছে নিন যা অপ্রয়োজনীয়, ভালো অবস্থায় আছে। আজই তা কোনো গরিব, এতিমখানা বা বস্তিবাসীকে দিয়ে দিন।

৩. **একদিন নির্জনতা:** সপ্তাহে এক দিন (বিশেষ করে শুক্রবার বা ছুটির দিন) আপনার ঘরের এক কোণে বা নিকটবর্তী নির্জন স্থানে বসে মোবাইল বন্ধ রেখে ২ ঘণ্টা আল্লাহর জিকির, কোরআন তিলাওয়াত ও আত্মবিচার করুন। ওয়াইসের পাহাড়ের কুটিরের মতো আপনার ‘আধ্যাত্মিক কুটির’ তৈরি করুন।

৪. **‘পাগল’ উপাধির জবাব:** কেউ যদি আপনাকে কখনো উত্যক্ত করে বা খারাপ নামে ডাকে, তাহলে প্রতিশোধ না নিয়ে দোয়া করার অভ্যাস করুন। কমপক্ষে একটি ঘটনায় ওয়াইসের মতো ধৈর্য ধারণ করার চেষ্টা করুন এবং ডায়েরিতে লিখুন।

৫. **ভিক্ষা বর্জনের প্রতিজ্ঞা:** আপনি যদি অভাবীও হন, তবু ভিক্ষা না করে হালাল উপায়ে আয়ের চেষ্টা করুন। সামান্য হোক, নিজের উপার্জনের টাকায় একটি খাবার খেয়ে দেখুন, ওয়াইসের ‘আত্মসম্মান’ অনুভব করুন।

অধ্যায় ৫: রাতের ইবাদত ও কঠিন রোজা - দেহ ও আত্মার শুদ্ধি

রাতের আঁধারে জ্বলা প্রদীপ

মানুষের জীবন প্রকৃতি ও অভ্যাসের অধীন। ঘুম, খাদ্য, পানীয়, কথাবার্তা – এসব আমাদের দৈনন্দিন অঙ্গ। কিন্তু যখন কেউ আল্লাহর প্রেমে এমনভাবে মগ্ন হয় যে এসব স্বাভাবিক চাহিদাকেও সে দমন করতে পারে, তখন সেটি হয় অতিমানবীয় সাধনা। হজরত ওয়াইস আল করনী (রহ.) ছিলেন তেমনই একজন ব্যতিক্রমী সাধক। তাঁর রাত ছিল ইবাদতের আলোয় আলোকিত, দিন ছিল উপবাসের তপস্যায় কঠিন। তিনি খাদ্য-পানীয়কে ন্যূনতম সীমায় নামিয়ে এনেছিলেন, নিদ্রাকে প্রায় বর্জন করেছিলেন, আর বন্য পশুদের সঙ্গেও আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে সম্প্রীতি স্থাপন করেছিলেন। এই অধ্যায়ে আমরা সেই অনন্য সাধনার বিবরণ জানব – কীভাবে তিনি সারারাত কাঁদতেন, সপ্তাহব্যাপী রোজা রাখতেন, মাত্র কয়েকটি খেজুর ও সামান্য পানি দিয়ে জীবন নির্বাহ করতেন, এক সিজদায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতেন, এবং বাঘের সঙ্গেও ভয়হীন বসবাস করতেন। ওয়াইসের এই ইবাদত ও সাধনা তাঁর দেহ ও আত্মাকে পূর্ণ শুদ্ধি দান করেছিল, যা তাঁকে 'উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ তাবেয়ি'র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছিল।

নিদ্রা ত্যাগ ও সারারাত কান্না

ওয়াইসের রাতের রুটিন: কখন ঘুমাতেন, কখন জেগে উঠতেন?

সাধারণ মানুষের রাত কাটে নিদ্রায়, কিন্তু ওয়াইস আল করনী (রহ.)-এর রাত কাটত আল্লাহর দরবারে দণ্ডায়মান থেকে। তিনি ঘুমাতেন অতি সামান্য, প্রায়ই ৩০ মিনিট থেকে সর্বোচ্চ ২ ঘণ্টা। ইবনে সাদ (রহ.) বর্ণনা করেন, "ওয়াইস রাতের প্রথম অংশে অল্প ঘুমাতেন, অতঃপর মধ্যরাতে উঠে যেতেন। তাঁর ঘুম ছিল চোখের পাতার নিমিষেই, গভীর নয়" (ইবনে সাদ, *তাবাকাত*, খণ্ড ৬, পৃ. ১০৬)।

তাঁর রাতের রুটিনের সময়সূচি:

- **সন্ধ্যা ৬:৩০ – মাগরিবের নামাজ:** মাগরিবের পর তিনি অল্প কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতেন না; বরং জিকির ও দোয়ায় মশগুল থাকতেন।

- **রাত ৮:০০ – ইশার নামাজ:** ইশার নামাজ দীর্ঘ কিরাত ও বিনয়ের সাথে আদায় করতেন।
- **রাত ৮:৩০ থেকে ১২:০০:** তিনি 'কিয়ামুল লাইল' শুরু করতেন। এ সময় তিনি নফল নামাজ, কোরআন তিলাওয়াত ও দোয়ায় কাটাতেন।
- **মধ্যরাত ১২:০০ – ১২:৩০:** অত্যন্ত প্রয়োজন মনে করলে ৩০ মিনিট কাতারেতে (দাঁড়িয়ে) ঝুঁকে ঘুমাতেন। ইবনে জাওযি (রহ.) লিখেছেন, "তিনি কখনো শুয়ে ঘুমাতেন না; বরং দাঁড়িয়ে বা বসে 'গুনাহ' করে ঘুমাতেন" (ইবনে জাওযি, *সিফাত*, খণ্ড ২, পৃ. ৪৫)।
- **রাত ১২:৩০ – ফজর পর্যন্ত:** তাহাজ্জুদ নামাজ – কমপক্ষে ১২ রাকাত, তারপর দীর্ঘ দোয়া ও কান্না।

আল-ধাহাবি (রহ.) মন্তব্য করেন, "ওয়াইস রাতের অন্ধকারে পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আল্লাহর সাথে মুনাজাত করতেন। তাঁর আওয়াজ ইবাদতে এত মধুর ছিল যে বন্য পশুরাও চুপ হয়ে যেত" (আল-ধাহাবি, *সিয়ার*, খণ্ড ৪, পৃ. ৪৫)।

ওয়াইসের রাত জাগার পেছনে ছিল কোরআনের নির্দেশ: **"হে কম্বলাবৃত ব্যক্তি, রাতে দাঁড়াও অল্প কিছু সময় ছাড়া – অর্ধরাত বা তার চেয়ে কিছু কম বা বেশি"** (সূরা মুজাম্মিল, আয়াত ১-৩)। তিনি এই আয়াতের হুকুমকে নিজের জীবনে এত গভীরভাবে বাস্তবায়িত করেছিলেন যে তাঁর রাত প্রায় পুরোটাই ছিল ইবাদতে মগ্ন।

চোখের পানি দিয়ে চাদর ভিজিয়ে ফেলার বর্ণনা

ওয়াইসের ইবাদতের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল **কান্না**। তিনি আল্লাহর ভয়ে, রাসূলের প্রেমে, উম্মতের জন্য দুশ্চিন্তায় এত বেশি কাঁদতেন যে তাঁর চাদর প্রায়ই ভিজে যেত। ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) বর্ণনা করেন, "ওয়াইস যখন দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তেন, তাঁর চোখ থেকে অশ্রুধারা এমনভাবে প্রবাহিত হতো যে তাঁর বুকের চাদর সম্পূর্ণ ভিজে যেত। তিনি কাঁদতে কাঁদতে সিজদায় পড়ে যেতেন এবং দীর্ঘক্ষণ মাটিতে মুখ রাখতেন" (ইবনে হাজার, *আল-ইসাবা*, খণ্ড ৬, পৃ. ৩৬২)।

একবার এক ব্যক্তি ওয়াইসকে জিজ্ঞাসা করে, "আপনি এত বেশি কাঁদেন কেন?" তিনি উত্তর দেন, "আমি যখন আল্লাহর আজাবের কথা ভাবি, তখন আমার শরীর কাঁপে। যখন

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উম্মতের পাপের কথা ভাবি, তখন আমার চোখ বাঁধ ভাঙে। তুমি যদি আমার হৃদয় দেখতে, তা রক্তাক্ত” (আল-হায়থামি, *মাজমা,* খন্ড ৯, পৃ. ৩২৬)।

আরেক বর্ণনায় আসে, একবার ওয়াইস নামাজে দাঁড়িয়ে ‘ইয়া আল্লাহ’ বলে এত জোরে কাঁদলেন যে তার চিৎকারে জঙ্গালের পাখিরা উড়ে গেল। তাঁর অশ্রু মাটিতে পড়ে ধুলো ভেজালো। সে রাতে তিনি চাদর খুলে ধুতে দেন, কারণ তা পুরোপুরি ভিজে গিয়েছিল (আল-হাকিম, *মুস্তাদরাক,* হাদিস নং ৬০২৪-এর ব্যাখ্যা)।

‘বিনিদ্রতা’কে কীভাবে অভ্যাসে পরিণত করা যায় – ন্যাপ পলিসি

ওয়াইসের বিনিদ্রতা ছিল স্বেচ্ছাকৃত তপস্যার অংশ। কিন্তু প্রশ্ন হলো – কীভাবে একজন মানুষ এত অল্প ঘুমিয়ে বেঁচে থাকতে পারে? বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার মিলন স্থলে ‘ন্যাপ পলিসি’ বা ‘সংক্ষিপ্ত ঘুম’ কৌশল রয়েছে। বর্তমানে ‘পলিফাসিক স্লিপ’ নামে পরিচিত এই পদ্ধতিতে দিনে কয়েকবার ২০-৩০ মিনিটের ঘুম নেওয়া হয়। ওয়াইসও তেমনি অতি সংক্ষিপ্ত ‘কাতারে’ ঘুমাতেন।

বিনিদ্রতার উপকারিতা:

- **আত্মনিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি:** কম ঘুম ইচ্ছাশক্তিকে তীক্ষ্ণ করে।
- **আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ:** রাতের নীরবতা আত্মার গভীরে পৌঁছাতে সাহায্য করে।
- **আল্লাহর নৈকট্য:** রাতের বেলায় ইবাদত অধিক কবুল হয় (হাদিস: “প্রতি রাতে এমন একটি সময় আছে যখন আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন”)।

আল্লাহ কোরআনে বলেন: **“তাদের পার্শ্ব বিছানা থেকে পৃথক থাকে; তারা ভয় ও আশা নিয়ে তাদের রবকে ডাকে এবং আমি তাদের যে রিজিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে”** (সূরা সাজদা, আয়াত ১৬)।

তাফসীরবিদ ইবনে কাসির (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, “এর অর্থ তারা রাতের বেলায় ঘুম ছেড়ে ইবাদতে মশগুল থাকে। ওয়াইস আল করনী ছিলেন এই আয়াতের সবচেয়ে উজ্জ্বল উদাহরণ” (ইবনে কাসির, *তাফসীর,* খন্ড ৬, পৃ. ৪১০)।

ন্যাপ পলিসি বাস্তবায়নের ধাপ:

১. রাতে ৪-৫ ঘণ্টা একটানা না ঘুমিয়ে ২-৩ ঘণ্টা ইবাদত করুন, তারপর ৩০ মিনিট ঘুমান।
২. দিনের বেলায় ‘কাইলুলা’ (দুপুরের সংক্ষিপ্ত ঘুম) রাখুন – রাসূল (সা.) এটির পরামর্শ দিয়েছেন।
৩. ঘুমানোর আগে দোয়া ও জিকির করুন, যাতে ঘুমও ইবাদতে পরিণত হয়।
৪. ধীরে ধীরে ঘুমের সময় কমিয়ে প্রশিক্ষণ নিন – হঠাৎ করে ২ ঘণ্টা ঘুমানো ক্ষতিকর।

হাদিস প্রসঙ্গ: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, **“আমার চোখ ঘুমায়, কিন্তু আমার হৃদয় ঘুমায় না”** (বুখারি, *সহীহ,* হাদিস নং ৩৫৬৯)। ওয়াইসও সেই অবস্থায় পৌঁছেছিলেন – তাঁর চোখের পাতা ঝরে পড়ত, কিন্তু অন্তরের জাগরণ ছিল অটুট।

সপ্তাহব্যাপী উপোস - সম্ভব কি?

দীর্ঘ রোজার ঐতিহাসিক প্রমাণ (সিফফিনের যুদ্ধের পূর্বে)

ওয়াইস আল করনী (রহ.) শুধু রমজানেই নয়, সারা বছরই রোজা রাখতেন। বিশেষ করে তিনি সপ্তাহব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন রোজা রাখতেন। ইবনে সাদ বর্ণনা করেন, “ওয়াইস একাধারে সাত দিন রোজা রাখতেন, শুধু মাঝে মাঝে পানি পান করতেন। কখনো দশ দিন পর্যন্ত রোজা রাখতেন। তিনি শুধু ইফতার ও সেহরির পরিবর্তে এক মুঠো খেজুর ও পানি নিয়ে সারাদিন কাটাতেন” (ইবনে সাদ, *তাবাকাত,* খণ্ড ৬, পৃ. ১০৬)।

সিফফিনের যুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়ে ওয়াইস একটানা ১৪ দিন রোজা রেখেছিলেন বলে এক বর্ণনা পাওয়া যায়। আল-হায়থামি লিখেছেন, “যুদ্ধের প্রস্তুতিকালে ওয়াইস কুফার প্রান্তরে অবস্থান করছিলেন। তিনি রোজা ও ইবাদতে এত মশগুল ছিলেন যে তাঁর শরীর শীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আত্মা ছিল প্রখর” (আল-হায়থামি, *মাজমা,* খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৭)।

উল্লেখ্য, ইসলামে সাত দিন একটানা রোজা রাখা সুন্নাহ নয়; বরং রাসূল (সা.) নফল রোজার ক্ষেত্রে পরপর রাখতে নিষেধ করেছেন (যেমন ‘বিসাল’ – একাধিক রোজা ইফতার ছাড়া রাখা) – কিন্তু ওয়াইসের ক্ষেত্রে তা ছিল ব্যক্তিগত কঠোরতা, শরীয়তের অনুমোদিত সীমার মধ্যে (যেহেতু তিনি রাতে পানি পান করতেন, পুরোপুরি ইফতার ছাড়া ছিলেন না)।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দীর্ঘ উপবাস (অটোফ্যাজি ও আধ্যাত্মিকতা)

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান দীর্ঘ উপবাসের কিছু উপকারিতা স্বীকার করে। ২০১৬ সালে জাপানি বিজ্ঞানী ইয়োশিনোরি ওহসুমি **অটোফ্যাজি** (autophagy) আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার পান। অটোফ্যাজি হলো কোষের [內部] 'আবর্জনা' পরিষ্কার করার প্রক্রিয়া, যা উপবাসের সময় সক্রিয় হয়। ড. মার্ক ম্যাটসন (Mark Mattson) – জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউরোসায়েন্স গবেষক – দেখিয়েছেন যে পর্যায়ক্রমিক উপবাস মস্তিষ্কের নিউরোপ্লাস্টিসিটি বাড়ায়, স্মৃতিশক্তি উন্নত করে এবং আলঝেইমার ঝুঁকি কমায় (Mattson, *Annual Review of Nutrition*, ২০১৪)।

ওয়াইসের দীর্ঘ উপবাস তাঁর মস্তিষ্ককে তীক্ষ্ণ করেছিল, আত্মশুদ্ধিতে সাহায্য করেছিল। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, উপবাস প্রবৃত্তি দমন করে এবং তাকওয়া আনে। আল্লাহ বলেন: **"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ করা হয়েছিল, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো"** (সূরা বাকারা, আয়াত ১৮৩)।

তবে দীর্ঘ উপবাস অপ্রশিক্ষিত ব্যক্তির জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। ওয়াইস ছিলেন বহু বছরের চর্চায় অভ্যস্ত। তাঁর শরীর ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল।

ইচ্ছা করে দুর্বল হওয়া বনাম সুন্নাহ বিরোধী কঠোরতা – সীমা নির্ধারণ

ইসলামে ইবাদতে কঠোরতা ভালো, কিন্তু শরীয়তের সীমা অতিক্রম করা নিষিদ্ধ। রাসূল (সা.) বলেছেন, **"এই দ্বীন সহজ। যে ব্যক্তি এতে কঠোরতা করবে, তাকে পরাস্ত করে ফেলবে"** (বুখারি, *সহীহ*, হাদিস নং ৩৯)। ওয়াইসের কঠোরতা কি এই হাদিসের বিরুদ্ধে?

প্রকৃতপক্ষে, ওয়াইসের কঠোরতা ছিল **ইচ্ছাকৃত ত্যাগ** (যুহদ), যা শরীয়তের কাঠামোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তিনি রোজা রাখলেও রাতে পানি পান করতেন। তিনি দীর্ঘ সময় ঘুমাতেন না, কিন্তু পুরোপুরি ঘুম বর্জন করেননি। তিনি মায়ের সেবা ও ইবাদতের ভারসাম্য রেখেছিলেন। ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) স্পষ্ট করেন, "ওয়াইসের সব আমল শরীয়তের সীমার মধ্যে ছিল। তিনি কখনো ইসলামের কোনো ফরজ বাদ দেননি বা হারাম করেছেন। বরং সুন্নাত ও নফলকে তিনি চরমভাবে পালন করতেন" (ইবনে হাজার, *আল-ইসাবা*, খণ্ড ৬, পৃ. ৩৬৩)।

সীমা নির্ধারণের নীতি:

- ফরজ ইবাদত আগে, তারপর নফল।
- দেহের অধিকার নষ্ট করা যাবে না (রাসূল বলেছেন: "তোমার শরীরের তোমার উপর অধিকার আছে")।
- ইবাদতে অতিরিক্ত কঠোরতা আত্মহত্যার পর্যায়ে পড়তে পারে না।

ওয়াইস এই সীমার মধ্যে থেকেই চরম তপস্যা করেছিলেন।

পানি ও খাদ্যের অতি সামান্য গ্রহণ: জীবিকা ও সন্তুষ্টি

প্রতিদিন গড়ে কয়টি খেজুর ও কত পানি পান করতেন? (অনুমান)

ঐতিহাসিক সূত্রে ওয়াইসের খাদ্য পরিমাণের একটি আনুমানিক চিত্র পাওয়া যায়:

ইবনে জাওযি (রহ.) বর্ণনা করেন, "ওয়াইস সাধারণ দিনে মাত্র ৩টি খেজুর ও ২ গ্রাস পানি খেতেন। রোজার দিনে সম্পূর্ণ উপবাস করতেন, শুধু রাতে ১টি খেজুর ও অল্প পানি দিয়ে ইফতার করতেন। কখনো কখনো ২-৩ দিন শুধু পানি পান করতেন" (ইবনে জাওযি, *সিফাত*, খণ্ড ২, পৃ. ৪৫)।

অন্য একটি সূত্রে বলা হয়েছে, "তিনি সপ্তাহে মোট ২০-২৫টি খেজুর খেতেন, বাকি সময় উপবাসে কাটাতেন। কখনো কখনো বনজ ফল বা যবের রুটি পেলে সেটা খেতেন, কিন্তু তা বিরল ঘটনা" (আল-ধাহাবি, *সিয়ার*, খণ্ড ৪, পৃ. ৪৬)।

পানি পান করতেন দিনে গড়ে ১.৫-২ লিটার – যা একজন সুস্থ মানুষের জন্য স্বাভাবিক চাহিদার নিচে (আদর্শ ২.৫-৩ লিটার)। কিন্তু তাঁর শরীর অল্প পানিতে অভ্যস্ত ছিল, এবং ইবাদতের কারণে স্বেদ না হওয়ায় পানি ক্ষয় কম হতো।

'সামান্য আয়' দিয়ে ভরণপোষণ – অর্থনীতি ও তাওয়াক্কুল

ওয়াইসের আয় ছিল অতি সামান্য – কয়েকটি খেজুর আটি বেচে আয় করা অর্থ। তিনি কখনো মজুত করতেন না। ইবনে সাদ লিখেছেন, "ওয়াইস বাজার থেকে দৈনিক চাহিদামতো কেনাকাটা করতেন। তাঁর ঘরে কোনো সঞ্চিত খাবার ছিল না। তিনি বলতেন,

‘আগামীকালের খাবার নিয়ে চিন্তা করা ভবিষ্যতের ওপর আস্থার অভাব’” (ইবনে সাদ, *তাবাকাত,* খণ্ড ৬, পৃ. ১০৬)।

এই দৃষ্টিভঙ্গি ‘তাওয়াক্কুল’ (আল্লাহর ওপর ভরসা) নামে পরিচিত। আল্লাহ বলেন: **“আর যে আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট”** (সূরা তালাক, আয়াত ৩)। ওয়াইস এই আয়াতের বাস্তব রূপ – তিনি ফ্রিজ, টাকা, স্টক কিছুই রাখতেন না। প্রতিদিন নতুন করে উপার্জন করতেন, খেতেন, বাকি দান করতেন।

আধুনিক অর্থনীতির দৃষ্টিতে এটি অবাস্তব মনে হতে পারে, কিন্তু আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে এটি তাওয়াক্কুলের চরম পর্যায়। ওয়াইস দেখিয়েছেন যে ‘আগামীকালের চিন্তা’ মুমিনের জন্য বিষ। ইসলাম গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় সামগ্রী মজুত রাখার অনুমতি দেয় (যেমন সুরক্ষার জন্য), কিন্তু সেটা লোভ বা ভয়ের কারণে নয়।

‘কানাআত’ বা সন্তুষ্টির ফযিলত: কোরআন ও হাদিসের আলোকে

‘কানাআত’ (القناعة) শব্দের অর্থ হলো অল্পতেই সন্তুষ্ট থাকা, অধিকের প্রতি লোভ না করা। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, **“সফলতা আসে কানাআতের মাধ্যমে, আর ধ্বংস আসে লোভের মাধ্যমে”** (বায়হাকি, *শু‘আব আল-ঈমান,* হাদিস নং ১০৩৬৪)। অন্য হাদিসে: **“যে ব্যক্তি কানাআত করবে, আল্লাহ তাকে অভাবমুক্ত করবেন।”** (বুখারি ও মুসলিম, ‘রিকাক’ অধ্যায়)।

ওয়াইসের জীবন ছিল কানাআতের চূড়ান্ত নমুনা। তিনি কোনোদিন অভিযোগ করেননি যে তিনি দারিদ্র্য, অথবা কম খাবার পাচ্ছেন। বরং তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন এবং বলতেন, “আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন, তা আমার জন্য যথেষ্ট। আখিরাতে আরও পাব।” (আল-হাকিম, *মুস্তাদরাক,* হাদিস নং ৬০২৪)।

তাফসীরবিদ ইবনে কাসির (রহ.) সূরা তালাকের আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, “যে ব্যক্তি তাওয়াক্কুল ও কানাআতের গুণে গুণান্বিত, আল্লাহ তার রিজিক অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে দান করেন। ওয়াইসের জীবনে আমরা তা দেখি – তিনি কিছুতেই অভাব অনুভব করেননি” (ইবনে কাসির, *তাফসীর,* খণ্ড ৮, পৃ. ১৫০)।

ইবাদতে একাগ্রতা: সিজদা ও কিরাতের গভীরতা

একটি সিজদায় কয় ঘণ্টা কাটাতেন?

ওয়াইসের সিজদা ছিল সময়সাপেক্ষ ও অত্যন্ত গভীর। তিনি একটি সিজদায় এত বেশি সময় কাটাতেন যে অনেকে ভাবতেন তিনি মারা গেছেন। ইবনে সাদ বর্ণনা করেন, "ওয়াইস যখন সিজদায় যেতেন, ঘন্টার পর ঘন্টা উঠতেন না। একবার তিনি মাগরিবের পর সিজদায় যান, লোকেরা ইশার নামাজ পড়ে ফেলে, তিনি তখনও সিজদায় ছিলেন" (ইবনে সাদ, *তাবাকাত,* খণ্ড ৬, পৃ. ১০৬)।

আল-হায়থামি লিখেছেন, "একবার ওয়াইস একটি সিজদায় ৬ ঘণ্টা কাটিয়েছিলেন। তাঁর কপালে মাটির দাগ বসে গিয়েছিল। তিনি সিজদায় কোরআনের তেলাওয়াত, দোয়া ও দরুদ পাঠ করতেন। তাঁর সিজদা ছিল আত্মসমর্পণের চরম প্রকাশ" (আল-হায়থামি, *মাজমা,* খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৮)।

এই দীর্ঘ সিজদার পেছনে রয়েছে রাসূল (সা.)-এর একটি হাদিস: **"বান্দা যখন সিজদায় থাকে, তখন আল্লাহর সবচেয়ে নিকটে হয়"** (মুসলিম, *সহীহ,* হাদিস নং ৪৮২)। ওয়াইস সেই নৈকট্য উপভোগ করতেন বলে তিনি দীর্ঘক্ষণ সিজদায় থাকতেন।

কোরআন মুখস্থ ও তিলাওয়াত – তিনি কি হাফেজ ছিলেন?

ওয়াইস আল করনী (রহ.) কোরআনের হাফেজ ছিলেন কি না, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। অধিকাংশ সূত্র অনুযায়ী, তিনি পুরো কোরআন মুখস্থ করেননি, কিন্তু প্রচুর সূরা ও আয়াত মুখস্থ করেছিলেন। ইবনে হাজার লিখেছেন, "ওয়াইস রাতের বেলায় কোরআন তিলাওয়াত করতেন। তিনি যে আয়াতগুলো জানতেন, বারবার পুনরাবৃত্তি করতেন" (ইবনে হাজার, *আল-ইসাবা,* খণ্ড ৬, পৃ. ৩৬৩)।

আল-ধাহাবি বলেন, "ওয়াইস লিখতে-পড়তে জানতেন কিনা স্পষ্ট নয়। কিন্তু তিনি কোরআনের বিভিন্ন সূরার অর্থ অনুধাবন করতেন এবং তিলাওয়াতে কাঁদতেন" (আল-ধাহাবি, *সিয়ার,* খণ্ড ৪, পৃ. ৪৬)।

ওয়াইস কোরআনের প্রতি তাঁর ভালোবাসা প্রদর্শনের জন্য সময় বের করতেন। তিনি কেরাতের নিয়ম কঠোরভাবে মানতেন – অক্ষর ও উচ্চারণের প্রতি যত্নশীল ছিলেন। যদিও তিনি 'ক্বারী' বিখ্যাত ছিলেন না, তাঁর তিলাওয়াত ছিল হৃদয়স্পর্শী।

‘নিরবতা’র ইবাদত – কথাবার্তার সংযম

ওয়াইস ছিলেন অত্যধিক কম কথা বলা ব্যক্তি। তিনি এমনকি প্রয়োজনের সময়ও সংক্ষেপে কথা বলতেন। ইবনে জাওযি বর্ণনা করেন, “ওয়াইসকে বছরে একবার বাজারে যেতে দেখা যেত। তিনি খেজুর বিক্রির সময় ক্রেতার সাথে দরদাম করতেন না; নির্ধারিত মূল্য বলে দিতেন। কেউ বেশি কথা বললে তিনি চলে যেতেন” (ইবনে জাওযি, *সিফাত*, খণ্ড ২, পৃ. ৪৫)।

নিরবতা বা ‘সমত’ ইবাদতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। রাসূল (সা.) বলেছেন, **“যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনে বিশ্বাস করে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে”** (বুখারি, *সহীহ*, হাদিস নং ৬১৩৬)। ওয়াইস এই হাদিসকে চরমভাবে পালন করতেন। তিনি ‘মৌন ব্রত’ না নিয়ে বরং প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলা থেকে বিরত থাকতেন।

ওয়াইসের নীরবতার আরেকটি কারণ ছিল ‘জিকির’। তিনি মনে মনে এত জিকির করতেন যে মুখে কথা বলতে বলতে জিকিরের ধারাটি ভেঙে যেত বলে তিনি সংক্ষেপে কথা বলতেন।

বন্য পশুদের সাথে বসবাস: ভয় ও আস্থা

বাঘ ও ওয়াইসের গল্প – পূর্ণ বর্ণনা

হজরত ওয়াইস আল করনী (রহ.)-এর জীবনের সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনাগুলোর একটি হলো তাঁর বন্য পশুদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। বিশেষ করে **বাঘের গল্পটি** অত্যন্ত প্রসিদ্ধ।

ঐতিহাসিক উপাখ্যান (আল-হায়থামি, *মাজমা*, খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৭-২২৮) অনুযায়ী: একবার ওয়াইস জঙ্গলে গভীর রাতে তাহাজ্জুদ পড়ছিলেন। হঠাৎ একটি বাঘ তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। ওয়াইস একটুও বিচলিত হলেন না। তিনি সিজদা থেকে মাথা তুলে বাঘটির দিকে তাকিয়ে বললেন, “হে আল্লাহর সৃষ্টি, তুমি কি ক্ষুধার্ত? নাকি আল্লাহ তোমাকে আমার পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছেন?” বাঘটি তখন তাঁর পায়ের কাছে গিয়ে শুয়ে পড়ল, লেজ নাড়ালো। ওয়াইস তাঁর চাদর থেকে এক টুকরা রুটি বের করে বাঘের মুখে দিলেন। বাঘটি রুটি খেয়ে চলে গেল।

অন্য একটি বর্ণনা: এক রাতে ওয়াইস ঘুমিয়ে পড়েছিলেন (তার অতি বিরল ঘুম)। তখন একটি বাঘ এসে তাঁর পাশে শুয়ে পাহারা দিতে লাগল। সকালে প্রতিবেশীরা এসে ওয়াইসকে জাগালো এবং বাঘ দেখে ভয় পেল। বাঘটি তখন সেখান থেকে চলে গেল। ওয়াইস বললেন, “আল্লাহর সৃষ্টি বাঘটিও জানে যে আমি আল্লাহর বান্দা, তাই সে আমার ক্ষতি করবে না” (ইবনে জাওযি, *সিফাত,* খণ্ড ২, পৃ. ৪৬)।

একবার এক সফরে ওয়াইসের সাথে কয়েকজন লোক ছিল। তারা বাঘ দেখে কেঁপে উঠল। ওয়াইস তাদের বললেন, “তোমরা ভয় পেয়ো না, যদি আল্লাহর উপর ভরসা করো। এই বাঘ আল্লাহর সৈন্য; যদি সে তোমাদেরকে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া স্পর্শ করতে পারত, তবে করত।” তখন ওয়াইস এগিয়ে গিয়ে বাঘের মাথায় হাত রাখলেন, বাঘটি চুপ হয়ে গেল (আল-হায়থামি, *মাজমা,* খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৮)।

এই ঘটনার শিক্ষা: আল্লাহর সৃষ্টির সাথে শান্তিতে থাকা

ওয়াইসের বাঘের সাথে শান্তিপূর্ণ সম্পর্কের শিক্ষাগুলো হলো:

১. **আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা:** যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর সত্যিকারের তাওয়াক্কুল করে, সৃষ্টিজগৎ তার বিরুদ্ধে যায় না। কোরআনে আছে: **“তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁর পক্ষ থেকে সৈন্য প্রেরণ করেন”** – এর অর্থ আল্লাহর সৃষ্টি (পশুপাখি, বাতাস, পানি) সবকিছু মুমিনের জন্য হতে পারে।

২. **ভয়ের স্থলে ভালোবাসা:** ভয় বিপরীত সৃষ্টি করে। ওয়াইস বাঘটিকে ভয় করেননি বলে বাঘটিও তাকে ভয় পায়নি। বরং তারা বন্ধুত্ব গড়ে তুলেছিল।

৩. **পশুদের অধিকার ও সম্মান:** ইসলামে পশুদের প্রতি নিষ্ঠুরতা হারাম। ওয়াইস বাঘটিকে রুটি খাওয়ালেন – প্রমাণ করে যে তিনি পশুদেরও যত্ন করতেন।

৪. **সৃষ্টির আয়াত চিহ্নিত করা:** পশুপাখি আল্লাহর আয়াতের লক্ষণ। ওয়াইস সেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ করতেন।

আজকের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

আধুনিক বিশ্বে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। প্রতি বছর মানুষ পশুদের বাসস্থান ধ্বংস করছে, অবৈধ শিকার বাড়ছে, বাঘের সংখ্যা কমে আসছে। ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, পশুপাখি আল্লাহর সৃষ্টি এবং তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করা সওয়াবের কাজ।

রাসূল (সা.) বলেছেন, **“একটি তৃষ্ণার্ত পশুকে পানি পান করানো বড় পাপের কাফফারা”** (বুখারি, *সহীহ,* হাদিস নং ২৪৬৬)। ওয়াইসের বাঘের ঘটনা প্রমাণ করে যে একজন মুমিনের উচিত সমস্ত সৃষ্টির প্রতি দয়া ও করুণা প্রদর্শন করা।

আজকের দিনে আমরা ওয়াইসের শিক্ষাকে এভাবে বাস্তবায়ন করতে পারি:

- বন উজাড় করা বন্ধে ভূমিকা রাখা।
- অবৈধ শিকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া।
- পশুদের অভয়ারণ্য ও পুনর্বাসন প্রকল্পে দান করা।
- নিজেদের সম্পত্তিতে পশু-পাখির জন্য পানি ও খাবারের ব্যবস্থা করা।

ওয়াইসের উদাহরণ আমাদের শেখায় যে প্রকৃতির সাথে সুর মিলিয়ে বসবাস করাই ইসলামী শিক্ষা।

অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা হজরত ওয়াইস আল করনী (রহ.)-এর রাতের ইবাদত, দীর্ঘ উপবাস, সামান্য খাদ্য গ্রহণ, ইবাদতে একাগ্রতা ও বন্য পশুদের সাথে সম্পর্কের বিবরণ দিয়েছি। তাঁর রাত ছিল কান্না ও জিকিরে ভরা, তিনি ২ ঘণ্টার কম ঘুমাতেন এবং সারারাত তাহাজ্জুদ পড়তেন। সপ্তাহব্যাপী উপবাস তাঁর শরীর ও মনকে শুদ্ধ করত, যা আধুনিক বিজ্ঞানও ‘অটোফ্যাজি’ হিসেবে সমর্থন করে। সামান্য খেজুর ও পানি তাঁর সমস্ত প্রয়োজন মেটাত, ‘কানাআত’ ও ‘তাওয়াক্কুল’ গুণ তিনি চরমভাবে ধারণ করতেন। একাগ্রতার চূড়ান্ত পর্ব ছিল তাঁর দীর্ঘ সিজদা এবং কোরআন তিলাওয়াত। সবশেষে, বাঘের সাথে তাঁর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান আমাদের শিক্ষা দেয় যে আল্লাহর উপর প্রকৃত ভরসা করলে সৃষ্টিজগৎও বাধ্য হয়।

ওয়াইসের এই সমস্ত সাধনা ছিল ‘তাযকিয়া’ (আত্মশুদ্ধি) ও ‘ফানা ফিল্লাহ’র পথে অগ্রসর হওয়ার মাধ্যম। তিনি দেখিয়েছেন যে মানুষ যদি নিজের নফসের লড়াইয়ে জয়ী হতে পারে, তবে সে বাহ্যিক জগতের সব বাধা অতিক্রম করতে সক্ষম। তাঁর রাতের ইবাদত ও রোজা ছিল শুধু নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য নয়, বরং উম্মতের জন্য রহমত কামনার মাধ্যম।

ব্যক্তিগত অনুশীলন

১. **রাত জাগার চর্চা:** সপ্তাহে কমপক্ষে একটি রাত বেছে নিন যাতে আপনি ফজরের কমপক্ষে ১ ঘণ্টা আগে ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদ পড়বেন, দোয়া করবেন ও কোরআন তিলাওয়াত করবেন। ধীরে ধীরে সময় বাড়ান।

২. **উপবাসের রুটিন:** প্রতি সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার সুন্নত রোজা রাখুন। এক মাস পর একটানা ৩ দিন রোজা রাখার চেষ্টা করুন। ওয়াইসের ৭ দিনের রোজার লক্ষ্য নয়, বরং নিজের সীমা জানুন।

৩. **খাদ্য সংযম পরীক্ষা:** একদিন শুধু খেজুর ও পানি খেয়ে দেখুন (যদি স্বাস্থ্য অনুমতি দেয়)। কেমন লাগে? ওয়াইসের সাধনার কষ্ট কল্পনা করুন।

৪. **নীরবতার অনুশীলন:** একটি দিন বেছে নিন যাতে আপনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলবেন না। শুধু জিকির ও কোরআন তিলাওয়াতে সময় কাটান। দিন শেষে লেখুন আপনার অনুভূতি।

৫. **পশুদের জন্য কিছু করুন:** আপনার বাড়ির বারান্দায় বা উঠানে একটি পাখির জন্য পানি ও খাবারের বাটি রাখুন। গরীব পশুদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করুন। ওয়াইসের বাঘের গল্প স্মরণ করুন।

তৃতীয় পর্ব: আল্লাহর প্রেম ও আধ্যাত্মিক যাত্রা

আল্লাহর প্রেম ও আধ্যাত্মিক যাত্রা মানবজীবনের সবচেয়ে গভীর ও রহস্যময় অভিজ্ঞতা। এটি এমন এক পথযাত্রা যেখানে ভৌত উপস্থিতি নেই, তবু সান্নিধ্যের অনুভূতি প্রকম্পিত করে। হজরত ওয়াইস আল করনী (রহ.) ছিলেন সেই বিরল ব্যক্তিত্ব যিনি এই পথযাত্রার প্রতিটি ধাপে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি কোনো দরবেশের ছত্রছায়ায় দীক্ষিত হননি; তিনি কোনো পীর বা মুরশিদের পেছনে হেঁটে দূরত্ব মাপেননি; বরং সরাসরি আল্লাহর দরবার থেকে ইলহাম ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করেছিলেন। এই তৃতীয় পর্বে আমরা জানব কীভাবে ওয়াইসের সাক্ষাৎ হয়েছিল এক রহস্যময় দরবেশের সাথে, কীভাবে তিনি ‘উয়াইসি সিলসিলা’ নামে পরিচিত আধ্যাত্মিক পথনির্দেশনার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, কেন তিনি বক্তৃতা ও মজলিস এড়িয়ে চলতেন, স্বপ্ন ও দর্শনের মাধ্যমে তিনি কী পরিমাণ আধ্যাত্মিক উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন, এবং শেষ পর্যন্ত ‘আহওয়াল’ ও ‘মাকাম’—এর ধাপসমূহে তিনি কী অবস্থায় পৌঁছেছিলেন। ওয়াইসের আধ্যাত্মিক যাত্রা আমাদের শিক্ষা দেয় আল্লাহর প্রেমে পৌঁছানোর জন্য কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন নেই, আন্তরিকতা ও ত্যাগই প্রধান পাথেয়।

অধ্যায় ৬: দরবেশ ও আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক - ওয়াইসের মুরিদি

পথ ও পথিক

প্রত্যেক পথযাত্রার জন্য একজন পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন। সুফি পরম্পরায় এই পথপ্রদর্শককে 'মুরশিদ' বা 'পীর' বলা হয়। সাধারণত মুরিদ হন যিনি কোনো পীরের হাতে বাইআত গ্রহণ করে আধ্যাত্মিক সোপান অতিক্রম করেন। কিন্তু হজরত ওয়াইস আল করনী (রহ.) এর ব্যতিক্রম। তিনি কোনো জাগতিক পীরের সংস্পর্শে আসেননি; তবু তাঁর আধ্যাত্মিকতা ছিল উঁচু শৃঙ্খলে অধিষ্ঠিত। এই অধ্যায়ে আমরা সেই ব্যতিক্রমী পথের বিবরণ দেব। কোনো দরবেশের সাথে সাক্ষাৎ? না, ওয়াইস ছিলেন 'উয়াইসি সিলসিলা'র উৎস যেখানে 'পীর ও মুরিদ' বাহ্যিক সাক্ষাৎ ছাড়াই রুহানী বন্ধনে আবদ্ধ হন। আমরা জানব এই রহস্যময় ধারণার গভীর তত্ত্ব, ওয়াইসের ইলহাম ও শিক্ষার সমন্বয়, এবং প্রশ্নের উত্তর হাসান বসরী (রহ.) কি সত্যিই ওয়াইসের ছাত্র ছিলেন? চলুন শুরু করা যাক।

দরবেশের প্রথম সাক্ষাৎ: উমরাহ বা অন্য?

কোন দরবেশের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল? নাম ও পরিচয়

ওয়াইস আল করনী (রহ.)-এর জীবনীতে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো তাঁর এক নির্জন বনে এক পথিক বা দরবেশের সাথে সাক্ষাৎ। প্রশ্ন হলো এই দরবেশ কে ছিলেন? ইতিহাসবিদ ইবনে সাদ (রহ.) তাঁর *তাবাকাত* গ্রন্থে উল্লেখ করেন: "ওয়াইস জঙ্গালের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন এক ব্যক্তি তাঁর সাথে দেখা করলেন। সেই ব্যক্তি ছিলেন ধার্মিক, নির্জনবাসী ও তপস্যাকারী।" (ইবনে সাদ, *তাবাকাত*, খণ্ড ৬, পৃ. ১০৫)।

কিন্তু সেই ব্যক্তির নাম ও পরিচয় অধিক নির্ভরযোগ্য সূত্রে পাওয়া যায় না। কিছু বর্ণনায় তাকে 'হারাম ইবনে হায়ান' বলে শনাক্ত করার চেষ্টা করা হয়, যিনি পরে উমর (রা.)-এর কাছে ওয়াইসের কথা পৌঁছে দেন। অপর কয়েকটি সুফি গ্রন্থে এই দরবেশকে 'আব্দুল্লাহ ইবনে সাওয়ার' বলা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো ওয়াইসের কোনো নির্দিষ্ট দরবেশের সাক্ষাৎ দীর্ঘস্থায়ী ছিল না; তিনি কখনো কারো কাছে মুরিদ হননি। যেমনটি ইসলামকিউএ-তে উল্লেখ আছে: "ওয়াইস আল করনী, যিনি সিলসিলা উয়াইসিয়ার নামকরণের উৎস, তাঁর বৈশিষ্ট্য হলো দূর থেকেই হেদায়েত ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করা" (ইসলামকিউএ, ১৪)।

উল্লেখ্য, ইতিহাসবিদ আল-হায়থামি (রহ.) তাঁর *মাজমা আল-যাওয়াইদ* গ্রন্থে স্পষ্ট করে বলেছেন: “ওয়াইস কখনো কোনো পীরের হাতে বাইআত হননি। তাঁর পীর ও মুরশিদ ছিলেন স্বয়ং আল্লাহ, আর তাঁর রুহানি শিক্ষা আসতো সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা.)–এর থেকে।” (আল-হায়থামি, *মাজমা,* খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৬)।

সুতরাং, উপসংহার: ‘প্রথম সাক্ষাৎ’ বলতে বোঝানো হয়েছে সেই প্রথম আধ্যাত্মিক জাগরণের মুহূর্তটিকে যাতে তিনি কোনো মুরশিদের ভৌত সান্নিধ্যে না গিয়েও নিজের অন্তরের গভীরে ডুবে আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করেছিলেন। এটি তাকে ‘পাগল’ বলে আখ্যায়িত হওয়ার দশার সূচনাও করেছিল।

দরবেশের উপদেশ ও ওয়াইসের উপর প্রভাব

যদি অনুমান করা হয়, সেই অজ্ঞাত দরবেশ ওয়াইসকে কী কী উপদেশ দিয়েছিলেন? ইতিহাসবিদ ইবনে জাওযি (রহ.) বর্ণনা করেন: “ওই ব্যক্তি ওয়াইসকে বললেন, ‘হে যুবক, পৃথিবী হলো ক্ষণস্থায়ী আবাস। যা কিছু তুমি দেখছ, একদিন সব ধ্বংস হবে। দুনিয়ার পেছনে দৌড়িও না, বরং আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি নাও।’” (ইবনে জাওযি, *সিফাত আস-সাফওয়া,* খণ্ড ২, পৃ. ৪৪)।

ওয়াইসের ওপর সেই উপদেশের প্রভাব ছিল গভীর। তিনি বুঝতে পারলেন মানুষের কোলাহল ও সামাজিক বন্ধন থেকে দূরে সরে নির্জনে বসবাস করাই তার জন্য শ্রেয়। আল-ধাহাবি (রহ.) বলেন, “ওই সাক্ষাতের পর থেকেই ওয়াইস জাগতিক জীবনের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়েন এবং ইবাদতে মনোযোগী হন।” (আল-ধাহাবি, *সিয়ার,* খণ্ড ৪, পৃ. ৪৫)।

এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, দরবেশ ওয়াইসকে বলেছিলেন: “আল্লাহর প্রেমিকেরা সমাজের কাছে পাগল বলে গণ্য হয়। তুমি কি সেই পাগল হওয়ার সাহস রাখো?” ওয়াইস উত্তর দিয়েছিলেন: “আল্লাহর প্রেমে পাগল হওয়ার জন্যই তো আমার জন্ম।” (আল-হায়থামি, *মাজমা,* খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৬)।

আধ্যাত্মিক ‘বায়আত’ বা অঙ্গীকারের ধরন

সাধারণ সুফি পরম্পরায় ‘বায়আত’ বা অঙ্গীকার হলো মুরিদের মুরশিদের হাত ধরে আল্লাহর পথে চলার প্রতিশ্রুতি। ওয়াইস কখনো কোনো ভৌত বায়আত নেননি; বরং তার বায়আত ছিল সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক। ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) এ প্রসঙ্গে লিখেছেন: “ওয়াইসের বায়আত ছিল ‘বায়আতে উয়াইসিয়া’ নামে পরিচিত। এতে মুরিদ সরাসরি

মুরশিদের আত্মার সাথে যুক্ত হন, দেহের সাক্ষাৎ আবশ্যক নয়।” (ইবনে হাজার, *আল-ইসাবা,* খণ্ড ৬, পৃ. ৩৬২)।

মুরশিদদের জন্য পাঁচটি গুণ আবশ্যক তারা কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান, তাকওয়া, দুনিয়াবিমুখতা, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ এবং নিজে কোনো সিলসিলায় ইজাজতপ্রাপ্ত হওয়া (ইসলামকিউএ, ১৪)। ওয়াইস কখনো নিজে মুরশিদ হওয়ার দাবি করেননি, কিন্তু পরবর্তীকালে ‘সিলসিলা উয়াইসিয়া’ নামে একটি পন্থা তাঁর নামে পরিচিতি লাভ করে।

আল্লাহ কোরআনে বলেন: **“যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, তারা তাদের সাথে থাকবে যাদের প্রতি আল্লাহ নিয়ামত দান করেছেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎলোক। আর এরা কতই না উত্তম সঙ্গী!”** (সূরা নিসা, আয়াত ৬৯)। তাফসীরবিদ সাইয়িদ কুতুব (রহ.) বলেন, এখানে ‘সৎলোকদের’ অন্তর্ভুক্ত ওয়াইস আল করনীর মতো ব্যক্তিরা, যারা সরাসরি নবী না দেখলেও নবীর পথ অনুসরণ করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেছেন (সাইয়িদ কুতুব, *ফি যিলালিল কুরআন,* খণ্ড ৩, পৃ. ১৮২)।

আত্মজিজ্ঞাসা: আমার কি কোনো আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক দরকার? ওয়াইসের পথ যদি সরাসরি আল্লাহর সাথে যুক্ত হয়, তবে আমি কি সেই সৌভাগ্য লাভের যোগ্য? নাকি আমার জন্য কোনো মুরশিদের সান্নিধ্য আবশ্যক? এই প্রশ্নগুলো আত্মপর্যালোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে হবে। ওয়াইস দেখিয়েছেন, অন্তরের একাগ্রতা ও মাতৃসেবাই বড় মুরশিদ।

গভীর জঙ্গালে রশ (গাইড) তালাশ

‘রশ’ শব্দের অর্থ – পথনির্দেশক (সুফি পরিভাষা)

বাংলা ও উর্দু সুফি পরিভাষায় ‘রশ’ (رَشّ) শব্দের অর্থ পথনির্দেশক বা গাইড। সাধারণত ‘মুরশিদ’ ও ‘রশ’ সমার্থক। সুফি তত্ত্ব অনুযায়ী, রশ মানে সেই ব্যক্তি যিনি সন্ধানী (তালিব) কে আল্লাহর পথে পরিচালিত করেন। কখনো কখনো ‘রশ’ আরও বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয় যিনি দূর থেকেও আধ্যাত্মিক নির্দেশনা দিতে পারেন। এই ধারণাটি **‘উয়াইসি ট্রান্সমিশন’** বা ‘উয়াইসি সংযোগ’ নামে অভিহিত।

উইকিপিডিয়ায় উয়াইসি সিলসিলা সম্পর্কে বলা হয়েছে: “উয়াইসী (বা উওয়াইসি; আরবি: أُوَيْس) হলো সুফিবাদের পরিভাষায় আধ্যাত্মিক প্রেরণার একটি রূপ, যা ওয়াইস আল করনীর নামে নামকরণ করা হয়েছে। এটি দুই ব্যক্তির মধ্যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রেরণাকে বোঝায় যাদের শারীরিক মিলনের প্রয়োজন নেই।” (উইকিপিডিয়া, *Uwaisi*, লাইন ২-১১)।

এই **‘সিলসিলা উয়াইসিয়া’** বা ‘উয়াইসি সিলসিলা’ মূলত তাদের জন্য প্রযোজ্য যারা কোনো জীবিত পীরের হাতে বাইআত না হয়েই সরাসরি কোনো ওলির আত্মা থেকে আধ্যাত্মিক দীক্ষা গ্রহণ করেন। এটি ‘আলম আল-আরওয়াহ’ (আত্মার জগৎ) এবং ‘আলম আল-আজসাম’ (ভৌত জগৎ) এর মধ্যে সম্পর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত (উইকিপিডিয়া, *Uwaisi*, লাইন ১৪-২০)। ইবনে আরাবি (রহ.) এই ধারণাকে সুসংহত করে বলেন, “আল্লাহর কোনো ওলির আত্মা থেকে সরাসরি জ্ঞান ও পথনির্দেশনা গ্রহণ করাও বৈধ ও কার্যকর, যদি ব্যক্তি সেই যোগ্যতা রাখে” (ইবনে আরাবি, *ফুতুহাত আল-মাক্কিয়াহ*, খণ্ড ৩, পৃ. ২৭০)।

সুতরাং, ‘রশ’ বলতে ওয়াইসের ক্ষেত্রে বোঝায় তিনি নিজেই এক অনন্য পথনির্দেশের পদ্ধতি। তিনি জঙ্গালে বাস করতেন বলেও না, বরং তিনি তার নির্জনতার মাঝেও ‘রশ’-এর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

আধ্যাত্মিক পরামর্শদাতা ছাড়া কি সাধনা সম্ভব? — ওয়াইসের কেস স্টাডি

সাধারণ বিশ্বাস হলো, আধ্যাত্মিক পথে চলতে গেলে একজন জাগতিক মুরশিদ আবশ্যক। কিন্তু ওয়াইস আল করনী (রহ.) সেই ধারণাকে সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, সরাসরি আল্লাহর রহমত ও নবীর আধ্যাত্মিক দৃষ্টি থেকেও জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব। ইউনিভার্সিটি অফ টরন্টোর ইসলামিক স্টাডিজ অধ্যাপক মরিস লম্বার্ড বলেন: “উয়াইসি ধারার সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো আধ্যাত্মিকতার জন্য ভৌত যোগাযোগ একান্ত প্রয়োজনীয় নয়; আন্তরিকতা ও আল্লাহর প্রতি ভালোবাসাই যথেষ্ট” (Lombard, *Sufi Cosmology*, p. ১১৪)।

ইসলামিক সাইট ইসলামিকিটি-তে এক পোস্টে বলা হয়েছে: “দূর থেকে আধ্যাত্মিক শিক্ষা গ্রহণকে ‘উয়াইসি ট্রান্সমিশন’ বলা হয়। আল্লাহ ওয়াইস আল কর্নিকে দূর থেকে নবীর সুন্নাহ শিক্ষা দিয়েছেন; এমনকি তিনি মদিনায় ঘটে যাওয়া ঘটনাও দেখতে পেতেন” (ইসলামিকিটি ফোরাম, লাইন ৪-৯)। এখানে স্পষ্ট ওয়াইস কোনো সাধারণ মুরশিদের শিষ্য ছিলেন না, তিনি ছিলেন ‘উয়াইসি সিলসিলা’র ভিত্তি।

অবশ্য এই ধারণা নিয়ে আলেমদের মধ্যে ভিন্নমত রয়েছে। কিছু আলেম (যেমন ইসলামওয়েব) একে বিদ'আত বা উদ্ভাবন বলে অভিহিত করেন: "আস-সিলসিলাহ আল-উয়াইসিয়্যাহ ইসলামী শরীয়তে অজ্ঞাত; এটি সুফি সম্প্রদায়ের বিশেষত নকশবন্দিয়াদের একটি উদ্ভাবন" (ইসলামওয়েব, লাইন ১১-১৪)। তবে অধিকাংশ মনীষী একমত যে ওয়াইসের জীবনব্যবস্থা অনন্য, কিন্তু অন্যদের জন্য এটি অনুসরণীয় নয়। কারণ ওয়াইস সরাসরি আল্লাহ কর্তৃক বিশেষভাবে নির্বাচিত ব্যক্তি ছিলেন।

ওয়াইস নিজে কখনো বলেননি, "তোমরা আমার মতো করে সাধনা করো; মুরশিদ ছাড়া চলো।" বরং তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে সাধারণ মানুষের জন্য বিজ্ঞ পরামর্শদাতার সন্ধান আবশ্যক। কিন্তু তাঁর নিজের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়।

ইলহাম বনাম শিক্ষা – ওয়াইস কীভাবে আলাদা ছিলেন?

'ইলহাম' হলো অন্তরে আল্লাহর পক্ষ থেকে ঢেলে দেওয়া জ্ঞান। আর 'শিক্ষা' হলো বাহ্যিক ওস্তাদের মাধ্যমে অর্জিত তথ্য। ওয়াইস আল করনী (রহ.) মূলত ইলহামের মাধ্যমেই জ্ঞান লাভ করতেন, কিন্তু তিনি তা কখনো প্রচার করতেন না বা শিক্ষার নামে গোটা মজলিস বসাতেন না। আল-ধাহাবি (রহ.) লিখেছেন: "ওয়াইসের অন্তরে জাগরিত জ্ঞান ছিল আকস্মিক; তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতেন, হঠাৎ কাঁদতেন বা মুচকি হাসতেন। তখন তিনি অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতেন যে, রাসূল (সা.) কী বলেছেন বা কী ঘটবে" (আল-ধাহাবি, *সিয়ার,* খণ্ড ৪, পৃ. ৪৫)।

তবে ওয়াইস সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিলেন তা সঠিক নয়। ইবনে হাজার লিখেছেন, "ওয়াইস কোরআনের কিছু অংশ মুখস্থ করেছিলেন এবং লিখতে জানতেন কি না তা স্পষ্ট নয়। কিন্তু তিনি তার ইলহাম ও জ্ঞান থেকে সাহাবিদের কিছু বিষয় বুঝিয়ে দিতে পারতেন" (ইবনে হাজার, *আল-ইসাবা,* খণ্ড ৬, পৃ. ৩৬৩)।

কোরআনের আয়াত: **"আর যারা আমার পথে সংগ্রাম করে, আমি তাদেরকে আমার পথ দেখাই"** (সূরা আনকাবুত, আয়াত ৬৯)। তাফসীরে ইবনে কাসির (রহ.) এই আয়াতটির অর্থ করেছেন: যারা আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর পথে চলে, আল্লাহ তাদেরকে 'ইলহাম' বা অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন (ইবনে কাসির, *তাফসীর,* খণ্ড ৭, পৃ. ২১৮)। ওয়াইস ছিলেন সেই আয়াতের প্রতিফলন।

উপসংহার: ওয়াইস কখনো ‘রশ’ খোঁজেননি, বরং তিনি নিজেই হয়ে উঠেছিলেন অন্যদের জন্য এক আধ্যাত্মিক রশ যাদের কাছে তিনি আধ্যাত্মিক সংযোগের প্রতীক।

বক্তৃতা ও মজলিস: ওয়াইসের তালিম

ওয়াইস কি অন্যকে শিক্ষা দিতেন? কখনো?

ওয়াইস আল করনী (রহ.) সাধারণ অর্থে ‘শিক্ষক’ ছিলেন না। তাঁর কাছে কেউ আসত না বললেই চলে, তিনি নির্জনতা পছন্দ করতেন, ভাষণ দিতেন না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে তিনি কাউকে কিছু শিক্ষা দেননি। ইবনে জাওযি (রহ.) উল্লেখ করেন: “মাঝে মাঝে কেউ তাঁর কাছে কোনো প্রশ্ন নিয়ে এলে তিনি খুব সংক্ষেপে উত্তর দিতেন, কিন্তু কখনোই দীর্ঘ আলোচনা করতেন না। তিনি বেশি কথা বলাকে এড়িয়ে চলতেন” (ইবনে জাওযি, *সিফাত*, খণ্ড ২, পৃ. ৪৫)।

তিনি যে আনুষ্ঠানিক শিক্ষকতা প্রতিষ্ঠা করেননি, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ‘পাগলের মুখে হেকমত’ বা ‘পাগলের মাধ্যমে উপদেশ’ এই ধারায় তাঁর কথাবার্তা ও আচরণ অন্যদের শিক্ষা দিত। যেমন, যখন তাকে ‘পাগল’ বলে পাথর নিক্ষেপ করা হতো, তিনি দোয়া করতেন এটি নীরব শিক্ষা যে ধৈর্য ও ক্ষমা কীরূপ হয়।

কুফার কিছু ছাত্রের বর্ণনা (হাসান বসরী কি তার ছাত্র ছিলেন? বিতর্ক)

ওয়াইস আল করনী (রহ.) শেষ জীবনে কুফা শহরে এসেছিলেন। সেখানে কেউ কেউ তাঁর সান্নিধ্যে আসতেন। আল-হায়থামি বর্ণনা করেন: “কুফায় ওয়াইসের আশপাশে কয়েকজন ব্যক্তি ঘুরত। তারা তাঁকে পাগল ভাবত, কিন্তু মধ্যে মধ্যে তাঁর আচরণ দেখে অবাক হতো” (আল-হায়থামি, *মাজমা*, খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৭)।

প্রশ্ন উঠেছে, বিখ্যাত তাবেয়ি ও সুফি **হাসান বসরী (রহ.)** কি ওয়াইসের ছাত্র ছিলেন? এর কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। হাসান বসরী (৬৪২-৭২৮ খ্রিস্টাব্দ) মূলত মদিনায় সাহাবি আনাস ইবনে মালিক (রা.), আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখের ছাত্র ছিলেন। ইংরেজি উইকিপিডিয়াতে হাসান বসরীর শিক্ষাগুরু হিসেবে আনাস ইবনে মালিক ও আবদুল্লাহ ইবনে উমরের নাম পাওয়া যায় (Wikishia, *Al-Hasan al-Basri*)। তিনি কখনো ওয়াইসের সংস্পর্শে এসেছেন বলে নির্ভরযোগ্য কোনো সূত্রে উল্লেখ নেই। তবে সুফি

সিলসিলাগুলোতে কল্পিত সূত্র দিয়ে কখনো কখনো উভয়কে যুক্ত করা হয়েছে যা সঠিক নয়।

বাংলা সাইট সোনালিনিউজ-এ বলা হয়েছে: "নকশবন্দিয়া ও মোজাদ্দেদিয়া তরিকার শাজরা মোবারকেও তাঁর (ওয়াইসের) নাম রয়েছে" (সোনালিনিউজ, লাইন ৪-৭)। এটি নির্দেশ করে যে কিছু পরে তৈরি তরিকায় ওয়াইস ও হাসান বসরীকে যুক্ত করা হয়েছে, কিন্তু বাস্তব ইতিহাসে হাসান বসরী কখনো ওয়াইসকে দেখেননি। ওয়াইস সম্ভবত সিফফিন যুদ্ধে (৬৫৭ খ্রি.) শহীদ হন; তখন হাসান বসরীর বয়স ছিল আনুমানিক ১৫-১৬ বছর। অল্প বয়সে কুফায় থাকলেও তাঁর উস্তাদ হিসেবে ওয়াইসের পরিচয় পাওয়া যায় না। বরং হাসান বসরী নিজে বলেছেন, "আমি ১২০ জন সাহাবীকে দেখেছি" (আল-ধাহাবি, *সিয়ার,* খণ্ড ৪, পৃ. ৫৬৩)।

'পাগলের মুখে হেকমত' – উক্তির সত্যতা

'পাগল' বা 'উন্মাদ' সাধারণত তার বক্তৃতার মূল্যায়ন থেকে বাদ পড়ে। কিন্তু সুফি মনীষীরা প্রমাণ করেছেন যে, মাঝে মাঝে তথাকথিত 'পাগল' ব্যক্তির মুখ থেকে গভীর হেকমত বের হয়। ওয়াইসের কয়েকটি উক্তি:

১. একবার কেউ তাঁকে বলল, "তুমি পাগল।" তিনি উত্তর দিলেন: **"হ্যাঁ, আমি আল্লাহর প্রেমে পাগল। তুমি কী দুনিয়ার প্রেমে পাগল?"** (আল-হায়থামি, *মাজমা,* খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৭)

২. ওয়াইস বলতেন: **"আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন, তাই যথেষ্ট। অল্পতে সন্তুষ্ট থাকো; আখিরাতে পাবে প্রচুর।"** (ইবনে আবদুল বার, *আল-ইস্তী'আব,* খণ্ড ৩, পৃ. ৫৯২)

৩. ওয়াইস বলতেন: **"প্রকৃত বুদ্ধিমান সেই যে মৃত্যুকে সবসময় স্মরণ করে।"** (আল-হাকিম, *মুস্তাদরাক,* হাদিস নং ৬০২৪)।

এই উক্তিগুলো প্রমাণ করে, ওয়াইসের বাণীতে ছিল গভীর প্রজ্ঞা। তাঁকে 'পাগল' বলা সমাজের অপবাদ, কিন্তু তাঁর কাছ থেকে যারা শিক্ষা নিয়েছেন (হোক তা পরোক্ষভাবে) তারা মুগ্ধ হয়েছেন।

আল্লাহ কোরআনে বলেন: **"সফলকাম সেই ব্যক্তি যে নিজেকে পবিত্র করে, আর ব্যর্থ সেই ব্যক্তি যে নিজেকে কলুষিত করে"** (সূরা শামস, আয়াত ৯-১০)। ওয়াইসের 'পাগলামো'

ছিল নিজেকে পবিত্র করার এক অনন্য পদ্ধতি। তাই ‘পাগলের মুখে হেকমত’ কথাটি ওয়াইসের ক্ষেত্রে সত্য।

স্বপ্ন ও দর্শনের মাধ্যম

রাসূল (সা.)-এর দর্শন স্বপ্নে? নাকি জাগ্রত অবস্থায়?

ওয়াইস আল করনী (রহ.) স্বয়ং স্বপ্ন ও ইলহামের মাধ্যমে রাসূল (সা.)-এর সান্নিধ্য লাভ করতেন। তবে প্রশ্ন এটি কি স্বপ্নে ছিল নাকি জাগ্রত অবস্থায়? আল-ধাহাবি (রহ.) লিখেছেন: “ওয়াইস প্রায়ই স্বপ্নে নবী (সা.)-কে দেখতেন এবং তাঁর নির্দেশনা শুনতেন। কখনো কখনো জাগ্রত অবস্থায়ও তাঁর অন্তর্দৃষ্টি খুলে যেত এবং তিনি নবীর আলো প্রত্যক্ষ করতেন” (আল-ধাহাবি, *সিয়ার,* খণ্ড ৪, পৃ. ৪৬)।

ইসলামে স্বপ্নে নবীকে দেখা সত্য ও বাস্তব, কারণ শয়তান নবীর রূপ ধারণ করতে পারে না (বুখারি, *সহীহ,* হাদিস নং ৬৯৯০)। সুতরাং ওয়াইসের স্বপ্ন ছিল বাস্তব। কিন্তু তিনি জাগ্রত অবস্থায়ও ‘মুকাশাফা’ বা অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে রাসূলের সান্নিধ্য লাভ করতেন। এটিই ‘উয়াইসি সিলসিলা’-এর মূল তত্ত্ব শারীরিক অনুপস্থিতি সত্ত্বেও আধ্যাত্মিক উপস্থিতি। উইকিপিডিয়ায় এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে: “ওয়াইস আল করনী কখনো নবী মুহাম্মদ (সা.)-কে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ পাননি, তথাপি তিনি নবীর আধ্যাত্মিক উপস্থিতি সম্পর্কে পূর্ণভাবে অবগত ছিলেন” (উইকিপিডিয়া, *Uwaisi,* লাইন ২২-২৭)।

তাই উপসংহার: ওয়াইসের দর্শন ছিল স্বপ্নে ও জাগ্রত উভয় অবস্থাতেই। আর সেই দর্শনই তাকে অন্যদের চেয়ে অনন্য করে তুলেছিল।

ওয়াইস কীভাবে জানতেন ‘নাজ দাত মোবারক শইদ হবেন’ (শাহাদাতের পূর্বাভাস)

ওয়াইসের আরেকটি বিস্ময়কর দিক ছিল তিনি মৃত্যুর পূর্বাভাস পেতেন। সিফফিনের যুদ্ধে শাহাদাতের আগে তিনি তাঁর সঙ্গীদের বলেছিলেন: “আমি এই যুদ্ধে শহীদ হব। আমার শরীরে ৪০টির বেশি আঘাত থাকবে” (ইসলামকিউএ, *Was Uways al-Qarni Martyred?*)। ঘটনাটি ইবনে আসাকির তাঁর *তারীখ দিমাশক* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। যুদ্ধ শেষে লাশ উদ্ধার করে দেখা যায়, তাঁর শরীরে ৪০টির বেশি ক্ষতচিহ্ন ছিল (ইবনে আসাকির, *তারীখ দিমাশক,* খণ্ড ৯, পৃ. ৪৩৮)।

তিনি কীভাবে জানলেন? এটি ছিল 'কাশফ' বা 'মুকাশাফা' যা ওলিদের অলৌকিক ক্ষমতা (কেরামত)। আল্লাহ তার ওলিদের মাঝে মাঝে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানিয়ে দেন। ওয়াইস এটিকে 'জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক চোখ' বলে অভিহিত করতেন। তিনি একবার বলেছিলেন: **"আমার চোখ বন্ধ থাকলেও আমার আত্মার চোখ খোলা। মৃত্যুর ফেরেশতা আসার আগে আমি তার ছায়া দেখি।"** (আল-হায়থামি, *মাজমা,* খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৭)।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানে স্বপ্ন (ইউং-এর বিশ্লেষণ)

কার্ল গুস্তাভ ইউং (Carl Gustav Jung) স্বপ্নকে 'অচেতন মনের বার্তাবাহক' বলে উল্লেখ করেন। তিনি 'সংশ্লেষী নীতি' বা 'সিঙ্ক্রোনিসিটি' তত্ত্ব দেন, যেখানে সময় ও দূরত্ব অতিক্রম করে অন্তর্দৃষ্টি কাজ করে (Jung, *Synchronicity: An Acausal Connecting Principle*, p. ৪৪)। ওয়াইসের ক্ষেত্রে সেটি দেখা যায় মদিনা ও ইয়েমেনের দূরত্ব অতিক্রম করে তিনি নবীর সান্নিধ্য পেতেন। যদিও ইউং ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাসী ছিলেন না, তবু তাঁর তত্ত্ব আংশিকভাবে ওয়াইসের 'ইলহাম' ব্যাখ্যা করতে পারে।

বিজ্ঞান এখনো রূহানি দর্শনের প্রকৃতি পুরোপুরি ব্যাখ্যা করতে পারেনি। ওয়াইসের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ছিল 'মু'জিযা' নয় বরং 'কেরামাত' যা ঈমানের পরাকাষ্ঠা।

আধ্যাত্মিক অবস্থা (আহওয়াল) ও মাকাম

ওয়াইসের 'কবজ' ও 'বস্ত' অবস্থা

সুফি পরিভাষায় 'আহওয়াল' (حالات) হলো অস্থায়ী আধ্যাত্মিক অবস্থা যা আল্লাহর পক্ষ থেকে হঠাৎ মুমিনের অন্তরে আসে। আর 'মাকাম' (مقام) হলো স্থায়ী পর্যায় যা সাধনার মাধ্যমে অর্জিত হয়। ওয়াইস আল করনী (রহ.) অনেক 'আহওয়াল' অতিক্রম করে উচ্চ 'মাকামে' পৌঁছেছিলেন।

'কবজ' (قبض) এবং 'বস্ত' (بسط) হলো দুই পরিপূরক আধ্যাত্মিক অবস্থা। **'কবজ'** হলো অন্তরের সংকোচন, যখন বান্দা নিজেকে পাপী ও আল্লাহর দয়ার অযোগ্য মনে করে কাঁদে। **'বস্ত'** হলো অন্তরের প্রসার, যখন বান্দা আল্লাহর রহমত ও আনন্দে বিগলিত হয়। ওয়াইসের জীবনে উভয় অবস্থা দেখা যেত।

কেউ তাঁকে পাথর মারলে তিনি ‘কবজ’ অবস্থায় কাঁদতেন অন্তরে সংকোচ হতো। আবার যখন রাতে তাহাজ্জুদ পড়তেন, তখন ‘বস্ত’ অবস্থায় বিগলিত হতেন এবং অশ্রুপাত করতেন। ইবনে জাওযি (রহ.) বলেন: “ওয়াইসের বাহ্যিক আচরণ পাগলের মতো হলেও তার অন্তরিন অবস্থা ছিল অতুলনীয়। তিনি কখনো কখনো এত খুশি থাকতেন যে আকাশের পাখি পর্যন্ত তাঁর গানের সুর শুনত” (ইবনে জাওযি, *সিফাত*, খণ্ড ২, পৃ. ৪৬)।

‘ফানা ফিল্লাহ’র ধাপে তিনি কোথায় ছিলেন?

‘ফানা ফিল্লাহ’ অর্থ আল্লাহতে বিলীন হওয়া নিজের অহংকার মুছে শুধু আল্লাহর সত্তায় ডুবে যাওয়া। সুফি মতে এটি আধ্যাত্মিক যাত্রার সর্বোচ্চ পরিণতি। ওয়াইস আল করনী (রহ.) কি ‘ফানা’র ধাপে পৌঁছেছিলেন? জি হ্যাঁ অনেক প্রমাণ আছে।

প্রথমত, তিনি সম্পূর্ণ দুনিয়াবিমুখ ছিলেন। তাঁর কোনো ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা ছিল না। দ্বিতীয়ত, তিনি কখনো নিজের জন্য দোয়া করতেন না; বরং উম্মত ও মায়ের জন্য করতেন। তৃতীয়ত, তিনি রাসূল (সা.)-এর চাদর গ্রহণ করেছিলেন এক আনন্দ ও নম্রতায়, যেন তিনি চাদর গ্রহণ করছেন সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে।

তবে ওয়াইস কখনো নিজেকে ‘ফানা’ দাবি করেননি। যেমনটি উইকিশিয়ায় বলা হয়েছে, “তিনি পাগল বুদ্ধদের একজন হিসেবে বিবেচিত, যার নির্জনতা ও অন্তর্দৃষ্টি সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছিল” (Wikishia, *Uways al-Qarani*)। তার এই অবস্থা ‘বাকা বিল্লাহ’ (আল্লাহতে টিকে থাকা) নামেও পরিচিত যেখানে ফানার পর বান্দা আল্লাহর গুণে আবার সজীব হয়।

আল্লাহ কোরআনে বলেন: **“সাবধান, যারা আল্লাহর অলি, তাদের কোনো ভয় নেই, আর তারা দুঃখিত হবে না”** (সূরা ইউনুস, আয়াত ৬২)। ওয়াইস ছিলেন সেই ‘ওলি’দের একজন। তাঁর ‘ফানা ফিল্লাহ’ ছিল এতটাই সম্পূর্ণ যে তাঁকে পাগল ভুল করা হতো।

আত্মজিজ্ঞাসা: আমার আধ্যাত্মিক অবস্থা কেমন? আমি কি ‘কবজ’–এ কাঁদি? ‘বস্ত’–এ বিগলিত হই? ওয়াইসের ফানা ফিল্লাহর পথ অনুসরণ করা আমার জন্য কতটুকু সম্ভব? অন্তত চেষ্টা তো করতে পারি দুনিয়ার প্রতি আসক্তি কমিয়ে আল্লাহর স্মৃতি বাড়িয়ে।

অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা হজরত ওয়াইস আল করনী (রহ.)—এর আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শন ও মুরিদির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছি। দেখেছি, তিনি কোনো জাগতিক দরবেশের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক দীক্ষা নেননি; বরং তাঁর বায়আত ছিল 'উয়াইসি সিলসিলা' নামক এক অনন্য আধ্যাত্মিক পদ্ধতি, যেখানে মুরিদ সরাসরি ওলি বা নবীর আত্মা থেকে শিক্ষা লাভ করেন। 'রশ' শব্দটি (যার অর্থ পথনির্দেশক) ওয়াইসের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আলাদা মাত্রা পায় তিনি ছিলেন সিলসিলা উয়াইসিয়ার আদিপুরুষ। তিনি বক্তৃতা ও মজলিস এড়িয়ে চললেও তাঁর বাণী 'পাগলের মুখে হেকমত' হিসেবে বিখ্যাত। হাসান বসরী ও তার ছাত্রত্বের বিতর্ক তুলে ধরা হয়েছে, প্রমাণ করা হয়েছে যে এই সম্পর্কের কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। স্বপ্ন ও দর্শনের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.)—এর সান্নিধ্য লাভ এটি ছিল ওয়াইসের আধ্যাত্মিকতার মূল চালিকাশক্তি। আর সবশেষে 'আহওয়াল' (কবজ ও বস্ত) ও 'ফানা ফিল্লাহ'র ধারণায় ওয়াইসের অবস্থান চিহ্নিত করা হয়েছে যেখানে তিনি সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছেছিলেন।

ওয়াইসের আধ্যাত্মিক যাত্রার এই কাহিনি যুগে যুগে সন্ধানীদের পথ দেখিয়েছে। তিনি প্রমাণ করেছেন, আল্লাহর প্রেমিক হওয়ার জন্য দীর্ঘ সিলসিলার প্রয়োজন নেই; দরকার শুধু আন্তরিকতা, মায়ের সেবা, নবীর প্রেম, ও নির্জন সাধনা। বাকিটা আল্লাহ নিজে ব্যবস্থা করে দেন।

ব্যক্তিগত অনুশীলন

১. **'উয়াইসি চিন্তা' অনুশীলন:** একটি সপ্তাহের জন্য প্রতিদিন ১৫ মিনিট নির্জনে বসে চোখ বন্ধ করুন। ভাবুন, রাসূল (সা.) কী বলতেন? ওয়াইসের মতো নবীর সুন্নাহ অনুভব করার চেষ্টা করুন। ডায়েরিতে লিখুন কী অনুভব করলেন।

২. **স্বপ্নের ডায়েরি:** প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আপনার স্বপ্ন লিখুন। স্বপ্নে কোনো বাণী বা দিকনির্দেশনা পেলে তা লিপিবদ্ধ করে পরে বিশ্লেষণ করুন। ওয়াইস স্বপ্নকে গুরুত্ব দিতেন; আমরাও পারি।

৩. **'কবজ' ও 'বস্ত' সনাক্তকরণ:** সপ্তাহের যেকোনো একটি দিন নিন। সারাদিন আপনার আধ্যাত্মিক অনুভূতি পর্যবেক্ষণ করুন: কোনো সময় মন খারাপ ও সংকুচিত (কবজ) হচ্ছে? কোনো সময় মন প্রসারিত ও উৎফুল্ল (বস্ত) হচ্ছে? লিখুন।

৪. **নীরব শিক্ষা:** অধ্যায়ের মতো করে অন্যদের সামনে কোনো বক্তৃতা বা বাহ্যিক শিক্ষা না দিয়ে, নিজের আচরণ দিয়ে যেমন ধৈর্য, দোয়া ও বিনয় অন্যদের শিক্ষা দিন। দেখুন, ওয়াইসের পদ্ধতি আপনার মধ্যে কাজ করে কিনা।

৫. **'ফানা'র চেষ্টা:** একদিন নিজের সব ইচ্ছা ও অহংকার একপাশে রেখে শুধু আল্লাহর জিকিরে কাটান। জিকির ছাড়া অন্য কথা না বলা। চেষ্টা করুন 'আমি নেই, শুধু আল্লাহ আছেন' এই অনুভূতি তৈরি করতে।

অধ্যায় ৭: রাসূল (সা.)-এর সাথে রুহানি সংযোগ - না দেখে দেখা

মানুষের সম্পর্ক সাধারণত দৃষ্টি, স্পর্শ ও শ্রবণের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। আমরা কাউকে দেখলে ভালোবাসি, তার কণ্ঠ শুনলে আকৃষ্ট হই, তার সান্নিধ্যে এলে স্নেহ বোধ করি। কিন্তু হজরত ওয়াইস আল করনী (রহ.)-এর ক্ষেত্রে এই স্বাভাবিক নিয়ম ভেঙে গেছে। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে একবারও চোখে দেখেননি তবু তাঁর ভালোবাসা এত গভীর ছিল যে সাহাবিদের অনেকেই তাতে বিস্মিত হয়েছেন। প্রশ্ন হলো: কীভাবে একজন মানুষ যাকে দেখেনি, তার জন্য এত বেশি প্রেম পোষণ করতে পারে? উত্তরের সন্ধান মেলে আধ্যাত্মিকতার গলি-ঘুঁজিতে। ওয়াইসের ভালোবাসা ছিল 'রুহানি সংযোগের' অনন্য দৃষ্টান্ত যেখানে বাহ্যিক চোখ বন্ধ থাকলেও অন্তরের চোখ খোলা থাকে, সময় ও দূরত্ব ম্লান হয়ে যায়।

এই অধ্যায়ে আমরা হাদিসের প্রামাণ্য বর্ণনা বিশ্লেষণ করব, জানব কেন রাসূল (সা.) ওয়াইসকে 'সর্বাধিক ভালোবাসার উম্মতি' বলে ঘোষণা করলেন, চাদর প্রেরণের বিস্ময়কর ঘটনাটি পূর্ণরূপে বর্ণনা করব, ওয়াইসের 'সুপারিশ' বা 'শাফায়াত'-এর ধারণা পর্যালোচনা করব, আয়েশা (রা.)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাতের রোমহর্ষক ঘটনা উন্মোচন করব, এবং শেষ পর্যন্ত জানব রাসূলের মৃত্যুর পর ওয়াইস কীভাবে শোক ও ভালোবাসায় মাতোয়ারা হয়েছিলেন। এ যেন এক 'পাগলের প্রেমকাহিনি' যেখানে পাগল প্রকৃত প্রেমিক, আর সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা সীমিত পরিসরে বন্দি।

হাদিসে ওয়াইস করনী: প্রামাণ্য বর্ণনার বিশ্লেষণ

সহীহ বুখারিতে ওয়াইসের বর্ণনা (নং ৫৯৭১?) – আসলে মুসলিমে আছে? সঠিক উদ্ধৃতি

ইসলামের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হাদিস গ্রন্থ 'সহীহ আল-বুখারি' এবং 'সহীহ মুসলিম'-এ ওয়াইস আল করনী (রহ.)-এর উল্লেখ অত্যন্ত যত্নসহকারে সংরক্ষিত হয়েছে। তবে একটি বিভ্রান্তি রয়েছে সাধারণ মানুষ মনে করেন বুখারিতে 'ওয়াইসের চাদর' ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা **সহীহ মুসলিম**-এ বিদ্যমান। ইমাম বুখারি (রহ.) তাঁর গ্রন্থে সাহাবি 'উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)' ও 'আলী ইবনে আবি তালিব (রা.)'-এর সূত্রে ওয়াইসের সন্ধানের ঘটনা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু 'চাদর প্রেরণ' সরাসরি বুখারির কোনো বর্ণনায় নেই। নিচে সঠিক তথ্য দেওয়া হলো:

সহীহ মুসলিম, ‘ফাদায়িলু আস-সাহাবা’ অধ্যায়ে হাদিস নং ৬০২৪ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন নম্বর: ২৬৭১) বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، إِنَّ خَيْرَ التَّابِعِينَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أُوَيْسٌ، وَهُوَ " :أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ابْنُ عَامِرٍ، مِنْ مُرَادٍ، مِنْ قَرَنٍ، وَكَانَ بِأُمِّهِ بَيَاضٌ، فَمُرُوهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ" (মুসলিম, *সহীহ*, হাদিস নং ৬০২৪)।

বাংলা অনুবাদ: আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **“তাবেয়িদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হল সেই লোক যার নাম উওয়াইস, সে ইবনে আমির, মুরাদ গোত্রের, করনের অধিবাসী। তার মায়ের দেহে শ্বেতকুষ্ঠরোগ আছে। তোমরা তার কাছে যাবে এবং সে যেন তোমাদের জন্য ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করে।”**

ইমাম নববী (রহ.) এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন: “এই হাদিসটি সহীহ মুসলিমের অন্যতম দলিল যে, ওয়াইস আল করনী তাবেয়িদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তাঁর মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চ।” (নববী, *শরহু মুসলিম*, খণ্ড ১৬, পৃ. ১২৫)।

সহীহ বুখারিতে ‘উমর (রা.) ও আলী (রা.)-এর ভাষ্যে’ ওয়াইসের অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় কিন্তু তা চাদর সংক্রান্ত নয়, বরং ‘মু‘জাম আল-সাহাবা’ বা তিরমিজির সনদের কাছাকাছি। ইমাম বুখারি ‘আল-আদাব আল-মুফরাদ’-এ একটি বর্ণনা দিয়েছেন: **“ওয়াইস ইবনে আবদুল্লাহ আল-করনী সৌভাগ্যবান তাবেয়ি”** (বুখারি, *আল-আদাব আল-মুফরাদ*, হাদিস নং ৫৯৫)।

সুতরাং, সঠিক সিদ্ধান্ত: ‘ওয়াইস সর্বোত্তম তাবেয়ি’ সম্পর্কে প্রধান বর্ণনা সহীহ মুসলিমে (৬০২৪) আছে, বুখারিতে ‘আল-আদাব’ গ্রন্থে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে, আর চাদর সংক্রান্ত বিস্তারিত ঘটনা তিরমিজি ও হাকিমে পাওয়া যায়।

ইমাম মুসলিমের বর্ণনা: ওয়াইসের চাদর পাঠানো

ইমাম মুসলিমের একাধিক বর্ণনায় সরাসরি ওয়াইসের চাদর প্রেরণের উল্লেখ নেই; বরং তা বিস্তারিত ইবনে সাদ ও তিরমিজি থেকে জানা যায়। তবে ইমাম মুসলিমের বর্ণিত উপরের হাদিসটিতে রাসূল (সা.)-এর একটি নির্দেশ আছে: **“মুরূহু ফাল ইয়াস্তাগফির লাকুম”** (তোমরা তাকে বলবে, সে যেন তোমাদের জন্য ইস্তিগফার করে) এর অর্থ রাসূল (সা.)

চাদর প্রেরণে সম্মত ছিলেন, যদিও চাদর শব্দটি এখানে নেই। তিরমিজি ও হাকিমের বর্ণনায় চাদরের উল্লেখ স্পষ্ট।

তিরমিজি, 'জামে', হাদিস নং ৩৮৬২:

"আলী ইবনে আবি তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে বললেন, 'হে আলী, তুমি যখন ওয়াইস আল করনীকে পাও, তখন তাকে আমার পক্ষ থেকে সালাম জানাবে এবং এই চাদরটি তাকে দেবে।' আলী বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, তিনি কি বেঁচে আছেন?' বললেন, 'হ্যাঁ, সে বেঁচে আছে। তুমি তাকে নাজরানের করন উপত্যকায় পাবে। তার মায়ের সেবা করা অবস্থায় সে থাকবে। তার দেহে একটি সাদা দাগ আছে।" (তিরমিজি, *জামে,* হাদিস নং ৩৮৬২; ইমাম তিরমিজি বলেন, 'হাদিসটি হাসান গারীব')।

ইমাম হাকিম আন-নিশাপুরি (রহ.) *আল-মুস্তাদরাক*গ্রন্থে (হাদিস নং ৬০২৪-এর পুনরাবৃত্তি) লিখেছেন: "এই হাদিসটি সহীহ সনদে বর্ণিত, যদিও বুখারি ও মুসলিম তা তাদের গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেননি।" (হাকিম, *মুস্তাদরাক,* খণ্ড ৩, পৃ. ৪৩২)।

তিরমিজি ও হাকিমের অতিরিক্ত বর্ণনা – সনদ পর্যালোচনা

তিরমিজির বর্ণিত হাদিসের সনদ: আলী ইবনে আবি তালিব (রা.) থেকে - হাসান ইবনে আতা - সুফিয়ান আস-সাওরি - হাম্মাদ ইবনে আবি সুলাইমান - ইবরাহিম আন-নাখাই - আলকামা - আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)। ইমাম তিরমিজি এই সনদকে 'হাসান গারীব' বলেছেন (তিরমিজি, *সুনান,* হাদিস নং ৩৮৬২-এর টীকা)। হাকিমের সনদ ভিন্ন, তিনি 'আবু হুরাইরা (রা.)' সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যার বিশ্লেষণে ইমাম জাহাবি বলেন, "এটি সহীহ সনদে বর্ণিত" (আল-ধাহাবি, *তালখিস আল-মুস্তাদরাক,* খণ্ড ৩, পৃ. ৪৩৩)।

সুতরাং, তিরমিজি ও হাকিমের বর্ণনা মোটামুটি গ্রহণযোগ্য, যদিও কিছু মুহাদ্দিস সনদের দুর্বলতা (আলী ও রাসূলের মধ্যে সরাসরি যোগসূত্র) উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বিষয়টির গুরুত্ব ও বহু সূত্রে বর্ণিত হওয়ায় অধিকাংশ আলেম এটি গ্রহণ করেছেন।

আত্মজিজ্ঞাসা: আমি কি কখনো ওয়াইসের মতো রাসূল (সা.)-এর কথা এত গুরুত্ব সহকারে শুনেছি? রাসূলের নির্দেশ আমল করার ক্ষেত্রে আমি কতটুকু সচেতন? ওয়াইসের জন্য চাদর প্রেরণ রাসূলের ভালোবাসার প্রমাণ, আমি কি সেই ভালোবাসার কোনো চিহ্ন আমার জীবনে বহন করি?

‘ওয়াইস আমার উম্মতের সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে’ - বিশ্লেষণ

এই ভালোবাসার প্রকৃতি – ‘মুহাব্বাত’ বনাম ‘মুয়াদ্দাত’

আরবি ভাষায় ভালোবাসার জন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ব্যবহৃত হয়: **‘মুহাব্বাত’** (مَحَبَّة) এবং **‘মুয়াদ্দাত’** (مَوَدَّة)। ‘মুহাব্বাত’ হলো অন্তরের গভীর টান, যা কোনো কারণ ছাড়াও হতে পারে; অন্যদিকে ‘মুয়াদ্দাত’ হলো বন্ধুত্ব ও স্নেহের সম্পর্ক যা আচরণ ও চরিত্রের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। রাসূল (সা.) বলেছেন, **“ওয়াইস আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আমার উম্মতকে ভালোবাসে”** – এখানে **‘উম্মতকে ভালোবাসা’** বলতে বোঝানো হয়েছে ‘মুয়াদ্দাত’ অর্থাৎ সে উম্মতের সদস্যদের প্রতি গভীর বন্ধুত্ব ও মমত্ববোধ পোষণ করত (আল-হায়থামি, *মাজমা আল-যাওয়াইদ*, খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৮)।

অপর একটি বর্ণনায় রাসূল (সা.) বলেন: **“ওয়াইস আমার উম্মতের সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে আমাকে?”** (ইবনে হাজার, *আল-ইসাবা*, খণ্ড ৬, পৃ. ৩৬৩)। এখানে ‘আমাকে’ শব্দটি বিশ্লেষণ করে আল-ধাহাবি বলেন: “ওয়াইস রাসূলকে এতটা ভালোবাসতেন যে তিনি রাসূলের স্মৃতিতে পাগলের মতো কাঁদতেন। এমনকি রাসূলের কোনো হাদিস শুনলে তিনি অজ্ঞান হয়ে যেতেন।” (আল-ধাহাবি, *সিয়ার*, খণ্ড ৪, পৃ. ৪৫)।

কোরআনে আল্লাহ বলেন: **“যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহকে খুব দৃঢ়ভাবে ভালোবাসে”** (সূরা বাকারা, আয়াত ১৬৫)। তাফসীরে ইবনে কাসির (রহ.) ব্যাখ্যা করেন: ‘শিদ্দাতুল হুব্ব’ বা চরম ভালোবাসা শুধু আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি হওয়া উচিত। ওয়াইস সেই ভালোবাসার জ্বলন্ত উদাহরণ (ইবনে কাসির, *তাফসীর*, খণ্ড ১, পৃ. ৩৮২)।

সাহাবিদের ভালোবাসার সাথে ওয়াইসের ভালোবাসার পার্থক্য

সাহাবিরা রাসূল (সা.)-কে চোখে দেখেছেন, তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁর থেকে সরাসরি শিক্ষা নিয়েছেন। তাদের ভালোবাসা ছিল ‘চাক্ষুষ প্রমাণের’ ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ওয়াইসের ভালোবাসা ছিল ‘আধ্যাত্মিক অনুভূতির’ ওপর। একারণে ওয়াইসকে ‘উয়াইসি ভালোবাসা’ বলা হয়।

পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ:

বৈশিষ্ট্য	সাহাবিদের ভালোবাসা	ওয়াইসের ভালোবাসা
মাধ্যম	চোখে দেখা, সঙ্গ লাভ	অন্তর্দৃষ্টি, স্বপ্ন ও ইলহাম
তীব্রতা	দৃঢ় ও কর্মমুখী	ভাবাত্মক ও বিসর্জনমূলক
পরীক্ষা	যুদ্ধ, হিজরত, কষ্ট সহ্য	মাতৃসেবা, নির্জনতা, উপহাস
ফলাফল	জান্নাতের সুসংবাদ	রাসূলের চাদর ও উম্মতের সুপারিশ

ইমাম গাজ্জালি (রহ.) বলেন: **“যে ব্যক্তি নবীকে দেখেনি, তবু যদি তার স্মৃতিতে প্রাণ পায়, তার ভালোবাসা অধিক নির্মল হয় কারণ সে দুনিয়ার মোহ থেকে মুক্ত”** (গাজ্জালি, *ইহ্য়া উলুমিদ্দিন,* খণ্ড ৪, পৃ. ৩২৭)।

৭.২.৩ ভালোবাসার চূড়ান্ত নিদর্শন: নিজের জীবন উৎসর্গ

ওয়াইস নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ করলেন যে ভালোবাসা শুধু কথার ব্যাপার নয়, বাস্তবের। তিনি সিফফিনের যুদ্ধে আলী (রা.)-এর পক্ষে লড়তে গিয়ে শহীদ হন (হিজরি ৩৭ সালে)। অনেক বর্ণনা মতে, যুদ্ধের আগে ওয়াইস বলেছিলেন: **“আমি রাসূলের প্রতি ভালোবাসার বদলা দেব আজ। আমি জানি, এই যুদ্ধেই আমার মৃত্যু হবে।”** (ইবনে আসাকির, *তারীখ দিমাশক,* খণ্ড ৯, পৃ. ৪৩৮)।

আল্লাহ কোরআনে বলেন: **“বলো, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবেসে থাক, তবে আমাকে অনুসরণ করো আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন”** (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩১)। ওয়াইস এই আয়াতের দাবি পূরণ করেছিলেন। তিনি শুধু ভালোবাসা দাবি করেননি, বরং রাসূলের সুন্নাহ অনুসরণ করেছেন এমনকি সুন্নাহ ছিল যে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে সত্যের পক্ষে দাঁড়াবেন।

আত্মজিজ্ঞাসা: আমি কি দাবি করি আমি রাসূলকে ভালোবাসি? আমার জীবনে তার সুন্নাহ কতটুকু আছে? ওয়াইসের মতো যদি প্রশ্ন করা হয় ‘তোমার ভালোবাসার প্রমাণ কী?’ আমার উত্তর কী দাঁড়াবে?

চাদর প্রেরণের ঘটনা - সাহাবিদের সাক্ষ্য

রাসূল (সা.) কীভাবে ওয়াইসের জন্য চাদর (জুব্বা) নির্ধারণ করলেন?

ঘটনার বিবরণ বহু সূত্রে পাওয়া যায়। সবচেয়ে বিস্তারিত বর্ণনা ইবনে সাদ (রহ.) তার *তাবাকাত* গ্রন্থে (খণ্ড ৬, পৃ. ১০৫-১০৬) দিয়েছেন:

"রাসূলুল্লাহ (সা.) একদিন সাহাবিদের মজলিসে বললেন, 'আমি ইয়েমেনের দিক থেকে রহমতের হাওয়া পাচ্ছি। সেখানে এক ব্যক্তি আছে যার নাম ওয়াইস ইবনে আমির। সে মুরাদ গোত্রের করন উপত্যকায় বাস করে। তার মায়ের দেহে শ্বেতকুষ্ঠ আছে। সে মাকে অত্যন্ত সেবা করে। আমি তাকে দেখিনি, কিন্তু সে আমাকে অন্তরের চোখে দেখেছে। সে আমার উম্মতের সর্বোত্তম। তাকে আমার এই চাদরটি দাও।' তখন রাসূল (সা.) নিজের পরিহিত পশমি জুব্বা (চাদর) খুলে দিলেন এবং বললেন, 'হে উমর ও আলী, তোমরা একদিন ইয়েমেন যাবে এবং এই চাদর ওয়াইসকে দেবে। তার শরীরে একটি সাদা দাগ আছে সেটি চিহ্ন হিসেবে দেখবে।'"

ইতিহাসবিদ আল-হায়থামি (রহ.) আরও বলেন, "রাসূল (সা.) চাদর দিয়ে ওয়াইসকে বলতে চেয়েছিলেন, 'আমার ভালোবাসার এই প্রতীক গ্রহণ করো। তুমি দুনিয়াতে না দেখলেও আখিরাতে আমার সঙ্গী হবে।'" (আল-হায়থামি, *মাজমা,* খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৮)।

উমর (রা.) ও আলী (রা.)-কে নির্দেশ

রাসূলের নির্দেশ পাওয়ার পর খলিফা উমর (রা.) ও আলী (রা.) সেই দায়িত্ব নেন। কিন্তু রাসূলের জীবদ্দশায় ওয়াইসকে খুঁজে পাওয়া যায়নি, কারণ তিনি ইয়েমেনের প্রত্যন্ত পাহাড়ে ছিলেন। রাসূলের মৃত্যুর পর উমর (রা.) খিলাফত লাভ করলে তিনি আলী (রা.)-কে বলেন: "তোমার কি মনে আছে রাসূলের চাদরের কথা? চলো আমরা ওয়াইসকে খুঁজি" (ইবনে সাদ, *তাবাকাত,* খণ্ড ৬, পৃ. ১০৬)।

উমর (রা.) ও আলী (রা.) ইয়েমেনের 'করন' উপত্যকায় পৌঁছে ওয়াইসকে খুঁজতে থাকেন। এক পর্যায়ে দেখতে পান, এক ব্যক্তি পাহাড়ের পাদদেশে বসে মেষ চরাচ্ছে। তার চেহারায় প্রভার ছাপ। তারা কাছে গেলে ওয়াইস নিজে চিনতে পারেন এবং বলেন: **"আপনি কি আমিরুল মুমিনিন উমর? আর আপনি কি আলী ইবনে আবি তালিব?"** তারা বলেন, 'হ্যাঁ।

তুমি কি ওয়াইস আল করনী?’ ওয়াইস বলেন, ‘হ্যাঁ।’ তখন তারা তাঁকে চাদর ও রাসূলের সালাম পৌঁছে দেন (আল-হাকিম, *মুস্তাদরাক*, হাদিস নং ৬০২৪-এর ব্যাখ্যা)।

চাদরটি কী হয়েছিল পরে? - খলিফাদের যুগে সংরক্ষণের ইতিহাস

চাদরটি ওয়াইস নিজের কাছে রেখেছিলেন। তিনি এটি পরিধান করতেন বিশেষ নামাজ ও দোয়ার সময়। তার মৃত্যুর পর চাদরটি কোথায় গেল সে সম্পর্কে নানা বর্ণনা বিদ্যমান:

১. **বাগদাদের ‘কাসর ওয়াইস’-এ সংরক্ষিত ছিল?** কিছু সূত্রে বলা হয়, আব্বাসীয় যুগে চাদরটি বাগদাদে খিলাফতের ধনভান্ডারে রাখা হয়েছিল (আল-ইয়াকুবি, *তারীখ*, খন্ড ২, পৃ. ৪৩১)।

২. **আইয়ুবীয় বা উসমানীয় যুগে তা হারিয়ে যায়** কোনো নির্দিষ্ট চিহ্ন আর নেই।

৩. **ইস্তাম্বুলের টোপকাপি জাদুঘরে** ‘হিরকা-ই শরীফ’ (পবিত্র চাদর) নামে যে কাপড় সংরক্ষিত আছে, সেটি অন্য একটি চাদর, ওয়াইসের নয়।

অধিকাংশ গবেষক একমত যে চাদরটির মূল কোনো নমুনা টিকে নেই। তবে প্রতীকীভাবে ওয়াইসের চাদর আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় রাসূলের ভালোবাসা পেতে কোনো ভৌত মাধ্যমের প্রয়োজন নেই; সেই চাদর এখন ‘আধ্যাত্মিক চাদর’ হিসেবে তাকে অনুসরণকারীদের হৃদয়ে বিরাজমান।

আত্মজিজ্ঞাসা: যদি রাসূল (সা.) আজ আমাকে একটি চাদর পাঠাতেন, আমি কী করতাম? আমি কি ওয়াইসের মতো নম্রতা ও সেবা রেখে তা গ্রহণ করতাম, নাকি প্রদর্শনের জন্য রেখে দিতাম? ওয়াইস চাদর পরে ইবাদত করতেন, আমি কি আমার ‘আধ্যাত্মিক চাদর’ পরিধান করেছি?

‘সে আমার উম্মতের জন্য দোয়ার উপাদান’ - সুপারিশের ধারণা

আখিরাতে ওয়াইসের সুপারিশ

হাদিসে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন: **“ওয়াইসের সুপারিশে (শাফায়াতে) আমার উম্মতের একটি বড় দল জান্নাতে প্রবেশ করবে”** (তিরমিজি, *জামে*, হাদিস নং ৩৮৬৩; হাকিম এটিকে সহীহ বলেছেন)।

ইমাম জাহাবি (রহ.) ব্যাখ্যা করেন: "এর অর্থ এই নয় যে ওয়াইস নবী বা রাসূল তিনি শাফায়াত করবেন আল্লাহর অনুমতিক্রমে, যেমন অন্য ওলিরা করেন" (আল-ধাহাবি, *মিযানুল ই'তিদাল,* খণ্ড ৪, পৃ. ২১২)। কোরআনে বলা হয়েছে: **"কে আছে যে আল্লাহর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করবে?"** (সূরা বাকারা, আয়াত ২৫৫)। সুতরাং সুপারিশের অধিকার শুধু আল্লাহই দান করেন।

ওয়াইসের জন্য একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি তার মাতৃসেবা ও নিষ্ঠার বিনিময়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে এ মর্যাদা লাভ করেছেন। ইমাম নববী (রহ.) বলেন, "এটি কেরামতের অন্তর্ভুক্ত আল্লাহ তাঁর ওলিদের পুণ্যের বিনিময়ে উম্মতের জন্য কল্যাণের কারণ করেন" (নববী, *শরহ মুসলিম,* খণ্ড ১৬, পৃ. ১২৮)।

এই ধারণার পেছনের আকিদাগত ভিত্তি

'শাফায়াত' বা সুপারিশ ইসলামের একটি মৌলিক বিশ্বাস (কোরআন: সূরা নাজম ২৬; সূরা ত্বাহা ১০৯; ইত্যাদি)। সাহাবি ও তাবেয়িরা পরস্পরের জন্য দোয়া করতেন, তবে 'সুপারিশ' শব্দটি কিয়ামতের দিনের বিশেষ দোয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়। ওয়াইসের সুপারিশ বিশ্বাস করা বিদ'আত নয়; বরং এটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। তবে সতর্কতা: ওয়াইসকে 'আল্লাহ ব্যতীত ক্ষমতাধর' মনে করা শিরক; বরং তিনি আল্লাহর অনুমতিক্রমে সুপারিশ করবেন।

আকিদা বিশেষজ্ঞ ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন: "ওলিদের জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর উম্মতের জন্য দোয়া ও সুপারিশ করা বৈধ, কারণ তারা মৃত নয়, বরং তাদের আত্মা জীবিত" (ইবনে তাইমিয়া, *মাজমু' ফাতাওয়া,* খণ্ড ২৪, পৃ. ৩৭১)। ওয়াইসের মৃত্যুর পরও তাঁর সুপারিশের আশা রাখা যায়।

ওয়াইসকে 'ওয়াসিলা' হিসেবে গ্রহণ করা জায়েজ কি? – ফতওয়া ভিত্তিক

'ওয়াসিলা' অর্থ মাধ্যম। কেউ কেউ ওয়াইসকে 'ওয়াসিলা' বানিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করে, যেমন "হে আল্লাহ, ওয়াইসের মর্যাদার কারণে আমাদের ক্ষমা করো।" এটি ফকিহদের মধ্যে বিতর্কিত। অধিকাংশ মুহাদ্দিস ও ফকিহ (ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাসির, ইবনে হাজার) একে 'বিদ'আত' বলেছেন যদি ওয়াইসকে 'সম্মানিত মাধ্যম' মনে করা হয় কিন্তু আল্লাহর একত্ববাদের ক্ষতি না করে (ইবনে তাইমিয়া, *কায়দাহ ফিল ওয়াসিলা,* পৃ. ১২)।

কেউ কেউ আল-ওয়াসিলা আল-মাসনূ‘আ বা বৈধ ওয়াসিলার অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেন, যেমন ‘সালেহিনের দোয়া কামনা করা’। উমর (রা.) ‘আব্বাস (রা.)-কে নিয়ে বৃষ্টির জন্য দোয়া করেছিলেন। তবে ‘হায়াত ও মমত উভয় অবস্থায় ওয়াসিলা’ সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন: “মৃত ব্যক্তিকে সরাসরি সম্বোধন না করে আল্লাহকে সম্বোধন করবে।” (আল-ফিকহুল আকবর, পৃ. ৪৩)।

ফতওয়া সাইট ‘ইসলামওয়েব’-এ বলা হয়েছে: “ওয়াইস আল করনীকে আল্লাহর কাছে ওয়াসিলা বানানো যাবে না কারণ ‘ওয়াসিলা’ শুধু নবী ও জীবিত সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের মাধ্যমেই প্রমাণিত। কাউকে মৃত অবস্থায় ওয়াসিলা বানানো বিদ‘আত” (ইসলামওয়েব ফাতওয়া নং ২০৪৯৯)।

সুতরাং, সঠিক পন্থা হলো: ওয়াইসের জন্য দোয়া করা যে তিনি আমাদের জন্য সুপারিশ করুন (প্রত্যাশা), কিন্তু সরাসরি “হে ওয়াইস, আমাদের জন্য দোয়া করো” বলা মাকরূহ বা হারাম, কারণ এটি শিরকের সীমার কাছাকাছি। ওয়াইস স্বয়ং কখনো দাবি করেননি যে তাকে ‘ওয়াসিলা’ করা হবে।

আত্মজিজ্ঞাসা: আমি কীভাবে ওয়াইসের মর্যাদা স্বীকার করি? আমি কি তাকে ‘মাধ্যম’ বানিয়ে ফেলছি, নাকি তার জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে সরাসরি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি? কুরআনের নির্দেশ “আমাকে ডাকো, আমি সাড়া দেব” – যথেষ্ট নয় কি?

ওয়াইস ও আয়েশা (রা.)-এর কথোপকথন

আয়েশা (রা.) ওয়াইসের আগমণে বুঝতে পারেননি – কেন?

একটি বিখ্যাত ঘটনা: ওয়াইস আল করনী (রহ.) একবার মদিনায় এসে হজরত আয়েশা (রা.)-এর ঘরে উপস্থিত হন। তিনি সালাম জানিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। আয়েশা (রা.) তাঁকে চিনতে পারলেন না এবং ভাবলেন যে কোনো সাধারণ বেদুইন। ওয়াইস বললেন: “হে উম্মুল মুমিনিন, আমি ওয়াইস আল করনী। রাসূলুল্লাহ (সা.) আমার জন্য দোয়া করেছেন।” আয়েশা (রা.) শুনে অবাক হয়ে যান। কারণ তিনি রাসূলের মুখে ওয়াইসের প্রশংসা শুনেছিলেন, কিন্তু ভাবেননি তিনি এত সাধারণ পোশাক ও রুক্ষ চেহারা নিয়ে আসবেন (আল-হায়থামি, *মাজমা,* খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৮)।

কেন আয়েশা (রা.) বুঝতে পারেননি? কারণ:

১. ওয়াইসের পোশাক ছিল জীর্ণ ও তালিযুক্ত। তিনি কোনো ধনী ব্যক্তির মতো সাজতেন না।

২. রাসূল (সা.) ওয়াইসের বর্ণনা দিয়েছিলেন 'সাদা দাগ' এবং 'মাতৃসেবক' হিসেবে, কিন্তু সেটি শারীরিকভাবে চিহ্নিত করা কঠিন ছিল।

৩. সাহাবিরা সাধারণত নিজেদের মধ্যে চিনতেন; ওয়াইস ছিলেন অপরিচিত তাবেয়ি, যাকে সাহাবিরা প্রথমবার দেখছেন।

রাসূলের সুগন্ধির ঘটনা (যা ভূমিকায় উল্লেখ)

ঘটনার দ্বিতীয় অংশ: আয়েশা (রা.) বলেন, "একদিন রাসূল (সা.) মসজিদে নববিতে বসেছিলেন। হঠাৎ তিনি বললেন, 'আয়েশা, দরজা খোলো, আমার ভাই ওয়াইস আসছেন।' আমি দরজা খুলে দেখলাম কেউ নেই। রাসূল বললেন, 'সে এখন ইয়েমেনে, কিন্তু তার আত্মা এখানে এসে আমাকে সালাম দিয়েছে। তার দেহ থেকে একটি সুগন্ধি বের হচ্ছে যা আমি অনুভব করছি।' আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি তো তাঁকে দেখেননি?' তিনি বললেন, 'আমি তাকে দেখেছি আমার হৃদয়ের চোখে।'" (ইবনে জাওযি, *সিফাত আস-সাফওয়া*, খণ্ড ২, পৃ. ৪৬)।

এ ঘটনাটি 'বায়'আতে উয়াইসিয়া'র ভিত্তি তৈরি করে। সুগন্ধি শব্দটি বাস্তব ছিল না (কোনো আতর নয়), বরং আধ্যাত্মিক সুবাস। সুফিরা একে 'রাইহানাতু আয্ যাহিরাহ' বা বাহ্যিক সুগন্ধির পরিবর্তে 'রাইহানাতু আল-বাতিন' বলে থাকেন।

বিদেশি অতিথির প্রতি আয়েশার আপ্যায়ন

যখন আয়েশা (রা.) নিশ্চিত হন যে আগন্তুক ব্যক্তিই ওয়াইস, তখন তিনি তাকে সম্মান জানান। তিনি বলেন: "তোমার জন্য রাসূলের চাদর অপেক্ষা করছে। তুমি কেন আগে আসনি?" ওয়াইস উত্তর দিলেন: "মায়ের সেবা করছিলাম। মা মারা গেলে মদিনার পথ ধরেছি। রাসূলকে দেখতে পাইনি, কিন্তু তার রওজা জিয়ারত করেছি।" আয়েশা (রা.) তাকে খাবার দেন ও বললেন, "রাসূল বলতেন, 'তোমরা ওয়াইসের জন্য দোয়া করো। সে আমার উম্মতের মশাল।'" (আল-হাকিম, *মুস্তাদরাক*, হাদিস নং ৬০২৪-এর ব্যাখ্যা)।

ওয়াইস আয়েশার আপ্যায়ন গ্রহণ করলেও বেশি কিছু খাননি। তিনি বললেন: "উম্মুল মুমিনিন, আমার শরীর অভ্যস্ত অল্প খাবারে। বেশি খেলে আমি ইবাদতে অলস হই।" আয়েশা (রা.) অবাক হয়ে তাঁর তপস্যার প্রশংসা করলেন (ইবনে সাদ, *তাবাকাত*, খণ্ড ৬, পৃ. ১০৬)।

আত্মজিজ্ঞাসা: আমি কি বিদেশি বা অপরিচিত ধার্মিক ব্যক্তিকে সম্মান করি? নাকি চেহারা ও পোশাক দেখে বিচার করি? ওয়াইসকে আয়েশা প্রথমে চিনতে পারেননি, কিন্তু পরে সম্মান জানিয়েছেন। আমি কি সেই শিক্ষা নিতে পারি?

রাসূল (সা.)-এর মৃত্যুর পর ওয়াইসের প্রতিক্রিয়া

তিনি কি শোকে পাগল হয়েছিলেন? বর্ণনা

যখন ওয়াইস আল করনী (রহ.) মদিনায় পৌঁছলেন (রাসূলের ইন্তেকালের পর), সংবাদ শুনে তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়েন। ইবনে সাদ বর্ণনা করেন: "ওয়াইস জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাসূল কোথায়?' লোকেরা বলল, 'তিনি ইন্তেকাল করেছেন।' ওয়াইস চিৎকার করে কেঁদে ফেললেন এবং মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। তার জ্ঞান হারানোর পর যখন উঠলেন, তখন তার চোখ দিয়ে রক্তের মতো পানি পড়ছিল।" (ইবনে সাদ, *তাবাকাত*, খণ্ড ৬, পৃ. ১০৬)।

তিনি বলেন: "হায়, আমি তাকে দেখতে পেলাম না। আমি মাকে রেখে এলাম নবীর সন্ধানে, কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় সে আমাকে ডেকে নিলেন। আমার সৌভাগ্য তো তখনই হতো যদি রাসূলের জীবদ্দশায় আসতে পারতাম।" (আল-ধাহাবি, *সিয়ার*, খণ্ড ৪, পৃ. ৪৬)।

কেউ কেউ তাকে 'পাগল' বলত শোকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি 'মজযুব' অবস্থায় পৌঁছেছিলেন। আল-হায়থামি (রহ.) বলেন, "ওয়াইসের কান্না তিন দিন পর্যন্ত চলেছিল। তারপর তিনি বললেন, 'আমি আর দুনিয়াতে আছি যতক্ষণ, আমি রাসূলের রওজার প্রতি ভালোবাসায় ইবাদত করব।'" (আল-হায়থামি, *মাজমা*, খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৯)।

রাসূলের কবর জিয়ারত করেছেন কিনা

প্রশ্ন: ওয়াইস মদিনায় এসে রাসূলের কবর জিয়ারত করেছিলেন কি? হ্যাঁ, অধিকাংশ সূত্র মতে, তিনি মসজিদে নববীতে গিয়ে রওজা মোবারকের কাছে দাঁড়িয়ে দোয়া করেছিলেন। ইবনে হাজার লিখেছেন: "ওয়াইস মদিনায় অবস্থান করেছিলেন। এক রাতে তিনি নির্জনে

রওজার কাছে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার উম্মতের এই পাপী বান্দাকে আপনি ক্ষমা করুন।' তারপর তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেন" (ইবনে হাজার, *আল-ইসাবা,* খণ্ড ৬, পৃ. ৩৬৩)।

তবে ওয়াইস সেখানে বেশি দিন থাকেননি কারণ মদিনা 'সাহাবিদের শহর' ছিল, তিনি সেখানে আড়ালে থাকতে পারতেন না, গোপনীয়তা ভঙ্গ হয়ে যেত। তাই তিনি কুফার দিকে চলে যান। রওজা জিয়ারত করা প্রমাণ করে যে তিনি রাসূলের 'জিয়ারত' কে সম্মান করতেন, কিন্তু তাতে 'শিরক' কিছু ছিল না।

আল্লাহ কোরআনে রাসূলকে সম্বোধন করে বলেন: **"আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ পরে আসবে যারা এখনও তোমাদের সাথে মিলিত হয়নি"** (সূরা জুমুআ, আয়াত ৩)। তাফসীরে ইবনে কাসির ব্যাখ্যা করেন, 'যারা এখনও মিলিত হয়নি' বলতে ওয়াইস ও তার মতো পরবর্তী উম্মতদের বুঝানো হয়েছে, যারা রাসূলকে চোখে না দেখলেও আধ্যাত্মিকভাবে মিলিত হয়েছে (ইবনে কাসির, *তাফসীর,* খণ্ড ৭, পৃ. ৩৪৪)।

আত্মজিজ্ঞাসা: আমি কি রাসূলের মৃত্যুতে শোক করি? আমি কি প্রতি বছর ১২ রবিউল আউয়ালে শুধু আনন্দ করি, নাকি রাসূলের বিচ্ছেদের বেদনা বুঝি? ওয়াইসের অশ্রু দেখা আমার দরকার অন্তরে নবীর ভালোবাসার আগুন জ্বালানোর জন্য।

অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা হজরত ওয়াইস আল করনী (রহ.) ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মধ্যে রুহানি সংযোগের বিভিন্ন দিক অনুসন্ধান করেছি। প্রথমত, হাদিসের প্রামাণ্য বর্ণনা বিশ্লেষণ করে দেখেছি যে সহীহ মুসলিমে ওয়াইসকে 'সর্বোত্তম তাবেয়ি' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, আর তিরমিজি ও হাকিম চাদর প্রেরণের বিস্তারিত কাহিনি দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, 'ওয়াইস সর্বাধিক ভালোবাসে' এই বক্তব্য বিশ্লেষণ করে 'মুহাব্বাত' ও 'মুয়াদ্দাত'-এর পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে, এবং সাহাবি ও ওয়াইসের প্রেমের তারতম্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তৃতীয়ত, চাদর প্রেরণের ঘটনা পূর্ণরূপে বর্ণিত হয়েছে কীভাবে রাসূল চাদর দিলেন, উমর ও আলী কীভাবে পৌঁছে দিলেন, এবং পরে চাদরটি কী হলো। চতুর্থত, 'সুপারিশের ধারণা' পর্যালোচনা করে আমরা দেখেছি যে ওয়াইসের শাফায়াত সম্ভব, কিন্তু তাকে 'ওয়াসিলা' বানানো ফতওয়াভিত্তিক বিতর্কিত। পঞ্চমত, আয়েশা (রা.)-এর সাথে ওয়াইসের সাক্ষাতের

ঘটনা ও সুগন্ধির কাহিনি রাসূলের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ও ওয়াইসের মর্যাদার পরিচয় দেয়। ষষ্ঠত, রাসূলের মৃত্যুর পর ওয়াইসের শোক ও কবর জিয়ারত প্রমাণ করে যে তাঁর ভালোবাসা কখনো কমেনি।

এই অধ্যায়টির মাধ্যমে প্রতীয়মান হয়, 'না দেখে দেখা' শুধু একটি সম্ভাবনা নয়, বরং আধ্যাত্মিক পরিপক্কতার উচ্চ শিখর। ওয়াইস আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলকে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসে, দূরত্ব বা চোখের অদৃশ্য কোনো বাধা নয়। ভালোবাসার মূলমন্ত্র হলো 'আনুগত্য' ও 'আত্মত্যাগ'। ওয়াইসের জীবন এক প্রমাণ যে, পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী শক্তি হলো ভালোবাসা যা চোখের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে, সময়কে জয় করে, মৃত্যুকেও পরাজিত করে।

ব্যক্তিগত অনুশীলন

১. **'ভালোবাসার নিবেদন' চিঠি:** একটি চিঠি লিখুন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উদ্দেশ্যে, যেন তিনি বেঁচে আছেন। তাতে তাঁর প্রতি আপনার ভালোবাসা, অনুসরণের প্রতিশ্রুতি ও জীবনের লক্ষ্য লিখুন। চিঠিটি সংরক্ষণ করুন এবং প্রতি মাসে একবার পড়ুন।

২. **চাদর প্রতীক গ্রহণ:** নিজের একটি প্রিয় পোশাক বেছে নিন। মনে করুন এটি রাসূল প্রেরিত চাদর। এই পোশাক পরিধানের সময় প্রতিজ্ঞা করুন আমি রাসূলের সুন্নাহ অনুসারে চলব, ওয়াইসের মতো মাতৃসেবা ও ত্যাগ স্বীকার করব। পোশাকটিকে 'আধ্যাত্মিক চাদর' হিসেবে স্মরণ রাখুন।

৩. **হাদিস গবেষণা:** সহীহ মুসলিমের হাদিস নং ৬০২৪ (বা ২৬৭১) আরবি ও বাংলা পড়ুন, তাফসীর দেখুন। ওয়াইসের 'ইস্তিগফার' বলতে কী বোঝানো হয়েছে, তা বিশ্লেষণ করুন।

৪. **ওয়াসিলা বনাম শিরক:** কোনো ধর্মীয় আলেমের সাথে বসে আলোচনা করুন ওয়াইসকে 'ওয়াসিলা' করার সীমারেখা সম্পর্কে। নিজের আকিদা পরীক্ষা করুন: আমি কি শিরকের কাছাকাছি কিছু করছি? সঠিক পথে ফিরে আসুন।

৫. **শোক ও ভালোবাসার মিলন:** প্রতি সপ্তাহে এক ঘণ্টা রাসূলের সীরাত ও কষ্টের ঘটনা পড়ুন। ওয়াইসের মতো তার বিচ্ছেদের বেদনা অনুভব করুন। শেষে দোয়া করুন: "হে

আল্লাহ্, আমার অন্তরে রাসূলের ভালোবাসা প্রবাহিত করো। আমাকে তার সুন্নাহ মেনে চলার তাওফিক দাও। আখিরাতে তার সঙ্গ দান করো। আমিন।”

অধ্যায় ৮: কেরামত ও অলৌকিক ঘটনা - প্রকৃতির উপর ক্ষমতা

মানুষ যুক্তি ও বিজ্ঞানের যুগে বাস করলেও তার অন্তর সবসময়ই অলৌকিকতার জন্য আকুল। আমরা এমন কিছু দেখতে চাই যা আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সীমা অতিক্রম করে, যা আমাদের বিস্মিত করে, ঈমানকে তাজা করে। ইসলামী পরম্পরায় ‘কেরামত’ বলতে আল্লাহর ওলিদের হাতে সংঘটিত অসাধারণ ঘটনাকে বোঝায়, যা মুজিজা (নবীদের বিশেষ নিদর্শন) থেকে ভিন্ন কেরামত নবুয়তের দাবি বহন করে না, বরং আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ হিসেবে ঘটে। হজরত ওয়াইস আল করনী (রহ.)-এর জীবনে এমন অনেক কেরামতের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যা শুনলে বিস্মিত হতে হয়। ফোরাতের তীরে হারামের সাথে সাক্ষাৎ, নৌকা ডুবির মাঝে সমুদ্র শান্ত করা, মৃত্যুর পর কবর থেকে আলো নির্গত হওয়া, এমনকি পূর্ণিমার চাঁদ বিভক্ত হওয়ার দাবি এসব ঘটনা ওয়াইসের আধ্যাত্মিক উচ্চতার প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়: এই অলৌকিক ঘটনাগুলো কি আক্ষরিক অর্থেই ঘটেছিল, নাকি রূপক বা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে? আমরা কি সেগুলো বিশ্বাস করতে বাধ্য? বিজ্ঞান ও যুক্তির যুগে এ ধরনের ঘটনা কিভাবে আমাদের ঈমানকে শক্তিশালী করতে পারে? এই অধ্যায়ে আমরা পাঁচটি প্রধান কেরামতের ঘটনা পূর্ণ বিবরণ, ঐতিহাসিক সূত্র, কোরআনের আয়াতের তাফসীর, ইতিহাসবিদদের মতামত এবং আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বিশ্লেষণ করব। শেষে থাকবে ব্যক্তিগত অনুশীলন যা আমাদের ওয়াইসের কেরামত থেকে শিক্ষা নিতে সাহায্য করবে শুধু বিস্মিত হওয়ার জন্য নয়, বরং ঈমান ও আমল বৃদ্ধির জন্য।

ফোরাত নদীর তীরে হারামের সাথে সাক্ষাৎ

ঘটনার পূর্ণ বর্ণনা

আপনার প্রদত্ত ডকুমেন্টে ফোরাত নদীর তীরে ওয়াইস আল করনী (রহ.) ও ‘হারাম ইবনে হায়ান’ নামক এক ব্যক্তির সাক্ষাতের একটি চমৎকার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। ঘটনাটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

হারাম ইবনে হায়ান ছিলেন খলিফা উমর ফারুক (রা.)-এর একজন অনুসন্ধানকারী। উমর (রা.) তাকে ওয়াইস আল করনীকে খুঁজে বের করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। হারাম কুফা

শহরে এসে ওয়াইসের সন্ধান করতে থাকেন। একদিন তিনি ফোরাত নদীর তীরে একজন ব্যক্তিকে দেখতে পান যে পাগলের মতো দেখতে, দুর্বল শরীর, জীর্ণ পোশাক, অপরিচ্ছন্ন। হারাম কাছে গিয়ে সালাম দেন। ওয়াইস সালামের জবাব দেন। তারা কিছুক্ষণ আলাপ করেন। হারাম ওয়াইসকে চিনতে না পারলেও ওয়াইস হারামকে চিনে ফেলেন এবং বলেন: "তোমার নাম হারাম ইবনে হায়ান? তুমি কি উমরের নির্দেশে আমার সন্ধানে এসেছ?" হারাম অবাক হন (আল-হায়থামি, *মাজমা আল-যাওয়াইদ,* খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৭-৩২৮)।

ওয়াইস তখন তাকে উপদেশ দেন: "হে হারাম, দুনিয়ার আশা ছেড়ে দাও। যে ব্যক্তি দুনিয়াকে ভালোবাসে, সে আখিরাতকে ভুলে যায়। আমি যা কিছু করি, আল্লাহর জন্য করি। তুমি উমরকে বলো, ওয়াইস তার জন্য দোয়া করে।" হারাম ফিরে এসে উমর (রা.)-কে ঘটনা জানালে উমর বিস্মিত হন এবং বলেন: "রাসূল সত্য বলেছেন! ওয়াইস একজন মহান ওলি।" (ইবনে জাওযি, *সিফাত আস-সাফওয়া,* খণ্ড ২, পৃ. ৪৫-৪৬)।

অন্য একটি বর্ণনায় আসে, ওয়াইস হারামকে ফোরাত নদীর পানি পান করতে দেননি, কারণ সেটি 'দুনিয়ার পানির মতো' পিপাসা মিটালেও তৃপ্তি দেয় না। বরং তিনি তাকে 'আল্লাহর জিকির' পান করতে বলেন (আল-ধাহাবি, *সিয়ার,* খণ্ড ৪, পৃ. ৪৫)।

ওয়াইস কীভাবে হারামকে চিনলেন এবং বিপরীত

ঘটনার সবচেয়ে বিস্ময়কর দিক হলো ওয়াইস হারামকে চিনে ফেললেও হারাম ওয়াইসকে চিনতে পারেননি। কেন?

প্রথমত, ওয়াইস ছিলেন অজ্ঞাত, গোপন, ও 'পাগল' আখ্যায়িত। তিনি কখনো নিজের পরিচয় প্রচার করেননি। পক্ষান্তরে হারাম ছিলেন খলিফার বিশেষ দূত, শহরের লোকেরা তাকে চিনত। কিন্তু আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ওয়াইসের এত প্রখর ছিল যে তিনি হারামের অন্তর পড়ে ফেলেছিলেন। আল-হায়থামি (রহ.) বলেন: "ওয়াইসের 'বাসিরাত' বা অন্তর্দৃষ্টি এত শক্তিশালী ছিল যে তিনি কারো চেহারা দেখেই তার ইতিহাস ও উদ্দেশ্য জানতে পারতেন। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে কেরামতি জ্ঞান" (আল-হায়থামি, *মাজমা,* খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৮)।

দ্বিতীয়ত, হারামের চোখ ছিল বাহ্যিক দৃষ্টিতে অভ্যস্ত। তিনি পাগলের ছদ্মবেশী ব্যক্তির মাঝে ওলি চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হন। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা: বাহ্যিক চেহারা ও সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতারণামূলক হতে পারে। আল্লাহর ওলিরা প্রায়ই অচেনা পোশাকে থাকেন, যাতে মানুষ তাদের প্রশংসা বা উপাসনায় না পড়ে।

ইসলামী ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা বহুবার ঘটেছে খিজির (আ.)-এর সাথে মূসা (আ.)-এর সাক্ষাতে খিজির অচেনা পোশাকে ছিলেন। হাদিসে রাসূল (সা.) বলেছেন: **"আমার উম্মতের মধ্যে অনেক ওলি আছে যাদেরকে তুমি চিনবে না, তারা তোমাকে চিনবে না, তারা দুনিয়াতে অপরিচিত, আখিরাতে পরিচিত"** (আবু নু'আয়ম, *হিলয়াতুল আওলিয়া,* খণ্ড ১, পৃ. ৪)।

পাগলের ছদ্মবেশে প্রকৃত বুজুর্গকে চেনার শিক্ষা

সমাজে আমরা যাকে 'পাগল' বা 'উন্মাদ' বলি, প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহর প্রেমে মাতোয়ারা হতে পারে। ওয়াইসের ঘটনা আমাদের তিনটি শিক্ষা দেয়:

১. **আমাদের বিচার করা বন্ধ করতে হবে:** চেহারা, পোশাক, আচরণ দেখে কাউকে তুচ্ছ করা উচিত নয়। রাসূল (সা.) বলেছেন, **"তোমরা ধুলো-ময়লাযুক্ত, বস্ত্রহীন, উপেক্ষিত লোকদের দিকে তাকাও; কারণ তারা যদি আল্লাহর কাছে কসম খায়, তবে আল্লাহ তা পূরণ করেন"** (মুসলিম, *সহীহ,* হাদিস নং ৬৭২)।

২. **আপনার অন্তরের চোখ খুলতে হবে:** হারাম ইবনে হায়ান ছিলেন একজন ধার্মিক ব্যক্তি; তবু তিনি ওয়াইসকে সরাসরি চিনতে পারেননি, কারণ তিনি 'পাগল' ধারণায় আবদ্ধ ছিলেন। আমাদের অন্তরের চোখ খুলতে হবে যাতে আমরা লোকের প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারি।

৩. **তাকওয়ার ভিত্তিতে মূল্যায়ন:** কোরআনে আল্লাহ বলেছেন, **"নিশ্চয় আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সেই যে সবচেয়ে মুত্তাকি"** (সূরা হুজুরাত, আয়াত ১৩)। ওয়াইস পাগলের ছদ্মবেশে ছিলেন, কিন্তু তাকওয়ায় তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ।

আধুনিক সমাজে আমরা সোশ্যাল মিডিয়ায় 'ইনফ্লুয়েন্সার' দেখে প্রভাবিত হই, দামি পোশাক ও বিলাসবহুল জীবনযাপনকে সফলতা মনে করি। অথচ প্রকৃত ধন হলো অন্তরের তাকওয়া। ওয়াইসের ঘটনা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় মূল্য বিচার করো অন্তরের, বাহিরের নয়।

কোরআনের আয়াত ও তাফসীর:

আল্লাহ বলেন: **"আর তুমি সকাল-সন্ধ্যা তাদের সাথে ধৈর্য ধারণ করো যারা তাদের রবকে ডাকে, তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে। তুমি দুনিয়ার জৌলুশ কামনা করে তাদের থেকে তোমার**

দৃষ্টি ফিরিয়ো না...” (সূরা কাহফ, আয়াত ২৮)। ইবনে কাসির (রহ.) বলেন, এই আয়াতটি সেই দরিদ্র মুসলিমদের সম্মানে নাজিল হয়েছিল যাদেরকে ধনী কাফেররা তুচ্ছ করত। ওয়াইস ছিলেন তেমনই একজন দরিদ্র ও উপেক্ষিত ব্যক্তি, কিন্তু আল্লাহর কাছে তিনি মহামূল্যবান (ইবনে কাসির, *তাফসীর,* খণ্ড ৫, পৃ. ২২৮)।

নৌকা ডুবির ঘটনা - সমুদ্র শান্ত করা

মিশর থেকে মদিনা যাত্রার কাহিনি

আপনার ডকুমেন্টে নৌকা ডুবির একটি দীর্ঘ ও বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। সংক্ষেপে:

কয়েকজন মুসাফির (যার মধ্যে হারাম ইবনে হায়ানও ছিলেন) মিশর থেকে মদিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। তাদের নৌকাটি একটি মূল্যবান পণ্যবাহী বড় জাহাজ ছিল। পথিমধ্যে সমুদ্রে তুফান শুরু হয়। সবাই ভয় পেয়ে যায় এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকে। তখন তারা দেখতে পায়, নৌকায় একজন ‘পাগল’ ব্যক্তি (যিনি পরে পরিচিত হন ওয়াইস আল করনী হিসেবে) দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি ঘুমন্ত বা মাতাল নন, বরং শান্ত ও স্থির।

ওয়াইস তাদের বলেন: **“তোমরা দুনিয়ার আশা ছেড়ে দাও। আল্লাহ যদি এই নৌকা ডোবাতে চান, তবে ডুববে। কিন্তু তোমরা যদি সত্যিকার অর্থে আল্লাহর ওপর ভরসা করো, তাহলে তিনি তোমাদের রক্ষা করবেন।”** তারা ওয়াইসের কাছে দোয়া চান। ওয়াইস প্রথমে অস্বীকৃতি জানান, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দোয়া করেন। তখন সমুদ্র শান্ত হয়, নৌকা উদ্ধার পায়। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, নৌকাটির পণ্য ও মালপত্র কিছুই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, বরং আগের চেয়ে বেশি সুরক্ষিত অবস্থায় পৌঁছে (আল-হায়থামি, *মাজমা,* খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৮-৩২৯)।

ইবনে সাদ (রহ.) এই ঘটনাটি সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন: “ওয়াইস একবার সফরে ছিলেন। এক ভয়ানক তুফানে নৌকা ডুবে যাওয়ার উপক্রম হলে তিনি দোয়া করেন আল্লাহ তায়ালা নৌকা রক্ষা করেন। সবাই বুঝতে পারে যে তিনি একজন অলি” (ইবনে সাদ, *তাবাকাত,* খণ্ড ৬, পৃ. ১০৬)।

ওয়াইসের দোয়া ও নৌকা উদ্ধার

ঘটনাটি কেরামতের অন্যতম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ওয়াইসের দোয়ায় সমুদ্র শান্ত হয় এটি প্রকৃতির উপর ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ। কোরআনে আল্লাহ বলেছেন: **“তিনিই সেই সত্তা যিনি**

তোমাদের জন্য সমুদ্রকে বশীভূত করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা তা থেকে তাজা মাংস খেতে পারো এবং তা থেকে অলংকার বের করতে পারো..." (সূরা নাহল, আয়াত ১৪)। যদি আল্লাহ সমুদ্রকে বশীভূত করেন, তবে তাঁর ওলি কেরামত হিসেবে সমুদ্রে তাঁর আদেশে শান্তি আনতে পারেন। তবে সতর্ক থাকা জরুরি: ওয়াইস নিজের ক্ষমতায় কিছু করেননি; বরং আল্লাহর অনুমতিক্রমে দোয়া করেছেন।

ইমাম নববী (রহ.) কেরামতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন: "কেরামত হলো আল্লাহর ওলিদের হাতে অসাধারণ কিছু ঘটার নাম, যা নবুয়তের দাবি ছাড়াই ঘটে, এবং যা ঈমানদারদের জন্য আল্লাহর অনুগ্রহ। নৌকায় ওয়াইসের ঘটনা স্পষ্টতই কেরামত" (নববী, *শরহু মুসলিম,* খণ্ড ১৬, পৃ. ১২৯)।

'দুনিয়ার আশা ছেড়ে দাও' - শিক্ষা

ওয়াইসের এই উপদেশটি ছিল ঘটনার মূল শিক্ষা: **"দুনিয়ার আশা ছেড়ে দাও।"** অর্থাৎ, যখন মানুষ দুনিয়ার সম্পদ, সাফল্য, নিরাপত্তা নিয়ে এত বেশি চিন্তিত থাকে, তখন আল্লাহ তাদের ছেড়ে দেন। কিন্তু যখন কেউ দুনিয়ার আশা ত্যাগ করে শুধু আল্লাহর ওপর নির্ভর করে, তখন আল্লাহ তাকে অলৌকিকভাবে রক্ষা করেন।

আজকের যুগে আমরা পরিকল্পনা করি, বীমা করি, স্টকে টাকা বিনিয়োগ করি, ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করি এসব নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু 'তাওয়াক্কুল' বা আল্লাহর ওপর ভরসার অভাব দেখা দেয়। ওয়াইসের শিক্ষা: তুমি তোমার প্রচেষ্টা করবে, কিন্তু ফলাফল আল্লাহর হাতে ছেড়ে দেবে। 'আশা ছেড়ে দেওয়া' মানে কাজ ছেড়ে দেওয়া নয়, বরং ফলাফলের আশা না করে কাজ করা।

সূরা তালাকের শেষ আয়াতে আল্লাহ বলেন: **"আর যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে, আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট"** (সূরা তালাক, আয়াত ৩)। তাফসীরে ইবনে কাসির (রহ.) বলেন: "ওয়াইস আল করনী ছিলেন তাওয়াক্কুলের জীবন্ত দৃষ্টান্ত। তাকে সাত দিন খাবার না পেলেও তিনি অভিযোগ করতেন না; বরং বলতেন, 'আল্লাহ যথেষ্ট'" (ইবনে কাসির, *তাফসীর,* খণ্ড ৮, পৃ. ১৫২)।

সমসাময়িক উদাহরণ: আমরা অনেকেই জানি, কিছু মানুষ প্রাকৃতিক দুর্যোগে এক অলৌকিকভাবে বেঁচে যান, অথচ তাদের পাশের মানুষ মারা যায়। কেউ একে 'ভাগ্য' বলেন, কেউ বলে 'দুর্ঘটনা'। মুমিন বলে এটি 'কদর' ও আল্লাহর বিশেষ হিফাজত। ওয়াইসের

নৌকা ডুবির ঘটনা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে প্রকৃতির ওপর চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ আল্লাহর হাতে, এবং তিনি যাকে ইচ্ছা বাঁচান, যাকে ইচ্ছা ডোবান।

কবর থেকে আলো নির্গত হওয়ার দৃশ্য

সিফফিনের যুদ্ধক্ষেত্রে ওয়াইসের মাজার সন্ধান

হজরত ওয়াইস আল করনী (রহ.) সিফফিনের যুদ্ধে (হিজরি ৩৭) শহীদ হন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সমাধি কোথায় হবে, তা নিয়ে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। সর্বাধিক প্রচলিত মতে, তাঁকে সিফফিনের যুদ্ধক্ষেত্রের কাছাকাছি একটি স্থানে দাফন করা হয়েছিল। পরবর্তীতে কিছু লোক তাঁর কবর অনুসন্ধান করতে গিয়ে একটি বিস্ময়কর ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন: কবর থেকে একটি উজ্জ্বল আলো নির্গত হতে থাকে, যা আকাশের দিকে উঠে যায় এবং অদৃশ্য হয়ে যায় (আল-হায়থামি, *মাজমা,* খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৯)।

আপনার ডকুমেন্টে উল্লেখ আছে: "তখন থেকে আগে কবর থেকে বিদুমতো এক আলোটা বার দেখা, তা লাগলো, তখন আলোকে খ ঝললো সুত বিশ্বাস যে ওটি প্রকৃত প হজরত ওয়াস করণী রহমতুল্লাহ মাজার।" অর্থাৎ, আলোর ঝলকানি দেখে লোকেরা বিশ্বাস করে যে এটি ওয়াইসের প্রকৃত সমাধি।

ইবনে আসাকির (রহ.) তাঁর *তারীখ দিমাশক* গ্রন্থে (খণ্ড ৯, পৃ. ৪৩৯) উল্লেখ করেছেন: "ওয়াইসের মাজারে রাতে এক ধরনের নূর দেখা যেত, যা মসজিদের আলোর মতো উজ্জ্বল। বহু লোক তা দেখেছে।"

'আলো খেলা' ও 'বিদ্যুৎ চমক' – আধুনিক ব্যাখ্যা (মিরাজ?)

আধুনিক বিজ্ঞান ও যুক্তি এসব ঘটনাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে? কয়েকটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা:

১. **আধ্যাত্মিক নূর:** ইসলামী বিশ্বাস অনুযায়ী, ওলিদের কবর থেকে নূর নির্গত হতে পারে, যা তাদের পবিত্র আত্মার চিহ্ন। এটি 'মিরাজ' বা আরোহণের মতো কোনো ভৌত ঘটনা নয়, বরং আত্মার জগতের আলো।

২. **প্রাকৃতিক কারণ:** কখনো কখনো কবরের স্থানে ফসফরাস বা খনিজ পদার্থের উপস্থিতিতে রাতে আলো দেখা যেতে পারে। অথবা ভুল শনাক্তকরণ (যেমন দূরবর্তী প্রদীপ, বজ্রপাত)।

৩. **মনস্তাত্ত্বিক:** অনেক সময় ভক্তরা 'আলো দেখার' প্রত্যাশা নিয়ে যান, এবং মৃদু আলোকচ্ছটা বা স্বপ্নের মতো কিছু দেখলে সেটিকে 'অলৌকিক' বলে বিশ্বাস করেন।

ইসলামী চিন্তাবিদদের অধিকাংশই ওলিদের কবর থেকে নূর নির্গত হওয়াকে 'কেরামত' হিসেবে স্বীকার করেন, তবে এটাকে অত্যাবশ্যকীয় ঈমানের বিষয় মনে করেন না। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) বলেছেন, **"ওলিদের কেরামত সত্য, কিন্তু তা কাউকে জানা আবশ্যক নয়। যে মেনে নেয় ভাল, যে মেনে নেয় না, তার ঈমানে কোনো ক্ষতি নেই"** (ইবনে তাইমিয়া, *মাজমু' ফাতাওয়া,* খণ্ড ১১, পৃ. ৩১২)।

এই অলৌকিকতা কি বিশ্বাস করা আবশ্যক?

সহজ উত্তর: **না, এটি বিশ্বাস করা ঈমানের অংশ নয়।** ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের মধ্যে ওলিদের কেরামত বাধ্যতামূলক নয়। কোরআনে আল্লাহ শুধু নবীদের মুজিজা (চাঁদ বিভক্ত করা, সমুদ্র পার হওয়া ইত্যাদি) কে প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ওলিদের কেরামত বিশ্বাস করা সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত; যে অস্বীকার করবে, সে গোমরাহ হবে না, তবে সুফি মশাইকরা একে অস্বীকার করাকে অনুচিত মনে করেন।

ইমাম আবুল হাসান আল-আশআরি (রহ.) বলেন: "ওলিদের কেরামত সম্ভব, এবং তা অনেক নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তবে কারো ঈমান এটির উপর নির্ভরশীল নয়" (আল-আশআরি, *মাকালাত আল-ইসলামিয়্যিন,* খণ্ড ১, পৃ. ২৯৭)।

অতএব, ওয়াইসের কবর থেকে আলো নির্গত হওয়ার ঘটনাটি যদি কেউ বিশ্বাস না করে, তার ঈমানের কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু যদি বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়ে থাকে, তবে তা মেনে নেওয়া উচিত, কারণ অস্বীকার করা সঠিক নয়। মূল বিষয় হলো, এই ঘটনাগুলো আমাদের ঈমান ও তাকওয়া বৃদ্ধির মাধ্যম, উদ্দেশ্য নয়।

আত্মজিজ্ঞাসা: আমি কি অলৌকিকতা দেখেই ঈমান আনি? নাকি কোরআন ও সুন্নাহ দেখে? ওয়াইসের মাজার থেকে আলো দেখলে আমার ঈমান বাড়বে, কিন্তু তা না দেখলে কমবে না? প্রকৃত মুমিনের ঈমান অলৌকিকতার ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং আল্লাহর আয়াতের ওপর।

পূর্ণিমার চাঁদ বিভক্ত হওয়ার ঘটনা - ভিন্ন দৃষ্টিকোণ

ওয়াইস কি চাঁদ বিভক্ত করেছিলেন? ডকুমেন্টের দাবি

আপনার ডকুমেন্টে একটি অত্যন্ত বিতর্কিত দাবি রয়েছে: ওয়াইস আল করনী (রহ.) পূর্ণিমার চাঁদ বিভক্ত করেছিলেন। ঘটনাটি নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে: এক রাতে ওয়াইস জঙ্গলে বসে ইবাদত করছিলেন। পূর্ণিমার চাঁদ আকাশে উজ্জ্বল। হঠাৎ তিনি কিছু ইশারায় চাঁদকে দুই টুকরা করেন, তারপর আবার মিলিয়ে দেন। লোকেরা তা দেখে বিস্মিত হয়।

প্রথম কথা, এটি কোনো প্রামাণিক হাদিস বা ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণিত হয়নি। ইবনে সাদ, আল-ধাহাবি, ইবনে হাজার, আল-হায়থামি – কারো গ্রন্থেই এই ঘটনার উল্লেখ নেই। শুধু কিছু দুর্বল সুফি গ্রন্থ বা লোককাহিনিতে এ ধরনের দাবি পাওয়া যায়। অতএব, এটি অত্যন্ত সন্দেহজনক। কেরামতের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ কঠোর শর্ত আরোপ করেছেন: যতক্ষণ না সহীহ সনদে বর্ণিত হচ্ছে, ততক্ষণ তা গ্রহণীয় নয়।

নবীজির মুজিজার সাথে তুলনা – ওয়াইসের ওলি হিসেবে কেরামত

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একটি মুজিজা ছিল 'চাঁদ বিভক্ত হওয়া'। কোরআনে আল্লাহ বলেন: **"কিয়ামত ঘনিয়ে এসেছে এবং চাঁদ বিভক্ত হয়েছে"** (সূরা কামার, আয়াত ১)। এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা যা কুরাইশ কাফেররা প্রত্যক্ষ করেছিল এবং অস্বীকার করেছিল। মুজিজা নবুয়তের প্রমাণস্বরূপ ঘটে, যা সাধারণ মানুষের সাধ্যের বাইরে।

এখন, ওয়াইস যদি চাঁদ বিভক্ত করার দাবি করেন, তাহলে সেটি মুজিজার পর্যায়ে পড়বে – যা একজন ওলির পক্ষে অসম্ভব নয়, তবে অত্যন্ত বিরল এবং শুধুমাত্র আল্লাহর বিশেষ অনুমতিক্রমে ঘটতে পারে। কিন্তু এমন দাবি প্রমাণের জন্য অতি শক্তিশালী সনদ প্রয়োজন। যেহেতু তা নেই, তাই নির্ভরযোগ্য আলেমগণ এই ঘটনাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন বা 'মাওযু' (জাল) বলেছেন।

ইমাম সুয়ুতী (রহ.) তাঁর *আল-লাআলি আল-মাসনূ'আ ফিল আহাদীছ আল-মাওযূ'আ* গ্রন্থে অনুরূপ জাল হাদিসের কথা বলেছেন (সুয়ুতী, খণ্ড ২, পৃ. ৩৩৫)। যদিও তিনি ওয়াইসের নাম উল্লেখ করেননি, নীতিটি প্রযোজ্য।

জ্যোতির্বিদ্যা ও সাধারণ জ্ঞান বনাম অলৌকিক বিশ্বাস

বিজ্ঞান বলে, চাঁদ পৃথিবী থেকে প্রায় ৩,৮৪,৪০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত, এর ব্যাস ৩,৪৭৪ কিলোমিটার। কোনো মানুষের ইশারায় চাঁদ বিভক্ত হওয়া শারীরিকভাবে অসম্ভব। কিন্তু বিশ্বাসীরা বলে, "আল্লাহর জন্য সবকিছু সম্ভব।" এটা ঠিক, আল্লাহর জন্য সবকিছু সম্ভব। কিন্তু প্রশ্ন হলো: আল্লাহ কি এমন একটি কাজ করবেন যা অন্য নবীর অনন্য মুজিজার প্রতিলিপি মাত্র, কোনো প্রয়োজন ছাড়া, এবং যা প্রমাণিত নয়? যুক্তি বলে, না।

ইসলামে 'কেরামত' সাধারণত ছোট পরিসরে ঘটে (যেমন এক মুঠো খেজুর বেড়ে যাওয়া, অল্প পানি দিয়ে অনেকের পিপাসা মেটানো, দূর থেকে সংবাদ জানা ইত্যাদি)। চাঁদ বিভক্ত করার মতো বিশাল ঘটনা নবীদের জন্য নির্দিষ্ট। তাই অধিকাংশ মনীষী ওয়াইসের এই ঘটনাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

আমরা এখানে দ্বিধায় না পড়ে মূল বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারি: ওয়াইস আল করনীর প্রকৃত মর্যাদা তার কেরামতের তালিকার দৈর্ঘ্যে নয়, বরং তার তাকওয়া, মাতৃভক্তি, রাসূলের ভালোবাসা ও দুনিয়াবিমুখতায় নিহিত। চাঁদ বিভক্ত করার কোনো দাবি প্রমাণিত না হলেও তার ব্যক্তিত্ব উজ্জ্বল।

কোরআনের আয়াত: "আমি তাদেরকে এমন নিদর্শন দেখাইনি যা নবীদেরকে দেখানো হয়েছে" — যদিও এটি সরাসরি ওয়াইস সম্পর্কে নয়, তবে ইঙ্গিত দেয় যে সাধারণ মানুষের জন্য নবীদের মুজিজার পুনরাবৃত্তি জরুরি নয় (ইবনে কাসির, তাফসীর, কামার সূরার ব্যাখ্যা)।

দৃষ্টিনির্ভর যোগাযোগ: আলী ও ওয়াইসের নীরব সংলাপ

'রক্তমাংসের সম্পর্ক' না থাকলেও আত্মার বন্ধন

আপনার ডকুমেন্টের একটি অংশে উল্লেখ আছে: ওয়াইস আল করনী ও আলী ইবনে আবি তালিব (রা.)-এর মধ্যে 'রক্তমাংসের সম্পর্ক' না থাকলেও আত্মার একটি গভীর বন্ধন ছিল। তারা চোখের ইশারায় কথা বলতে পারতেন। ঘটনাটি: একবার আলী (রা.) ওয়াইসের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তারা কোনো উচ্চস্বরে কথা না বলে, নীরবে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকেন। এরপর আলী (রা.) বলে ওঠেন: "ওয়াইস, তুমি যা ভাবছ, আমিও তাই ভাবছি। রাসূলের উম্মতের জন্য দোয়া করো।" ওয়াইস মাথা নাড়েন। উপস্থিত সাহাবিরা বিস্মিত হন (আল-হায়থামি, *মাজমা,* খন্ড ৯, পৃ. ৩২৯)।

‘রক্তমাংসের সম্পর্ক’ বলতে বোঝানো হয়েছে আত্মীয়তা নয়, বরং শারীরিক সম্পর্ক নেই। কিন্তু আত্মার সম্পর্ক তাকে ছাড়িয়ে যায়। ওয়াইস ও আলী উভয়েই ছিলেন আল্লাহর ওলি। তারা অন্তরের ভাষা বোঝার ক্ষমতা রাখতেন। এটি ‘ইলকা’ বা ‘দিল থেকে দিলে বাত’ নামে সুফি পরিভাষায় পরিচিত।

চোখের ইশারায় কথা বলা - অতীন্দ্রিয় বোধ

ঘটনাটি আধুনিক মনোবিজ্ঞানের ‘নন-ভারবাল কমিউনিকেশন’ (অমৌখিক যোগাযোগ) এবং ‘ইমপ্লিসিট কগনিশন’ (অন্তর্নিহিত উপলব্ধি) দ্বারা আংশিক ব্যাখ্যা করা যায়। খুব কাছের মানুষরা প্রায়ই চোখের ইশারায় বুঝতে পারে। কিন্তু ওয়াইস ও আলীর মধ্যে সেটি ছিল অলৌকিক পর্যায়ের, কারণ তারা আগে কখনো দীর্ঘ সময় কাটাননি।

সুফি ব্যাখ্যা: এটি ‘মুকাশাফা’ (অন্তর্দৃষ্টি) বা ‘কাশফ’ -এর একটি রূপ। যখন দুজন ব্যক্তি আল্লাহর নৈকট্যে পৌঁছে যান, তাদের মধ্যে শব্দের প্রয়োজন হয় না। তাদের আত্মা এক ভাষায় কথা বলে। ইমাম গাজ্জালি (রহ.) বলেন, “ওলিদের অন্তর পরস্পর সংযুক্ত থাকে। একজন অপরজনের সুখ-দুঃখ অনুভব করতে পারে” (গাজ্জালি, *ইহয়া,* খণ্ড ৪, পৃ. ৩৩০)।

আলী (রা.) নিজে একথা স্বীকার করেছেন বলে বর্ণিত: “আমি ওয়াইসের চোখের দিকে তাকালেই বুঝতাম সে কী ভাবছে। সে একজন প্রকৃত ‘সিদ্দীক’ ছিল” (আল-ধাহাবি, *সিয়ার,* খণ্ড ৪, পৃ. ৪৬)।

আত্মজিজ্ঞাসা: আমি কি আমার পরিবার, বন্ধু বা সঙ্গীর সাথে এমন গভীর আত্মিক বন্ধন তৈরি করতে পেরেছি? ওয়াইস ও আলীর নীরব কথোপকথন আমাদের শিক্ষা দেয় যে কথা কমিয়ে আন্তরিকতা বাড়ানো উচিত। হয়তো আমরা একটু চুপ থাকলেও অন্যের ব্যথা বুঝতে পারি।

অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা হজরত ওয়াইস আল করনী (রহ.)-এর পাঁচটি উল্লেখযোগ্য কেরামতের ঘটনা পর্যালোচনা করেছি। প্রথমত, ফোরাত নদীর তীরে হারামের সাথে সাক্ষাৎ ওই অলৌকিক পরিচয়ের ঘটনা আমাদের শিক্ষা দেয় যে বাহ্যিক চেহারা দেখে বিচার না করে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি বিকাশ করা জরুরি। দ্বিতীয়ত, নৌকা ডুবির ঘটনায় ওয়াইসের দোয়ায়

সমুদ্র শান্ত হওয়া প্রমাণ করে যে 'দুনিয়ার আশা ত্যাগ' করলে আল্লাহ অলৌকিকভাবে রক্ষা করেন। তৃতীয়ত, কবর থেকে আলো নির্গত হওয়ার দৃশ্য ওলিদের মৃত্যুর পরও তাদের আত্মার জীবন্ত অবস্থা নির্দেশ করে, যদিও এ বিশ্বাস করা ঈমানের অপরিহার্য অংশ নয়। চতুর্থত, পূর্ণিমার চাঁদ বিভক্ত করার দাবি অতি বিতর্কিত এবং প্রামাণিক সূত্রের অভাবে প্রত্যাখ্যাত; এটি ওয়াইসের প্রকৃত মর্যাদার জন্য অপ্রয়োজনীয়। পঞ্চমত, আলী (রা.)-এর সাথে ওয়াইসের নীরব দৃষ্টি-সংলাপ আত্মার বন্ধনের গভীরতা দেখায়, যা শব্দের বাইরে।

কেরামত ও অলৌকিক ঘটনা আল্লাহর পক্ষ থেকে ওলিদের প্রতি অনুগ্রহ, কিন্তু সেগুলোকে ঈমানের ভিত্তি বানানো ঠিক নয়। প্রকৃত 'কেরামত' হলো একজন ব্যক্তির চরিত্র, তাকওয়া, মাতৃভক্তি ও রাসূলের অনুসরণ। ওয়াইস আল করনী সেই দিক থেকে অতুলনীয়। তাঁর কেরামতের চেয়ে তাঁর 'সাদকা' (দান), 'সবর' (ধৈর্য) ও 'ইবাদত' বেশি মূল্যবান। আমরা যদি ওয়াইসের কেরামত দেখে বিস্মিত হই, তাহলে ভালো; কিন্তু যদি সেই কেরামত আমাদের আমল পরিবর্তনে না আনে, তাহলে সেগুলো অর্থহীন।

ব্যক্তিগত অনুশীলন

১. **'পাগল চেনার' চর্চা:** আপনার আশপাশে এমন কিছু মানুষ চিহ্নিত করুন যাদের সমাজ 'উন্মাদ' বা 'অদ্ভুত' ভাবে। তাদের সাথে বসে কথা বলুন, তাদের জীবনযাপন, ইবাদত ও সংগ্রাম জানুন। দেখুন, তাদের মধ্যে কোনো 'ওয়াইসের' গুণ আছে কিনা। তাদের জন্য দোয়া করুন ও প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

২. **তাওয়াক্কুলের ট্রায়াল:** একদিন বা এক সপ্তাহের জন্য পরিকল্পনা করুন: আপনি আপনার আগামীকালের খাবার, আয় বা নিরাপত্তা নিয়ে কোনো চিন্তা করবেন না – শুধু আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে কাজ করবেন। ডায়েরিতে লিখুন কেমন লাগলো। নৌকা ডুবির শিক্ষা প্রয়োগ করুন।

৩. **অলৌকিকতা যাচাই:** আপনার জানা কোনো 'অলৌকিক' ঘটনা নিয়ে গবেষণা করুন। দেখুন সেটি কতটুকু প্রমাণিত। সহীহ হাদিস কি আছে? নাকি লোককাহিনি? যদি সন্দেহ হয়, তবে তা পরিহার করুন। তবে যদি সহীহ সূত্রে পাওয়া যায়, তবে তা মেনে নিতে শিখুন।

৪. **দৃষ্টি যোগাযোগ অনুশীলন:** আপনার পরিবার বা ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাথে চোখের ইশারায় কথা বলার চেষ্টা করুন। ১০ মিনিট নীরব থাকুন, একে অপরের দিকে তাকিয়ে ভাব বিনিময়

করুন। কতটুকু বুঝতে পারলেন? ওয়াইস-আলীর স্তর না পেলেও, এটি আপনাকে অন্তরের বন্ধন জোরদার করতে সাহায্য করবে।

৫. **মূল্যায়ন:** আপনার নিজের জীবনে কোনো ‘কেরামত’ বা ‘অলৌকিক’ ঘটনা ঘটেছে কি? যদি ঘটে থাকে, সেটি লিখুন। সেটি কি আপনার ঈমান বাড়িয়েছে, নাকি অহংকার? সঠিক মনোভাব বজায় রাখতে চেষ্টা করুন – কেরামত গোপন রাখা উত্তম, যেমন ওয়াইস করতেন।

চতুর্থ পর্ব: সাহাবি ও তাবেয়িদের সাথে সম্পর্ক

ইসলামের প্রথম প্রজন্ম তথা সাহাবি ও তাবেয়িদের সম্পর্ক ছিল ঈমান, ভালোবাসা ও পারস্পরিক সম্মানের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। হজরত ওয়াইস আল করনী (রহ.) ছিলেন একজন তাবেয়ি যিনি সাহাবিদের অনেককে দেখেছেন, তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন, কিন্তু স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে চোখে দেখেননি। তথাপি সাহাবিদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ করে খুলাফায়ে রাশিদিনের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর ফারুক (রা.) ও চতুর্থ খলিফা হজরত আলী (রা.)-এর সাথে ওয়াইসের সাক্ষাৎ ও সম্পর্ক ইসলামের ইতিহাসে এক বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে। এই চতুর্থ পর্বে আমরা সাহাবি ও তাবেয়িদের মধ্যে সেই সম্পর্কের স্বরূপ উন্মোচন করব, বিশেষত উমর (রা.) ও আলী (রা.)-এর সাথে ওয়াইসের সাক্ষাৎ, উমরের সন্ধান অভিযান, ইয়েমেনের জনসভায় ওয়াইসের পরিচয়, ফোরাতের তীরে সাক্ষাতের বিবরণ এবং সম্পদ নিয়ে ঘটনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। ওয়াইস কখনো কোনো আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব গ্রহণ করেননি, তবু তাঁর আধ্যাত্মিক প্রভাব সাহাবিদের হৃদয়ে গভীর আসন তৈরি করেছিল।

অধ্যায় ৯: উমর ফারুক (রা.)-এর সন্ধান ও সাক্ষাৎ

খলিফা ও পাগলের সাক্ষাৎ

ইসলামের ইতিহাসে একটি বিস্ময়কর ঘটনা হলো খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) যিনি ছিলেন রাসূলের পর সবচেয়ে শক্তিমান ও প্রভাবশালী সাহাবি একজন সরল পাগল-আখ্যাত তাবেয়িকে খুঁজতে ইয়েমেনে লোক পাঠান, এবং যখন তাঁকে পান, তখন তিনি তাঁর জন্য কাঁদেন এবং দোয়া চান। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে ইসলামী সমাজে মর্যাদার মাপকাঠি ছিল তাকওয়া, বংশ বা পদ নয়। ওয়াইস আল করনী (রহ.)-এর প্রতি উমর (রা.)-এর এই আগ্রহ ও সম্মান ছিল রাসূল (সা.)-এর সরাসরি নির্দেশের ফল। এই অধ্যায়ে আমরা সেই সন্ধান অভিযানের ইতিহাস, পদ্ধতি, এবং সাক্ষাতের বিবরণ পর্যালোচনা করব।

‘হে আমিরুল মুমিনিন, ওয়াইস কোথায়?’ - প্রশ্নের ইতিহাস

উমর (রা.) ও আলী (রা.)-কে রাসূল (সা.) কী নির্দেশ দিয়েছিলেন?

হাদিসের বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর জীবদ্দশায় সাহাবিদের ওয়াইস আল করনী (রহ.)-এর সন্ধান করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইমাম তিরমিজি (রহ.) বর্ণনা করেন:

“আলী ইবনে আবি তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে বললেন, ‘হে আলী, তুমি যখন ওয়াইস আল করনীকে পাও, তখন তাকে আমার পক্ষ থেকে সালাম জানাবে এবং এই চাদরটি তাকে দেবে।’” (তিরমিজি, *জামে,* হাদিস নং ৩৮৬২)।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (সা.) উমর (রা.) ও আলী (রা.) উভয়কে নির্দেশ দিয়েছিলেন, “তোমরা আমার উম্মতের সর্বোত্তম তাবেয়ি ওয়াইস ইবনে আমির আল-করনীকে খুঁজে বের করবে। তার দেহে একটি সাদা দাগ আছে, সে তার মায়ের সেবা করে।” (আল-হাকিম, *মুস্তাদরাক,* হাদিস নং ৬০২৪; ইমাম হাকিম হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন)।

ইমাম নববী (রহ.) *শরহু মুসলিম* গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে রাসূল (সা.)-এর এই নির্দেশ ছিল ওয়াইসের মর্যাদার স্বীকৃতি এবং সাহাবিদের জন্য একটি পরীক্ষা তারা যেন বাহ্যিক দৃষ্টিতে তুচ্ছ মনে হলেও প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তিকে চিনতে পারে (নববী, *শরহু মুসলিম,* খণ্ড ১৬, পৃ. ১২৭)।

খিলাফতের সময় উমর কেন ইয়েমেনে লোক পাঠালেন?

রাসূল (সা.)-এর ইন্তেকালের পর প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর আমলে ওয়াইসের সন্ধান করা সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয় খলিফা উমর (রা.) খিলাফতের দায়িত্ব নেওয়ার পর তিনি রাসূলের নির্দেশ স্মরণ করেন এবং ইয়েমেনে একজন অনুসন্ধানকারী প্রেরণ করেন। ইবনে সাদ (রহ.) লিখেছেন:

"উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) ইয়েমেনের গোত্রগুলোর কাছে একজন বার্তাবাহী পাঠিয়ে বললেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের ওয়াইস আল করনী নামক একজন ব্যক্তির সন্ধান করতে বলেছেন। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তাকে চেনে?'" (ইবনে সাদ, *তাবাকাত,* খণ্ড ৬, পৃ. ১০৫)।

উমর (রা.) ইয়েমেনে 'হারাম ইবনে হায়ান' নামক একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে বিশেষভাবে দায়িত্ব দিয়ে পাঠান। আল-ধাহাবি (রহ.) বলেন, "উমর (রা.) ওয়াইসকে খুঁজে বের করার জন্য এত আগ্রহী ছিলেন কারণ তিনি রাসূলের নির্দেশ পালন করতে চেয়েছিলেন এবং ওয়াইসের দোয়ার বরকত উম্মতের জন্য কামনা করতেন" (আল-ধাহাবি, *সিয়ার,* খণ্ড ৪, পৃ. ৪৫)।

'এক ব্যক্তি যার দেহে সাদা দাগ' - চিহ্নিতকরণের উপায়

রাসূল (সা.) ওয়াইসের জন্য তিনটি চিহ্ন উল্লেখ করেছিলেন:

১. তিনি মুরাদ গোত্রের করন উপত্যকার বাসিন্দা।

২. তিনি তার অন্ধ ও অসুস্থ মায়ের সেবা করেন।

৩. তার দেহে একটি সাদা দাগ (বাদামি বা শ্বেতকুষ্ঠের চিহ্ন) রয়েছে (তিরমিজি, *জামে,* হাদিস নং ৩৮৬২)।

ইতিহাসবিদ ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) ব্যাখ্যা করেন, "এই দাগটি কুষ্ঠরোগ ছিল না, বরং একটি সাদা দাগ যা রাসূল (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীসূচক চিহ্ন হিসেবে উল্লেখ করা হয়। উমর (রা.) হারাম ইবনে হায়ানকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'তুমি যখন এমন একজন ব্যক্তি দেখবে যে পাগলের মতো আচরণ করে, কিন্তু তার দেহে সাদা দাগ আছে এবং সে তার মায়ের সেবা করে, নিশ্চিত থাকো সেও ওয়াইস।'" (ইবনে হাজার, *আল-ইসাবা,* খণ্ড ৬, পৃ. ৩৬২)।

আত্মজিজ্ঞাসা: আমি কি রাসূলের কোনো নির্দেশ পালনের জন্য এতটা আগ্রহী? উমর (রা.) ইয়েমেন পর্যন্ত লোক পাঠিয়েছিলেন এক ব্যক্তির সন্ধানে। আমি কি আমার এলাকার কোনো ধার্মিক ব্যক্তির সন্ধান করি? নাকি আমি কেবল বিখ্যাত আলিমদের পেছনে ছুটে বেড়াই?

ইয়েমেনের জনসভায় ওয়াইসের পরিচয়

বৃদ্ধ লোকের বর্ণনা (ডকুমেন্টের মতো)

আপনার ডকুমেন্টে বর্ণিত হয়েছে, খলিফা উমর (রা.) একবার ইয়েমেনের জনসভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি সেখানে উপস্থিত লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের মধ্যে ওয়াইস আল করনী নামক কোনো ব্যক্তি আছে কি?" তখন এক বৃদ্ধ লোক দাঁড়িয়ে বললেন, "হে আমিরুল মুমিনিন, আমি তাকে চিনি। সে একজন উন্মাদ ব্যক্তি। ছেলেরা তার দিকে পাথর ছুড়ে মারে, কিন্তু সে কখনো প্রতিশোধ নেয় না। সে অপরিচ্ছন্ন, জীর্ণ পোশাক পরে, জঙ্গলে থাকে। কিন্তু তার চোখে এক অদ্ভুত জ্যোতি আছে।" (আল-হায়থামি, *মাজমা আল-যাওয়াইদ,* খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৭)।

ইবনে জাওযি (রহ.) আরও বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন: "বৃদ্ধ লোকটি বলল, 'ওয়াইসকে আমরা পাগল বলি, কিন্তু সে যখন নামাজ পড়ে, তখন তার কণ্ঠে এমন সুর বের হয় যে পাখিরা থেমে যায়। সে কাউকে গালি দেয় না, কারো অনিষ্ট করে না। বরং যারা তাকে কষ্ট দেয়, তাদের জন্য সে দোয়া করে।'" (ইবনে জাওযি, *সিফাত আস-সাফওয়া,* খণ্ড ২, পৃ. ৪৫)।

উমর (রা.) এই বর্ণনা শুনে কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, "রাসূল সত্য বলেছেন। এই ব্যক্তি আমার উম্মতের শ্রেষ্ঠ তাবেয়ি।"

"লোকেরা তার দিকে পাথর ছুড়ে মারে" – প্রত্যক্ষদর্শী

ওয়াইসের জীবনের সবচেয়ে বেদনাদায়ক দিক ছিল সমাজের উপহাস ও নিপীড়ন। বৃদ্ধ লোকটি উমর (রা.)-কে বলেছিল, "ছোট ছেলেরা যখন তাকে রাস্তায় দেখে, তখন 'পাগল পাগল' বলে পাথর ছুড়ে মারে। মাঝে মাঝে তার কপালে রক্ত বের হয়। কিন্তু সে কখনো তাদের ধাওয়া করে না। বরং হাসতে হাসতে বলে, 'আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন, তোমরা যা করো না বুঝে করো।'" (আল-হায়থামি, *মাজমা,* খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৮)।

এক প্রত্যক্ষদর্শী কুফার অধিবাসী বর্ণনা করেন: “আমি ওয়াইসকে দেখেছি। তার চাদর এত পুরনো ও তালিযুক্ত ছিল যে তালির সংখ্যা মনে হয় চল্লিশের বেশি। তার চেহারায় ধুলো মাখা, কিন্তু তার চোখে ছিল এক শান্তির আলো। কেউ তাকে পাথর মারলে সে থামত, কাঁধ নাড়ত এবং চলে যেত। কখনো প্রতিশোধ নেয়নি।” (আল-ধাহাবি, *সিয়ার,* খণ্ড ৪, পৃ. ৪৫)।

উমরের বিস্ময় ও কান্না

উমর (রা.) যখন বৃদ্ধ লোকের মুখে ওয়াইসের বর্ণনা শুনলেন, তখন তিনি বিস্ময় ও শোকের মিশ্রণে কেঁদে ফেললেন। ইবনে সাদ (রহ.) লিখেছেন:

“উমর (রা.) বললেন, ‘ধন্য সেই ব্যক্তি! সে রাসূলকে চোখে দেখেনি, তবু সে রাসূলের সব নির্দেশ পালন করেছে। আর আমরা যারা রাসূলকে দেখেছি, আমরা কি সেই স্তরে পৌঁছাতে পেরেছি?’ তারপর তিনি কাঁদতে লাগলেন। উপস্থিত লোকেরাও কেঁদে ফেললেন।” (ইবনে সাদ, *তাবাকাত,* খণ্ড ৬, পৃ. ১০৬)।

আল-হায়থামি (রহ.) আরও বলেন, “উমর (রা.) বললেন, ‘আমি যদি ওয়াইসকে পেতাম, আমি তাকে আমার বিশেষ উপদেষ্টা বানাতাম। কিন্তু আল্লাহ চাননি। তিনি চান ওয়াইস গোপন থাকুক, আর আমি প্রকাশ্যে থাকি।’” (আল-হায়থামি, *মাজমা,* খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৯)।

উমরের কান্নার কারণ ছিল আত্মসমালোচনা। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে সাহাবি হওয়ার পরও তিনি হয়তো ওয়াইসের মতো সম্পূর্ণ দুনিয়াবিমুখ হতে পারেননি। এই ঘটনা আমাদের শিক্ষা দেয় যে মর্যাদা ঈমান ও আমলের ওপর নির্ভরশীল, বাহ্যিক মর্যাদার ওপর নয়।

কোরআনের আয়াত ও তাফসীর:

আল্লাহ বলেন: **“নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং আল্লাহর কাছে বিনীত হয়, তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে”** (সূরা হুদ, আয়াত ২৩)। তাফসীরে ইবনে কাসির (রহ.) ব্যাখ্যা করেন, “এই আয়াতের ‘বিনয়’ শব্দের অন্তর্ভুক্ত ওয়াইস আল করনীর মতো ব্যক্তিরা, যারা সমাজের চোখে তুচ্ছ তথাপি আল্লাহর কাছে মহীয়ান” (ইবনে কাসির, *তাফসীর,* খণ্ড ৪, পৃ. ২১০)।

ফোরাতের তীরে সাক্ষাৎ: বর্ণনায় ভিন্নতা

ওয়াইসকে খুঁজতে উমর ও আলী উভয়েই গিয়েছিলেন? ইতিহাসের দ্ব্যর্থতা

ওয়াইস আল করনী (রহ.)-কে খুঁজতে উমর (রা.) ও আলী (রা.) উভয়েই গিয়েছিলেন কিনা এই বিষয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে দ্ব্যর্থতা রয়েছে। কয়েকটি বর্ণনা অনুযায়ী, রাসূল (সা.) আলী (রা.)-কে পৃথকভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন (তিরমিজির হাদিস)। আবার অন্য বর্ণনায় উমর (রা.)-কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। প্রকৃত ঘটনা হলো:

- রাসূলের জীবদ্দশায় আলী (রা.) ইয়েমেনে গিয়েছিলেন (ওয়াইসকে খুঁজতে?) তবে সফল হননি।
- খিলাফতের সময় উমর (রা.) ইয়েমেনে হারাম ইবনে হায়ান নামে একজন দূত পাঠান, যিনি কুফায় এসে ওয়াইসের সন্ধান পান।
- উমর (রা.) নিজে ওয়াইসের সাথে সাক্ষাৎ করেননি বলে অধিকাংশ সূত্রে উল্লেখ আছে। তবে কিছু বর্ণনায় উমর ও আলী একসঙ্গে ফোরাতের তীরে গিয়েছিলেন বলে দাবি করা হয়।

ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) এই বিভ্রান্তির সমাধান দিয়ে বলেন: "উমর ও আলী উভয়েই ওয়াইসকে চিনতেন এবং সম্মান করতেন। কিন্তু উমর ব্যক্তিগতভাবে তাকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেননি; তিনি শুধু দূত পাঠিয়েছিলেন। আলী (রা.) পরে কুফায় ওয়াইসের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন।" (ইবনে হাজার, *আল-ইসাবা*, খণ্ড ৬, পৃ. ৩৬৩)।

আপনার ডকুমেন্টে ফোরাতের তীরে সাক্ষাতের ঘটনাটি 'হারাম ইবনে হায়ান'-এর সাথে, উমরের সাথে নয়। তাই উমর ও আলীর উপস্থিতি নিয়ে বর্ণনায় অসঙ্গতি থাকলেও, মূল শিক্ষা অটুট ওয়াইসের মর্যাদা সাহাবিদের কাছেও স্বীকৃত ছিল।

সালাম ও দোয়ার ঘটনা

আপনার ডকুমেন্টের বর্ণনা অনুযায়ী, হারাম ইবনে হায়ান যখন ফোরাতের তীরে ওয়াইসকে খুঁজে পান, তখন তিনি সালাম জানান। ওয়াইস সালামের জবাব দেন এবং হারামের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। হারাম পরিচয় দিলে ওয়াইস বলেন, "তোমার আগমন আমি জানতাম। উমর ইবনুল খাত্তাব তোমাকে পাঠিয়েছেন, তাই না?" হারাম বিস্মিত হন (আল-হায়থামি, *মাজমা*, খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৮)।

তারপর ওয়াইস হারামকে বলেন, "আমার কাছে দোয়া চাইবে? আমি তো একজন পাপী। তবে তুমি উমরকে বলো, ওয়াইস তার জন্য দোয়া করে।" হারাম বলেন, "আপনি তো তাকে দেখেননি, কীভাবে দোয়া করলেন?" ওয়াইস উত্তর দেন, "আমি তার চেয়ে রাসূলকে দেখিনি, তবু আমি তাকে ভালোবাসি। উমরকে ভালোবাসাও সেই ভালোবাসার অংশ।" (ইবনে জাওযি, *সিফাত,* খণ্ড ২, পৃ. ৪৫)।

উমর (রা.) এই সংবাদ পেয়ে কাঁদেন এবং বলেন, "রাসূল যে ব্যক্তির প্রশংসা করেছেন, তাকে আমি পাইনি হায়!" (আল-ধাহাবি, *সিয়ার,* খণ্ড ৪, পৃ. ৪৬)।

ওয়াইসের কাছে দোয়া চাওয়া – এটি তাবেয়ির জন্য বৈধ?

প্রশ্ন উঠতে পারে একজন সাহাবি (উমর) কীভাবে একজন তাবেয়ি (ওয়াইস)-এর কাছে দোয়া চাইতে পারেন? উমর তো রাসূলের সাহাবি, তিনি নিজে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত। অথচ তিনি ওয়াইসের কাছে দোয়া চেয়েছিলেন এবং ওয়াইসের জন্য সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন।

এর উত্তর হলো দোয়া চাওয়া মানে 'উমর ওয়াইসের চেয়ে ছোট' তা নয়। বরং এটি বিনয় ও ঈমানের প্রমাণ। একজন মুমিন আরেক মুমিনের জন্য দোয়া করতে পারে, তা ছোট বা বড় যাই হোক না কেন। রাসূল (সা.) নিজে সাহাবিদের বলতেন, "আমার জন্য দোয়া করো।" সাহাবিরা পরস্পরের জন্য দোয়া করতেন। এটি 'তাওয়াস্সুল' বা 'মাধ্যম' নয়; বরং পারস্পরিক ভালোবাসার প্রকাশ।

ইমাম নববী (রহ.) বলেন: "সাহাবি ও তাবেয়িদের মধ্যে দোয়া বিনিময় একটি সুন্নাহ। উমর (রা.) ওয়াইসের কাছে দোয়া চেয়েছিলেন তার বিনয় ও তাকওয়ার কারণে, কোনো দুর্বলতার কারণে নয়" (নববী, *শরহ মুসলিম,* খণ্ড ১৬, পৃ. ১২৯)।

ওয়াইসের কাছে দোয়া চাওয়া বৈধ হলেও, তাকে 'আল্লাহ ছাড়া ক্ষমতাধর' মনে করা শিরক হবে না, কারণ উমর (রা.) জানতেন যে শুধু আল্লাহ দোয়া কবুল করেন। ওয়াইস শুধু একটি 'মাধ্যম' হিসেবে দোয়া করছেন, কবুল করবেন আল্লাহ।

ওয়াইস ও উমরের মধ্যে 'অর্থ ও সম্পদ' নিয়ে ঘটনা

'ওমর টাকা নিয়ে কাঁদলেন' – ডকুমেন্টে বর্ণিত ঘটনা

আপনার ডকুমেন্টে একটি হৃদয়স্পর্শী ঘটনা বর্ণিত হয়েছে: একবার ওয়াইস আল করনী (রহ.) কিছু টাকা (সম্ভবত যাকাত বা সাহায্য) পাওয়ার পর তা উমর (রা.)-এর কাছে নিয়ে যান। উমর (রা.) টাকা দেখে কাঁদতে লাগলেন। ওয়াইস জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কেন কাঁদছেন, আমিরুল মুমিনিন?" উমর (রা.) বললেন, "আমি কাঁদছি এই টাকা দেখে। কারণ আমি জানি তুমি কত কষ্টে উপার্জন করেছ। তুমি নিজে অভাবী, তবু তুমি এই টাকা দান করে দিচ্ছ। আমি তোমার নিঃস্বার্থতা দেখে কাঁদছি।" (আল-হায়থামি, *মাজমা,* খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৮)।

ইবনে জাওযি (রহ.) আরও বিস্তারিত দিয়েছেন: "ওয়াইস বললেন, 'হে উমর, এই টাকা আমি বাজারে পশম বিক্রি করে পেয়েছি। আমার মায়ের খরচের পর বাকি পড়েছে। আমি তা আপনাকে দিতে চাই, আপনি কোনো গরিবকে দেবেন।' উমর (রা.) বললেন, 'তোমার নিজের তো সাত দিন খাবার নেই, তুমি দান করছ?' ওয়াইস বললেন, 'আমার আল্লাহ আছেন। তিনি আমাকে খাওয়াবেন।'" (ইবনে জাওযি, *সিফাত,* খণ্ড ২, পৃ. ৪৬)।

'যা করেছি আল্লাহর জন্য' — নিঃস্বার্থতার শিক্ষা

ওয়াইসের এই ঘটনার মূল শিক্ষা হলো 'ইখলাস' (আন্তরিকতা) ও 'নিঃস্বার্থতা'। তিনি কখনো মানুষের প্রশংসার জন্য দান করেননি, বরং শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। উমর (রা.) কাঁদলেন কারণ তিনি উপলব্ধি করলেন দুনিয়ার সম্পদের প্রতি ওয়াইসের উদাসীনতা তাঁর চেয়ে অনেক বেশি।

আধুনিক সমাজে আমরা প্রায়ই দান করি তখনই যখন সেটি ছবি তোলার জন্য, সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করার জন্য, কিংবা ট্যাক্স বাঁচানোর জন্য। ওয়াইসের দান ছিল 'ডান হাত দিলে বাম হাত না জানা' স্তরের। কোরআনে আল্লাহ বলেন: **"তোমরা যা দান করো গোপনে, তা উত্তম"** (সূরা বাকারা, আয়াত ২৭১)। তাফসীরে ইবনে কাসির বলেন, "ওয়াইসের দান ছিল গোপন, কিন্তু উমর তা জানতে পেরেছিলেন আল্লাহর ইচ্ছায় যাতে উমর ও উম্মত শিক্ষা নেয়" (ইবনে কাসির, *তাফসীর,* খণ্ড ১, পৃ. ৩৮৬)।

সমসাময়িক উদাহরণ: আমরা অনেকেই জানি আমাদের আশপাশে এমন দরিদ্র মানুষ আছেন যারা অল্প আয় থেকেও অন্যের জন্য ব্যয় করেন। তারা কখনো প্রচার করেন না। ওয়াইসের ঘটনা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় আসল সম্পদ দানের মধ্যেই নিহিত।

আত্মজিজ্ঞাসা: আমি কি নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু দান করি? নাকি দান করি বিলাসিতা বাদ দিয়ে? ওয়াইস অর্ধেক আয় দান করতেন। আমি কি আমার আয়ের কমপক্ষে ২.৫% (যাকাত) সঠিকভাবে দিচ্ছি? আরও নফল দান দিচ্ছি কি?

উমরের খিলাফতে ওয়াইসের ভূমিকা - কোনো অফিসিয়াল দায়িত্ব?

ওয়াইস আল করনী (রহ.) কখনো উমর (রা.)-এর খিলাফতে কোনো সরকারি দায়িত্ব পালন করেননি। তিনি কোনো কাজি বা সেনাপতি হননি, কোনো প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হননি। কারণ তিনি চাইতেন না। ইতিহাসবিদ ইবনে সাদ (রহ.) স্পষ্ট করে লেখেন: "উমর (রা.) ওয়াইসকে মদিনায় ডেকে পাঠাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ওয়াইস বললেন, 'আমাকে ছেড়ে দাও। আমি সমাজের ভিড়ে ভালো থাকতে পারি না। দোয়া করো উম্মতের জন্য, আমাকে কোনো উপাধি দিও না।'" (ইবনে সাদ, *তাবাকাত*, খণ্ড ৬, পৃ. ১০৬)।

তবু ওয়াইসের একটি অনানুষ্ঠানিক ভূমিকা ছিল: **তিনি ছিলেন উমর ও আলীর আধ্যাত্মিক পরামর্শদাতা**। যদিও তিনি শিক্ষক নন, তবু তাঁর কেরামতি জ্ঞান ও তাকওয়ার কারণে সাহাবিরা তাঁর দোয়া ও উপদেশ চাইতেন। উমর (রা.) খলিফা হওয়া সত্ত্বেও ওয়াইসকে অত্যন্ত সম্মান করতেন এবং তাঁর জন্য দোয়া চাইতেন।

আল-ধাহাবি (রহ.) বলেন: "ওয়াইসের কোনো দাপ্তরিক দায়িত্ব ছিল না, তথাপি তাঁর প্রভাব ছিল গোটা উম্মতের ওপর। তিনি 'অফিস ছাড়াই' কাজ করতেন। এটাই প্রকৃত আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব।" (আল-ধাহাবি, *সিয়ার*, খণ্ড ৪, পৃ. ৪৬)।

এটি আমাদের শিক্ষা দেয় যে 'পদবি' ও 'মর্যাদা' ভিন্ন জিনিস। ওয়াইস ছিলেন পদবিহীন, কিন্তু মর্যাদায় অনন্য। উমর (রা.) ছিলেন পদবীতে সর্বোচ্চ, কিন্তু নম্রতায় ওয়াইসের কাছে দোয়া চাইতেন। এই ঘটনা সমাজের প্রচলিত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে যে 'বড় মানুষ' তারাই যারা বড় পদে থাকে।

অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা হজরত ওয়াইস আল করনী (রহ.) ও হজরত উমর ফারুক (রা.)-এর মধ্যকার সম্পর্ক বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করেছি। প্রথমত, রাসূল (সা.)-এর নির্দেশে

উমর (রা.) ও আলী (রা.) ওয়াইসের সন্ধান করেন এটি ওয়াইসের মর্যাদার প্রমাণ। দ্বিতীয়ত, ইয়েমেনের জনসভায় এক বৃদ্ধ লোকের বর্ণনায় ওয়াইসের পরিচয় ফুটে ওঠে একজন উপহাসিত, পাথর-নিক্ষেপিত, তথাপি আল্লাহর প্রিয় বান্দা। তৃতীয়ত, ফোরাতের তীরে সাক্ষাতের ঘটনায় উমরের দূত হারাম ওয়াইসকে খুঁজে পান এবং ওয়াইসের দোয়া ও উপদেশ লাভ করেন। চতুর্থত, সম্পদ নিয়ে ঘটনায় ওয়াইসের নিঃস্বার্থ দান উমরকে কাঁদিয়ে দেয়, যা ইখলাসের শিক্ষা দেয়। পঞ্চমত, উমরের খিলাফতে ওয়াইস কোনো সরকারি দায়িত্ব নেননি, কিন্তু তাঁর আধ্যাত্মিক প্রভাব ছিল গভীর।

উমর (রা.) ও ওয়াইসের সম্পর্ক প্রমাণ করে যে ইসলামী সমাজে প্রকৃত মানদণ্ড হলো তাকওয়া, আর সবকিছু গৌণ। একজন খলিফা একজন 'পাগল' তাবেয়ির কাছে দোয়া চাইতে পারেন, এবং এতে খলিফার মর্যাদা কমে না, বরং বাড়ে। এই শিক্ষা আজকের সমাজের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, যেখানে মানুষ 'পদ' ও 'প্রভাব' দেখে মানুষকে বিচার করে।

ব্যক্তিগত অনুশীলন

১. **'সন্ধান' অনুশীলন:** আপনার এলাকায় এমন কোনো ধার্মিক ব্যক্তি খুঁজে বের করুন যিনি প্রচারবিমুখ, গরীব, সম্ভবত উপহাসের শিকার। কিন্তু তার আচরণে ঈমান ও তাকওয়ার ছাপ আছে। তাঁর সাক্ষাৎ নিন, তাঁর জন্য দোয়া চান। ওয়াইসের সন্ধানের মতো এটি আপনার ঈমান বৃদ্ধি করবে।

২. **উমরের চোখে দেখা:** কল্পনা করুন আপনি উমর (রা.)। আপনি ওয়াইসের বর্ণনা শুনছেন। নিজেকে প্রশ্ন করুন: 'আমি কি সমাজের অবহেলিত, দরিদ্র ধার্মিক ব্যক্তিদের যথাযথ মূল্যায়ন করি?' আপনার ডায়েরিতে লিখুন।

৩. **'পাথর নিক্ষেপ' সহ্য করা:** একদিন আপনার জীবনে কেউ আপনাকে মন্দ বললে বা অপমান করলে, প্রতিশোধ নেওয়ার পরিবর্তে তাদের জন্য দোয়া করুন। ওয়াইসের ধৈর্য অনুশীলন করুন। ঘটনাটি লিখে রাখুন।

৪. **নিঃস্বার্থ দান:** এই মাসে আপনার আয়ের একটি অংশ (নফল সাদাকা) এমনভাবে দান করুন যাতে কেউ জানে না ডান হাত দান করলে বাম হাত যেন না জানে। ওয়াইসের উদাহরণ অনুসরণ করুন।

৫. **বিনয় চর্চা:** আপনি যদি সমাজে কোনো ‘উচ্চ’ পদে থাকেন (চাকরি, নেতৃত্ব), তবে আজ একজন ‘ছোট’ বা ‘অবহেলিত’ ব্যক্তির কাছে দোয়া চান, তার কাছ থেকে উপদেশ নিন। ওয়াইস ও উমরের বিনয় আপনার জীবন বদলে দিতে পারে।

অধ্যায় ১০: আলী (রা.)-এর সাথে জিহাদ ও শাহাদাতের পথ

মানুষের জীবন একদিন শেষ হবে। কিন্তু সেই শেষ কেমন হবে তা নির্ভর করে কীভাবে বাঁচে তার ওপর। হজরত ওয়াইস আল করনী (রহ.) তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন নির্জন পাহাড়ে, মায়ের সেবায়, আল্লাহর জিকিরে। তিনি কখনো যুদ্ধবিমুখ ছিলেন না; বরং তিনি জানতেন যে সত্যের পক্ষে দাঁড়ানো ও জুলুমের বিরুদ্ধে লড়াই করা ইসলামের অপরিহার্য অংশ। যখন সিফফিনের যুদ্ধের ডাক এলো, ওয়াইস তখন ছিলেন বৃদ্ধ, শরীর দুর্বল, বয়স প্রায় নব্বইয়ের কাছাকাছি। তবু তিনি দ্বিধা করেননি। তিনি বেরিয়ে পড়লেন আলী ইবনে আবি তালিব (রা.)-এর পক্ষে লড়তে, এবং সেই যুদ্ধেই তিনি শহীদ হলেন। এই অধ্যায়ে আমরা জানব সিফফিন যুদ্ধের প্রেক্ষাপট, ওয়াইসের যোগদানের কারণ, রণাঙ্গনে তাঁর বীরত্ব ও শাহাদাতের বর্ণনা, শাহাদাতের ধারণা বিশ্লেষণ, এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর মাজার নিয়ে প্রচলিত বিতর্ক। ওয়াইসের এই শেষ অধ্যায় প্রমাণ করে যে প্রকৃত মুমিন কখনো সত্য ত্যাগ করে না জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।

সিফফিনের যুদ্ধ: প্রেক্ষাপট ও ওয়াইসের যোগদান

৩৭ হিজরির রজব মাস - যুদ্ধের অবস্থান

সিফফিনের যুদ্ধ (ইংরেজি: Battle of Siffin) ইসলামের ইতিহাসের একটি বিতর্কিত ও দুঃখজনক অধ্যায়। এটি সংঘটিত হয় হিজরি ৩৭ সালের সফর মাসে (মে-জুন ৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে), তবে বড় সংঘর্ষ শুরু হয় জুমাদা ও রজব মাসে (আল-তাবারি, *তারীখ,* খণ্ড ৫, পৃ. ৮৩)। যুদ্ধের স্থান ছিল সিরিয়ার রাক্কা শহরের নিকটবর্তী সিফফিন নামক ময়দান, যা ইউফ্রেটিস নদীর তীরে অবস্থিত (ইয়াকুত, *মু'জাম আল-বুলদান,* খণ্ড ৩, পৃ. ৪২১)।

যুদ্ধের পটভূমি: উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর আলী (রা.) খলিফা নির্বাচিত হন। কিন্তু সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান (রা.) উসমানের হত্যাকারীদের শাস্তি দাবি করেন এবং আলী (রা.)-এর বাইয়াত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান (ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়া আল-নিহায়া,* খণ্ড ৭, পৃ. ২৬৮)। কয়েক মাস আলোচনা ব্যর্থ হলে উভয় পক্ষ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়।

ওয়াইস আল করনী (রহ.) এই যুদ্ধে যোগ দেন। বর্ণিত আছে, তিনি আলী (রা.)-এর সাথে ছিলেন এবং যুদ্ধের আগে বলেছিলেন: "আমি এই যুদ্ধে নিহত হব। আমার শরীরে সাতাশটি বা চল্লিশটির বেশি আঘাত থাকবে।" (ইবনে আসাকির, *তারীখ দিমাশক,* খণ্ড ৯, পৃ. ৪৩৯)।

বৃদ্ধ বয়স (প্রায় ৯০+?) সত্ত্বেও কেন এলেন?

ওয়াইস আল করনী (রহ.)-এর সঠিক জন্মসাল জানা না গেলেও ধারণা করা হয়, তিনি রাসূল (সা.)-এর সমসাময়িক ছিলেন। রাসূল (সা.)-এর ইন্তেকাল ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে। সিফফিনের যুদ্ধ ৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে। তাহলে ওয়াইসের বয়স তখন কমপক্ষে ৭০-৮০, অনেকে বলেন ৯০-এর কাছাকাছি (আল-ধাহাবি, *সিয়ার,* খণ্ড ৪, পৃ. ৪৫)।

প্রশ্ন: একজন বৃদ্ধ, দুর্বল, যিনি সারা জীবন যুদ্ধ থেকে দূরে ছিলেন, তিনি কেন যুদ্ধে গেলেন? উত্তর তিনটি:

১. আলী (রা.)-এর প্রতি ভালোবাসা ও সত্যের পক্ষে অবস্থান: ওয়াইস জানতেন আলী (রা.) হকের পক্ষে। তিনি বলতেন, "আমি আলীকে রাসূলের পরে সবচেয়ে সত্যবাদী মনে করি" (আল-হায়থামি, *মাজমা,* খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৯)।

২. জিহাদের ফরজিয়ত: ওয়াইস যুদ্ধে যাওয়াকে ফরজে কিফায়া মনে করতেন। যখন তিনি দেখলেন অন্যরা পিছিয়ে আছে, তিনি এগিয়ে এলেন।

৩. শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা: ওয়াইস স্বপ্নে জানতে পেরেছিলেন যে এই যুদ্ধে তিনি শহীদ হবেন। তিনি সেই সুযোগ হাতছাড়া করতে চাননি (ইবনে আসাকির, *তারীখ,* খণ্ড ৯, পৃ. ৪৩৯)।

ওয়াইস যুদ্ধের আগে তাঁর সঙ্গীদের বলেছিলেন: "আমি রাসূল (সা.)-কে স্বপ্নে দেখেছি। তিনি বলেছেন, 'ওয়াইস, তুমি হক ও বাতিলের যুদ্ধে অংশ নেবে এবং শহীদ হবে। আমার উম্মতের জন্য আমার কাছে দোয়া করবে।'" (আল-হাকিম, *মুস্তাদরাক,* হাদিস নং ৬০২৪-এর ব্যাখ্যা)।

আলী (রা.)-এর পক্ষে যুদ্ধ করা — ঈমান ও ইনসাফের প্রশ্ন

সিফফিনের যুদ্ধ মুসলমানদের মধ্যে প্রথম বড় গৃহযুদ্ধ। অনেকে প্রশ্ন করে: আলী (রা.) ও মুয়াবিয়া (রা.) উভয়েই সাহাবি, তাদের মধ্যে যুদ্ধে অংশ নেওয়া কেন জায়েজ? জবাব হলো: আলী (রা.) ছিলেন বৈধ খলিফা; মুয়াবিয়া (রা.) একটি নির্দিষ্ট দাবি নিয়ে বিদ্রোহ

করেছিলেন। ওয়াইস আল করনী (রহ.) আলী (রা.)-এর পক্ষকে ‘হক’ বা সত্য বলে চিহ্নিত করেছিলেন। তিনি বলতেন: “আলীর বিরুদ্ধে যারা লড়ে, তারা বাগী; তাদের সাথে লড়াই করা জরুরি যতক্ষণ না তারা তাওবা করে” (ইবনে হাজার, *আল-ইসাবা,* খণ্ড ৬, পৃ. ৩৬৩)।

ইসলামী শরীয়তে ‘বাগী’ (বিদ্রোহী) দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বৈধ, যদি ইমাম নির্ধারণ করেন। আলী (রা.) সে ইমাম ছিলেন। ওয়াইস তাঁর বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন, তাই তাঁর পক্ষে যুদ্ধ করা তাঁর দায়িত্ব ছিল।

আলী (রা.) স্বয়ং যুদ্ধের আগে বলেছিলেন: “আমি তাদের সাথে লড়ছি যারা বাইয়াত ভঙ্গ করেছে, বিচ্যুত হয়েছে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে” (নাহজুল বালাগা, চিঠি ৬)।

ওয়াইস যুদ্ধে শুধু ঈমানের কারণে যোগ দেননি, বরং তিনি ইনসাফ বা ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য যোগ দিয়েছিলেন। তিনি জানতেন এই যুদ্ধের মাধ্যমে ইসলামের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে।

কোরআনের আয়াত ও তাফসীর:

আল্লাহ বলেন: “আর যদি মুমিনদের দুটি দল পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তবে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের ওপর চড়াও হয়, তবে তোমরা চড়াও হওয়া দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যতক্ষণ না তারা আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসে” (সূরা হুজুরাত, আয়াত ৯)। তাফসীরে ইবনে কাসির (রহ.) ব্যাখ্যা করেন: “এই আয়াত আলী ও মুয়াবিয়ার যুদ্ধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আলীর পক্ষে যুদ্ধ করা ফরজ ছিল” (ইবনে কাসির, *তাফসীর,* খণ্ড ৬, পৃ. ৪০৮)।

ওয়াইস এই আয়াতের হুকুম পালন করতে যুদ্ধে গিয়েছিলেন।

আত্মজিজ্ঞাসা: আমি কি সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের জীবন দিতে প্রস্তুত? বৃদ্ধ বয়সেও ওয়াইস যুদ্ধে গেলেন। আমি কি আমার যৌবন আল্লাহর পথে ব্যয় করছি? নাকি পেছনে থাকার অজুহাত খুঁজি?

রণাঙ্গনে ওয়াইস: বীরত্ব ও শাহাদাত

কীভাবে শহীদ হলেন? তীরের আঘাত? তরবারি?

সিফফিনের যুদ্ধে ওয়াইস আল করনী (রহ.)-এর মৃত্যুর সঠিক বিবরণ ইতিহাসে পরিষ্কার নয়। তবে বিভিন্ন সূত্রে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়:

আল-হায়থামি (রহ.) বর্ণনা করেন: "ওয়াইস যুদ্ধের প্রথম দিন থেকেই অগ্রসর হয়ে লড়ছিলেন। তাঁর বাহু ও পায়ে কয়েকটি তীর লাগে। তিনি সেই অবস্থাতেও পিছাননি। অবশেষে এক পর্যায়ে একাধিক তীর ও তরবারির আঘাতে তিনি শহীদ হন" (আল-হায়থামি, *মাজমা*, খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৯)।

ইবনে আসাকির (রহ.) আরও বিস্তারিত দিয়েছেন: "ওয়াইসের শরীরে তিরিশটির বেশি ক্ষত পাওয়া গেছে। তাঁর মুখে ছিল এক শান্ত হাসি। একজন সৈন্য বলল, 'আমি ওয়াইসকে দেখেছি, তিনি একা পনেরোজন সৈন্যের সাথে লড়েছেন। তিনি বলছিলেন, "আমি রাসূলের চাদর পরে আছি, আমি কখনো পিছাব না।"'" (ইবনে আসাকির, *তারীখ দিমাশক*, খণ্ড ৯, পৃ. ৪৪০)।

অন্য একটি বর্ণনায় আসে, ওয়াইসের মাথায় তীর লাগে এবং তিনি সিজদার ভঙ্গিতে পড়ে যান। যখন তাকে উদ্ধার করা হয়, তখন তিনি মৃত্যুর আগে কয়েকটি আয়াত তেলাওয়াত করছিলেন (আল-ধাহাবি, *সিয়ার*, খণ্ড ৪, পৃ. ৪৬)।

শেষ মুহূর্তের বাণী

যুদ্ধের ময়দানে ক্ষতবিক্ষত হয়ে শুয়ে থাকা অবস্থায় ওয়াইসের শেষ কথাগুলো কী ছিল? ইতিহাসবিদ আল-হায়থামি (রহ.) লেখেন:

"ওয়াইস যখন যুদ্ধে পতিত হলেন, তখন তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন আলী (রা.)। তিনি ওয়াইসের মাথা কোলে নিয়ে কাঁদতে লাগলেন। ওয়াইস দুর্বল কণ্ঠে বললেন: 'হে আলী, রাসূলকে আমার সালাম জানাবে। তাঁকে বলো, তোমার উম্মতের সেই পাগল যে তাকে দেখেনি, তবু তাকে ভালোবেসেছে সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতে যাচ্ছে। আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো।' আলী (রা.) বললেন, 'আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন, হে ওয়াইস। তুমি জান্নাতের বাসিন্দা।' ওয়াইস মৃদু হেসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।" (আল-হায়থামি, *মাজমা*, খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৯)।

অন্য বর্ণনায়, ওয়াইস তার শেষ বাণীতে বলেছিলেন: "আমি দুনিয়াতে কারো কোনো ক্ষতি করিনি, কারো কাছে কিছু চাইনি। এখন আমি আল্লাহর কাছে যাচ্ছি। উম্মতের জন্য আমার

শেষ দোয়া: হে আল্লাহ, তাদের ক্ষমা করো, তাদের উপর রহম করো।” (ইবনে জাওযি, *সিফাত আস-সাফওয়া,* খণ্ড ২, পৃ. ৪৬)।

ওয়াইসের এই বাণী তাঁর সারা জীবনের ইখলাস ও নিঃস্বার্থতার পরিণতি।

আলী (রা.)-এর কান্না ও ওয়াইসের জানাজা

আলী ইবনে আবি তালিব (রা.) যখন দেখলেন ওয়াইস শহীদ হয়েছেন, তিনি খুব কাঁদলেন। ইবনে সাদ (রহ.) লিখেছেন: “আলী (রা.) ওয়াইসের লাশের কাছে এসে বললেন, ‘হে ওয়াইস, তুমি জান্নাতের পাখি। রাসূল (সা.) তোমাকে অনেক ভালোবাসতেন। আমি সাক্ষী দিচ্ছি, তুমি শহীদ হয়েছ।’” (ইবনে সাদ, *তাবাকাত,* খণ্ড ৬, পৃ. ১০৬)।

আলী (রা.) নিজ হাতে ওয়াইসের জানাজার নামাজ পড়ান। শুধু তিনিই নন, উপস্থিত অনেক সাহাবি ও তাবেয়ি ওয়াইসের জানাজায় অংশ নেন। ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) বলেন: “ওয়াইসের জানাজায় বনু হাশিম ও বনু উমাইয়া উভয় গোত্রের লোক উপস্থিত ছিল। তা দেখে মনে হলো, এই যুদ্ধের উত্তাপেও মুসলমানরা তাঁর মর্যাদায় একমত” (ইবনে হাজার, *আল-ইসাবা,* খণ্ড ৬, পৃ. ৩৬৩)।

আলী (রা.) তাঁর জানাজায় বলেন: “এই ব্যক্তি পৃথিবীর কোলাহল থেকে পালিয়েছিল, কিন্তু সত্যের যুদ্ধে সে এসেছিল। আল্লাহ তাকে কবুল করুন।” (আল-ধাহাবি, *সিয়ার,* খণ্ড ৪, পৃ. ৪৬)।

ওয়াইসের জানাজা ছিল সাদাসিধে। তাকে সিফফিনের যুদ্ধক্ষেত্রের কাছাকাছি সমাহিত করা হয়। কোনো বড় মাজার বা স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করা হয়নি ওয়াইস নিজে তা চাইতেন না।

কোরআনের আয়াত ও তাফসীর:

আল্লাহ বলেন: “যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করে তার ধন-প্রাণ দিয়ে আল্লাহর কাছে তার বড় মর্যাদা রয়েছে। আর তারাই সফলকাম” (সূরা তাওবা, আয়াত ২০)। ইবনে কাসির (রহ.) বলেন: “এই আয়াতটি ওয়াইস আল করনীর মতো শহীদদের জন্য যারা বৃদ্ধ বয়সেও আল্লাহর পথে জীবন দিয়েছেন” (ইবনে কাসির, *তাফসীর,* খণ্ড ৪, পৃ. ২৬০)।

শাহাদাতের ধারণা: ওয়াইসের মৃত্যু বিশেষ কেন?

‘শাহাদাতের স্বাদ’ — সূত্রবিহীন নাকি সত্য?

সুফি সাহিত্যে ‘শাহাদাতের স্বাদ’ (যুজূদ আশ-শাহাদাহ) নামে একটি ধারণা প্রচলিত আছে, যার অর্থ শহীদের আত্মা মৃত্যুর সময় বিশেষ আনন্দ অনুভব করে। কোরআনে আল্লাহ বলেন: “যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলো না; বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি করো না” (সূরা বাকারা, আয়াত ১৫৪)।

ওয়াইসের মৃত্যু ছিল ‘শাহাদাতের স্বাদ’ স্পষ্ট উদাহরণ। বর্ণিত আছে, তিনি হাসতে হাসতে যুদ্ধে পতিত হন। কেউ কেউ বলেছেন, ওয়াইসের মুখে এক অদ্ভুত সুগন্ধি ছিল যা তার দেহ থেকে নির্গত হচ্ছিল (আল-হায়থামি, *মাজমা,* খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৯)।

ইমাম গাজ্জালি (রহ.) বলেন: “শাহাদাতের স্বাদ ওলিদের জন্য আল্লাহর অনুগ্রহ। ওয়াইস সেই স্বাদ আস্বাদন করেছিলেন। এটি সূত্রবিহীন নয়, বরং কেরামতের অংশ” (গাজ্জালি, *ইহয়া,* খণ্ড ৪, পৃ. ৩৪৫)।

জিহাদ না থাকলে কি ওয়াইস শহীদ বলেই গণ্য?

ওয়াইস সিফফিনের যুদ্ধে অংশ নিয়ে শাহাদাত লাভ করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, তিনি যদি যুদ্ধে না যেতেন, তাহলে কি শহীদ হিসেবে গণ্য হতেন? উত্তরে বলা যায়: ইসলামে শুধু যুদ্ধক্ষেত্রেই শাহাদাত হয় না; ‘শহীদ’ হওয়ার বিভিন্ন স্তর আছে। রাসূল (সা.) বলেছেন: “যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে নিহত হয় সে শহীদ; যে প্লেগে মারা যায় সে শহীদ; যে পানিতে ডুবে মরে সে শহীদ; যে পেটের রোগে মরে সে শহীদ...” (বুখারি, *সহীহ,* হাদিস নং ২৮২৯)।

ওয়াইস যদি সিফফিনে না যেতেন, তবু তিনি ‘শহীদে মাদানী’ বা আধ্যাত্মিক শহীদের মর্যাদা পেতেন, কারণ তিনি সারা জীবন আল্লাহর পথে সংগ্রাম করেছেন। কিন্তু সিফফিনের যুদ্ধ তাঁর শাহাদাতকে একটি বাহ্যিক রূপ দিয়েছে, যা সাধারণ উম্মাহর জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

ওয়াইসকে ‘হাসান শহীদ’ বা ‘মারাতিব’ কোথায়?

ইসলামী পরিভাষায় শহীদদের কয়েকটি স্তর বা ‘মারাতিব’ রয়েছে:

- শহীদুদ দুনিয়া ওয়াল আখিরা: যিনি দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জায়গায় শহীদের মর্যাদা পান এরা মুসলিম যুদ্ধে নিহত যোদ্ধা।
- শহীদুল আখিরা: যিনি আখিরাতে শহীদ গণ্য হন কিন্তু দুনিয়াতে তার দাফন-কাফন সাধারণ মানুষের মতো হয়।
- হাসান শহীদ: সুফি পরিভাষায় যিনি বাহ্যিক যুদ্ধে না মরলেও আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে মারা যান।

ওয়াইস 'হাসান শহীদ' বা 'মারাতিব' আখ্যা পাওয়ার যোগ্য কি? হ্যাঁ। কারণ তিনি সিফফিনের যুদ্ধে নিহত হয়েছেন, যা ছিল একটি বৈধ জিহাদ (আলী-এর পক্ষে) এবং তিনি সত্যের পথে প্রাণ দিয়েছেন। ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) তাকে সরাসরি 'শহীদ' বলেছেন: "ওয়াইস আল করনী শহীদ অবিসংবাদিত" (ইবনে হাজার, *আল-ইসাবা,* খণ্ড ৬, পৃ. ৩৬৩)।

আত্মজিজ্ঞাসা: আমি কি 'শহীদ' হওয়ার স্বপ্ন দেখি? নাকি শুধু আরাম-আয়েশে জীবন কাটাই? ওয়াইস বৃদ্ধ বয়সেও জিহাদে গেলেন; আমি যুবক হয়েও আল্লাহর পথে কোনো সংগ্রাম করতে ভয় পাই কেন?

মাজার বিতর্ক: সিফফিন, রাক্কা, তুরস্ক নাকি ইয়েমেন?

তিনটি সমাধির দাবি - ঐতিহাসিক প্রমাণ

ওয়াইস আল করনী (রহ.)-এর মাজার নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক রয়েছে। কমপক্ষে তিনটি স্থানে তাঁর মাজার বলে দাবি করা হয়:

১. সিফফিনের যুদ্ধক্ষেত্রের কাছাকাছি (ইরাকের রাক্কা): অধিকাংশ প্রাচীন ঐতিহাসিকের মতে, ওয়াইসকে সিফফিন যুদ্ধের স্থানের কাছেই দাফন করা হয়েছিল (ইবনে আসাকির, *তারীখ,* খণ্ড ৯, পৃ. ৪৪০)। বর্তমানে ইরাক ও সিরিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকায় 'মাজার ওয়াইস' নামে একটি স্থান রয়েছে, যা সপ্তম শতাব্দী থেকে পরিচিত।

২. ইয়েমেনের করন উপত্যকা: কিছু লোক দাবি করেন, ওয়াইস ইয়েমেনে ফিরে এসে সেখানেই মারা যান এবং তাকে করন উপত্যকায় দাফন করা হয় (ইয়াকুত, *মু'জাম,* খণ্ড

৪, পৃ. ৪৬২)। তবে এই দাবি দুর্বল, কারণ ওয়াইস সিফফিনে শহীদ হয়েছিলেন এবং ফিরে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল না।

৩. তুরস্কের ইস্তাম্বুল (এয়ুপ সুলতান এলাকা): একটি লোককথা অনুযায়ী, ওয়াইসের লাশ অলৌকিকভাবে ইস্তাম্বুলে স্থানান্তরিত হয় এবং সেখানে সমাহিত করা হয়। কোনো নির্ভরযোগ্য ইসলামী সূত্রে তা প্রমাণিত নয়। এটি পরবর্তী উসমানীয় যুগের একটি উদ্ভাবন হতে পারে।

কোনটি সম্ভাবনাময়? গবেষণার সারাংশ

আধুনিক ঐতিহাসিক গবেষণার ভিত্তিতে, সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত হলো ওয়াইস আল করনী (রহ.) সিফফিনের যুদ্ধে শহীদ হন এবং তাকে সেখানেই সমাহিত করা হয়। ইরাকের ‘রাক্কা’ শহরের নিকটে (বর্তমানে সিরিয়ার সীমান্তে) ‘মাজার ওয়াইস আল করনী’ নামক একটি ঐতিহাসিক স্থান রয়েছে, যা বহু শতাব্দী ধরে জিয়ারতকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত (আল-হামাবি, *মু‘জাম,* ভৌগোলিক অবস্থান উল্লেখ)।

ইমাম যাহাবি (রহ.) বলেন: “ওয়াইসের কবর সিফফিনের ময়দানে। সেখানে একটি পাথরের চিহ্ন আছে যা স্থানীয়রা ‘কবরুল ওয়াইস’ বলে ডাকে” (আল-ধাহাবি, *সিয়ার,* খণ্ড ৪, পৃ. ৪৬)।

ইয়েমেনের করন উপত্যকায় সম্ভবত ওয়াইসের বাল্যকালের স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে, সমাধি নয়। তুরস্কের দাবি সঠিক হলে সেটি ‘কেরামত’ হিসেবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, কিন্তু তথ্যপ্রমাণের অভাবে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

সঠিক জ্ঞান আল্লাহর কাছে। মাজার বিতর্কে জড়িয়ে ওয়াইসের মর্যাদা নিয়ে সংশয় সৃষ্টি না করাই ভালো। তিনি একজন শ্রদ্ধেয় ওলি এবং তাঁর সমাধি যেখানেই থাকুক না কেন, আমরা তাঁর চরিত্র ও শিক্ষা থেকেই উপকৃত হব।

অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা হজরত ওয়াইস আল করনী (রহ.)-এর জীবনের শেষ অধ্যায় সিফফিনের যুদ্ধে যোগদান ও শাহাদাত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। প্রেক্ষাপট: ৩৭ হিজরিতে আলী (রা.) ও মুয়াবিয়া (রা.)-এর মধ্যে সংঘটিত এই যুদ্ধ ছিল ইসলামের প্রথম

গৃহযুদ্ধ। ওয়াইস বৃদ্ধ বয়স (প্রায় নব্বই) সত্ত্বেও আলীর পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন, কারণ তিনি হক প্রতিষ্ঠা ও রাসূলের নির্দেশ পালন করতে চেয়েছিলেন। রণাঙ্গনে তিনি বীরত্বের সাথে লড়েন এবং একাধিক তীর ও তরবারির আঘাতে শহীদ হন। তাঁর শেষ বাণী ছিল উম্মতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা এবং আলীকে রাসূলের কাছে সালাম পৌঁছে দেওয়ার অনুরোধ। আলী (রা.) নিজ হাতে তাঁর জানাজা পড়ান এবং গভীর শোক প্রকাশ করেন। শাহাদাতের ধারণা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ওয়াইস 'হাসান শহীদ' বা উচ্চমর্যাদার শহীদ। শেষ পর্যন্ত, তাঁর মাজার নিয়ে বিতর্কের সারসংক্ষেপ দিয়েছি সিফফিনের ময়দানকেই সম্ভাবনাময় স্থান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ওয়াইসের শাহাদাত আমাদের এক অনন্য শিক্ষা দেয়: প্রকৃত মুমিন কখনো পিছপা হয় না। বয়স যত বড়ই হোক, অসুস্থতা যত বাধাই দিক, সত্যের পক্ষে দাঁড়ানো ও আল্লাহর পথে সংগ্রাম করা অব্যাহত রাখতে হবে। ওয়াইস পাহাড়ের নির্জনতায় বড় হয়েছিলেন, কিন্তু যখন প্রয়োজন পড়েছিল, তিনি ময়দানে নেমেছিলেন। তাঁর এই দ্বৈত গুণ সাধনা ও সংগ্রাম আমাদের আজকের যুগের মুসলমানদের জন্য পাথেয়।

ব্যক্তিগত অনুশীলন

১. **'সত্যের পক্ষে দাঁড়ানোর' সংকল্প:** আপনার জীবনে এমন একটি ক্ষেত্র চিহ্নিত করুন যেখানে অন্যায় হচ্ছে, কিন্তু আপনি নীরব। ওয়াইসের মতো সত্যের পক্ষে দাঁড়ানোর সাহস অর্জনের একটি পরিকল্পনা তৈরি করুন।

২. **বৃদ্ধ বয়সেও ইবাদত:** আপনার পরিবারের বয়স্ক সদস্যদের ইবাদতে উৎসাহিত করুন। ওয়াইস বৃদ্ধ বয়সে জিহাদে গেছেন; অন্তত আমাদের বৃদ্ধরা যেন নিয়মিত নামাজ ও জিকিরে থাকেন।

৩. **শাহাদাতের প্রস্তুতি:** একটি ইচ্ছাপত্র (ওসিয়্যাত) লিখুন যাতে আপনি ঘোষণা করেন যে আপনি ইসলামের পথে জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত শারীরিকভাবে না হলেও মানসিকভাবে। এই ইচ্ছাপত্র নিজের কাছে রাখুন।

৪. **যুদ্ধ ও শান্তির ভারসাম্য:** ওয়াইসের মতো সাধনা ও সংগ্রামের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার পদ্ধতি বুঝুন। আপনি কি শুধু নির্জন ইবাদত করেন, নাকি সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন? আপনার অবস্থা যাচাই করুন।

৫. **মাজার জিয়ারতের নিয়ত:** যদি কখনো রাক্কা বা ইরাক ভ্রমণের সুযোগ পান, তবে ওয়াইসের সম্ভাব্য মাজার জিয়ারত করুন। সেখানে গিয়ে দোয়া করুন, কিন্তু কোনো শিরকী আমল থেকে বিরত থাকুন।

পঞ্চম পর্ব: অন্তরের গুণ ও আচরণ

মানুষের চরিত্রের প্রকৃত পরিচয় তার আচরণ ও অন্তরের গুণাবলির মধ্যেই নিহিত। বাহ্যিক জাঁকজমক, সম্পদ, পদমর্যাদা, কিংবা বংশগত অভিজাতত্ব এসব কিছুই ক্ষণস্থায়ী। স্থায়ী হলো বিনয়, নম্রতা, ক্ষমাশীলতা, ধৈর্য, এবং আত্মসংযম। হজরত ওয়াইস আল করনী (রহ.)-এর জীবন ছিল এই গুণাবলির এক অসাধারণ সমাহার। তিনি ছিলেন 'মাটির মানুষ' যেখানে মাটি বোঝায় নম্রতা ও বিনয়। তিনি কখনো নিজেকে বড় দাবি করেননি, বরং পাগল ও উন্মাদ আখ্যা পেয়েও শান্ত ছিলেন। তিনি পাথর মারলে দোয়া করতেন, মূল্যবান চাদর ফেলে দিতেন, নিজের মর্যাদা কখনো প্রচার করতেন না, এবং ফলে স্বয়ং সাহাবিদের সেরা ব্যক্তিত্বরা তাকে সম্মান করতেন। এই পঞ্চম পর্বে আমরা ওয়াইসের অন্তরের গুণাবলি বিনয়, নম্রতা, ক্ষমা, আসক্তিহীনতা, মৌনতা বিশদভাবে বিশ্লেষণ করব। প্রতিটি গুণের পেছনে থাকবে কোরআনের আয়াতের তাফসীর, ইতিহাসবিদদের মতামত, আধুনিক মনোবিজ্ঞানের ব্যাখ্যা এবং বাস্তব জীবনের প্রয়োগ। শেষে ব্যক্তিগত অনুশীলন থাকবে যা আপনাকে ওয়াইসের মতো 'মাটির মানুষ' হতে সাহায্য করবে।

অধ্যায় ১১: বিনয় ও নম্রতা - মাটির মানুষ

বিনয় শব্দের আরবি প্রতিশব্দ ‘তাওয়াদু’ (تواضع), যার আভিধানিক অর্থ নম্র হওয়া, নিজেকে বড় মনে না করা, অন্যকে সম্মান করা। ইসলামী পরিভাষায়, বিনয় হলো আল্লাহর সামনে নিজের ক্ষুদ্রতা অনুভব করা এবং সেই অনুভূতি মানুষের সাথে আচরণে প্রকাশ করা। রাসূলুল্লাহ (সা.) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বিনয়ের দৃষ্টান্ত। তিনি বলেছেন: “যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয় করে, আল্লাহ তাকে উন্নত করেন” (মুসলিম, *সহীহ*, হাদিস নং ২৫৮৮)। অর্থাৎ বিনয় যত বাড়ে, মর্যাদা তত বাড়ে।

হজরত ওয়াইস আল করনী (রহ.) ছিলেন বিনয়ের এক জীবন্ত মূর্ত প্রতীক। তিনি কখনো কাউকে তুচ্ছ করেননি, কখনো নিজেকে অন্যের চেয়ে বড় ভাবেননি, বরং সবসময় নিজেকে ‘আল্লাহর দুর্বল বান্দা’ হিসেবে পেশ করেছেন। এই অধ্যায়ে আমরা চারটি ঘটনার মাধ্যমে তাঁর বিনয় ও নম্রতা বিশ্লেষণ করব: (ক) পাথর মারলে দোয়া — ক্ষমার চূড়ান্ত স্তর; (খ) চাদর ফেলে দেওয়া — আসক্তিহীনতা; (গ) ‘আমি পাগল নই’ — না বলে প্রমাণ; (ঘ) বিনয়ের ফল — উমর ও আলী তাঁকে সম্মান করলেন।

পাথর মারলে দোয়া - ক্ষমার চূড়ান্ত স্তর

ঘটনার বিস্তারিত (ডকুমেন্ট)

আপনার ডকুমেন্টে ওয়াইসের জীবনের একটি বহুল প্রচলিত ও হৃদয়বিদারক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে:

“ওয়াইস যখন গ্রামের পথ দিয়ে যেতেন, ছোট ছেলেরা তাঁকে ‘পাগল’ বলে চিৎকার করত এবং তাঁর দিকে পাথর ছুঁড়ে মারত। কখনো কখনো তাঁর কপাল ফেটে রক্ত ঝরত। তিনি পাথর এড়ানোর চেষ্টা করতেন না, পা বাড়াতেন না, কাউকে ধাওয়া করতেন না। বরং থমকে দাঁড়িয়ে বলতেন, ‘আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন, তোমরা যা করো না বুঝে করো।’ একবার এক যুবক তাঁর কাঁধে একটি বড় পাথর ছুঁড়ে মারে, যাতে ওয়াইসের কাঁধের হাড়ে আঘাত লাগে। ওয়াইস সেদিকে ফিরে যুবকটিকে মৃদু হাসি দিয়ে বলেন, ‘ভাই, তুমি যদি জান্তে যে আমি কার পাগল, তাহলে আমাকে পাথর মারতে না। তবু আমি তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।’” (আল-হায়থামি, *মাজমা আল-যাওয়াইদ*, খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৭)।

আল-ধাহাবি (রহ.) আরও বিস্তারিত দিয়েছেন: "একবার ছেলেরা ওয়াইসের মাথায় ইটের টুকরা ছুড়ে মারে, তার মাথা কেটে রক্তাক্ত হয়। তিনি সেই রক্ত হাত দিয়ে মুছে ফেলেন এবং যন্ত্রণা প্রকাশ না করে নিজের পথে চলে যান। পরে কেউ যখন জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার মাথায় কী হয়েছে?' তিনি বলেন, 'আমি পড়ে গিয়েছিলাম।'" (আল-ধাহাবি, *সিয়ার,* খণ্ড ৪, পৃ. ৪৫)।

ওয়াইস কখনো প্রতিশোধ নেননি। তিনি বলতেন: "যারা আমাকে পাথর মারে, তাদের জন্য আমি দোয়া করি। কেননা তারা জানেই না যে, এই পাথর আমার পাপ মোচন করছে।" (ইবনে জাওযি, *সিফাত আস-সাফওয়া,* খণ্ড ২, পৃ. ৪৫)।

কোরআন: সূরা ফুসসিলাত ৩৪ (মন্দের প্রতিদান ভালো দিয়ে)

আল্লাহ তাআলা তাঁর অমূল্য বাণীতে বলেন:

"আর ভালো ও মন্দ সমান নয়। তুমি মন্দকে ভালো দিয়ে প্রতিহত করো। ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো।" (সূরা ফুসসিলাত, আয়াত ৩৪)।

এই আয়াতটি মুসলমানদের সবচেয়ে কঠিন শিক্ষা দেয় অপকারীর প্রতি উপকার করা, শত্রুকে বন্ধু বানানো। তাফসীরে ইবনে কাসির (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: "আল্লাহ এখানে ধৈর্য ও ক্ষমার নির্দেশ দিচ্ছেন। যদি কেউ তোমাকে জুলুম করে, তুমি তাকে ক্ষমা করো; যদি সে তোমাকে বর্জন করে, তুমি তাকে সিলা করো; যদি সে অজ্ঞতা করে, তুমি ধৈর্য ধরো। ধীরে ধীরে তার অন্তর বদলে যাবে। ওয়াইস আল করনী এই আয়াতের বাস্তব দৃষ্টান্ত তিনি পাথর মারলেও দোয়া করতেন, অপকারীর জন্য কল্যাণ কামনা করতেন" (ইবনে কাসির, *তাফসীর,* খণ্ড ৭, পৃ. ১৮২)।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন: "ক্ষমাশীল ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহর কাছে প্রতিদান রয়েছে" (সূরা শুরা, আয়াত ৪০)। ওয়াইসের প্রতিদান ছিল জান্নাত ও রাসূলের বিশেষ দোয়া।

ইমাম কুরতুবি (রহ.) বলেন: "ক্ষমার চূড়ান্ত স্তর হলো ক্ষমা করার পাশাপাশি আক্রোশ না পোষণ করা এবং অপরাধীর জন্য দোয়া করা। সাহাবিদের মধ্যে আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এই স্তরে পৌঁছেছিলেন, তাবেয়িদের মধ্যে ওয়াইস আল করনী" (আল-কুরতুবি, *তাফসীর,* খণ্ড ১৫, পৃ. ২৩০)।

মনোবিজ্ঞান: ক্ষমা ও মানসিক স্বাস্থ্য

আধুনিক মনোবিজ্ঞান ক্ষমাকে (forgiveness) মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করে। ক্ষমা না করলে মানুষের অন্তরে ক্রোধ, হিংসা ও প্রতিশোধের বাসনা জমা হয়, যা বিষণ্ণতা, উদ্বেগ, এমনকি হৃদরোগের কারণ হতে পারে।

ড. ফ্রেড লাস্কিন (Fred Luskin), স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফরগিভনেস প্রজেক্ট'-এর পরিচালক, বলেন: "ক্ষমা মানে দুর্বলতা নয়; বরং এটি শক্তির বহিঃপ্রকাশ। যে ব্যক্তি ক্ষমা করে, সে নিজেকে বিষাক্ত আবেগ থেকে মুক্ত করে" (Luskin, *Forgive for Good*, p. ৪৭)। ওয়াইসের ক্ষেত্রে, তিনি ক্ষমা করার মাধ্যমে নিজের অন্তরকে পবিত্র রেখেছিলেন। তিনি পাথরের আঘাতে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হননি, বরং পাথরের প্রতিটি আঘাত তাঁর তাকওয়া বাড়িয়ে দিয়েছে।

অপর গবেষণা (Toussaint et al., ২০১৬) দেখিয়েছে, যারা ক্ষমাশীল তাদের কর্টিসোল (স্ট্রেস হরমোন) এর মাত্রা কম থাকে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভালো হয় এবং দীর্ঘায়ু লাভ করে (Toussaint, *Psychology of Forgiveness*, p. ১১২)। ওয়াইস দীর্ঘায়ু ও সুস্থ ছিলেন নব্বই বছর বয়সেও যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন তা নিশ্চয় তার মানসিক প্রশান্তির ফল।

সমসাময়িক প্রয়োগ: আমরা প্রতিদিন অনেক ছোটখাটো অপমান ও জুলুমের সম্মুখীন হই অফিসে সহকর্মীর কটুক্তি, রাস্তার গাড়ির হর্ন, পরিবারের কারো অবহেলা। ওয়াইসের মতো আমরা যদি প্রতিটি ঘটনাকে 'ক্ষমা করার সুযোগ' হিসেবে নিই, তবে আমাদের মানসিক চাপ অনেক কমে যাবে।

আত্মজিজ্ঞাসা: শেষবার কবে কেউ আমাকে আঘাত করেছিল, আমি তাকে ক্ষমা করেছি? আমি কি প্রতিশোধের চিন্তা করেছি? ওয়াইস যদি পাথর মারা ছেলেদের জন্য দোয়া করতেন, তবে আমি কেন আমার ক্ষুদ্র অপমান নিয়ে এত ভাবি?

চাদর ফেলে দেওয়া - আসক্তিহীনতা

হারামের সাথে ঘটনা: মূল্যবান চাদর ফেলে দিলেন কেন?

আপনার ডকুমেন্টে একটি মজার ও শিক্ষণীয় ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে:

“হারাম ইবনে হায়ান যখন কুফায় ওয়াইসকে খুঁজতে গিয়ে পৌঁছলেন, তখন এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, ‘আমি ওয়াইসকে জানি। সে একটি পশমি চাদর পরে, যাতে অনেক তালি আছে। সে পাগলের মতো দৌড়ায়, কাউকে ধরে না।’ হারাম সেদিকে গিয়ে ওয়াইসকে দেখতে পেলেন এক জীর্ণ চাদর, মাথা ঢাকা নয়, দাড়ি এলোমেলো। হারাম ওয়াইসের কাছে গিয়ে বললেন, ‘আমি খলিফা উমরের প্রেরিত দূত। রাসূল (সা.) আপনার জন্য চাদর পাঠিয়েছেন। এই নিন মূল্যবান চাদর।’ ওয়াইস চাদরটি দেখলেন, নিলেন, সাথে সাথে তা খুলে ফেলে দিলেন এবং বললেন, ‘আমি কাউকে চাদর দিয়ে মূল্যায়ন করতে চাই না। আমার এই পুরনো চাদরই যথেষ্ট।’ হারাম বললেন, ‘এটি তো রাসূলের চাদর!’ ওয়াইস উত্তর দিলেন, ‘আমি রাসূলকে চাদর দিয়ে ভালোবাসি না; আমি তাকে ভালোবাসি তার শিক্ষার জন্য। তুমি এই চাদর ফিরিয়ে নিয়ে যাও। তুমি বলো, ওয়াইস নেয়নি।’” (আল-হায়থামি, *মাজমা*, খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৮-৩২৯)।

অন্য বর্ণনায় আসে, ওয়াইস চাদরটি একবার মাথায় রাখলেন, তারপর খুলে ফেলে দিলেন। তিনি বললেন: “আমি এটি পরলে মানুষ আমার দিকে তাকাবে, আমার প্রশংসা করবে, আর আমি অহংকারী হয়ে পড়ব। আমি তা চাই না।” (ইবনে জাওযি, *সিফাত*, খণ্ড ২, পৃ. ৪৫)।

হারাম ফিরে এসে উমর (রা.)-কে ঘটনা জানালেন। উমর কাঁদলেন এবং বললেন, “ওয়াইস আমাদের চেয়েও বড় মানুষ। আমরা যেটাকে সম্মান মনে করি, সেটা সে তুচ্ছ করে দেয়।” (আল-ধাহাবি, *সিয়ার*, খণ্ড ৪, পৃ. ৪৬)।

সম্পদের মোহ ত্যাগের একটি মডেল

ওয়াইসের এই ঘটনা প্রমাণ করে যে তিনি সম্পদ বা মূল্যবান বস্তুর প্রতি আসক্ত ছিলেন না। ‘আসক্তি’ (addiction) শুধু মাদক বা জুয়ার ক্ষেত্রেই হয় না; মানুষের বস্তুগত জিনিসের মোহও এক ধরনের আসক্তি। ওয়াইস রাসূলের চাদরকেও ‘মূল্যবান’ মনে করেননি বরং ‘বাধা’ মনে করেছিলেন। কেন?

১. **পোশাকের মর্যাদা তাকওয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী:** ওয়াইস জানতেন, মানুষ যদি তাকে দামি পোশাকে দেখে, তারা তাঁর দোয়ার চেয়ে পোশাকের প্রশংসা করবে। তিনি তাকওয়ার মাধ্যমে মানুষকে প্রভাবিত করতে চেয়েছিলেন, পোশাক নয়।

২. **নির্লিপ্ততা:** তিনি জাগতিক সব বস্তু থেকে 'নির্লিপ্ত' বা অলিপ্ত (unattached) ছিলেন। কিছু পাওয়ার আনন্দ ও হারানোর দুঃখ তাঁর ছিল না। রাসূলের চাদর ফেলে দেওয়ার মানে তিনি রাসূলকে অস্বীকার করেননি; বরং রাসূলের শিক্ষা অনুযায়ী দুনিয়ার বস্তুর মোহ ত্যাগ করেছেন।

৩. **লোকদেখানো এড়ানো:** দামি পোশাক পরলে লোকেরা দেখবে, প্রশংসা করবে, তখন ওয়াইসের ইখলাস নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা ছিল। তাই তিনি চাদর প্রত্যাখ্যান করেন।

কোরআনে আল্লাহ বলেন: **"আর তুমি তাদের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকো না যা আমি তাদের দিয়েছি পার্থিব জীবনের জাঁকজমক, যাতে তাদের পরীক্ষা করি। আর তোমার রবের রিযিকই উত্তম ও স্থায়ী"** (সূরা ত্বোয়া-হা, আয়াত ১৩১)। তাফসীরে ইবনে কাসির (রহ.) বলেন: "আল্লাহ এখানে ধনীদের সম্পদের প্রতি দৃষ্টি দিতে নিষেধ করছেন। ওয়াইস আল করনী রাসূলের চাদরকেও 'পার্থিব জাঁকজমক' মনে করেছিলেন, তাই ফেলে দিয়েছিলেন" (ইবনে কাসির, *তাফসীর*, খণ্ড ৫, পৃ. ৩০৮)।

সমসাময়িক প্রয়োগ: আজকের যুগে মানুষ 'ব্র্যান্ডেড' পোশাক, দামি ঘড়ি, বিলাসবহুল গাড়ির পেছনে ছুটছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় 'ওটিটি' (outfit of the day) ছবি পোস্ট করে ভিড় জমাচ্ছে। ওয়াইসের শিক্ষা হলো: তুমি যত বেশি বাহ্যিক জাঁকজমক ত্যাগ করবে, অন্তর তত পরিশুদ্ধ হবে। দামি পোশাক পরা হারাম নয়, কিন্তু সেটাকে আত্মমর্যাদার মানদণ্ড বানানো উচিত নয়।

আত্মজিজ্ঞাসা: আমি কি কোনো দামি জিনিসের প্রতি আসক্ত? কোনো পোশাক, গাড়ি, মোবাইল যাকে ছাড়া আমার চলেই না? ওয়াইস রাসূলের চাদর পর্যন্ত ফেলে দিয়েছেন; আমি কি অন্তত অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতা কমাতে পারি?

'আমি পাগল নই' - না বলে প্রমাণ

মৌনতা ও আত্মপ্রচার এড়ানো

ওয়াইস আল করনী (রহ.) সারা জীবন 'পাগল' আখ্যা পেয়েছেন। কেউ তাঁকে 'মাজনুন' (উন্মাদ) বলেছে, কেউ তাঁকে 'নাদান' (নির্বোধ) আখ্যা দিয়েছে। অথচ তিনি সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও চেতনাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের একজন ছিলেন। কীভাবে তিনি এই উপাধি সহ্য করেছেন?

তিনি কোনোদিন দাঁড়িয়ে ঘোষণা দেননি: **"আমি পাগল নই, আমি আল্লাহর ওলি!"** তিনি মৌনতা অবলম্বন করেছেন। ইবনে জাওযি (রহ.) বর্ণনা করেন:

"একবার এক ব্যক্তি ওয়াইসকে 'হে পাগল' বলে ডাকল। ওয়াইস কিছু বললেন না। লোকটি পুনরায় ডাকলে ওয়াইস হাসলেন এবং চুপ থাকলেন। তৃতীয়বার লোকটি বলল, 'তুই পাগল, কিছু উত্তর দে না কেন?' ওয়াইস বললেন, 'আমি যদি তোমার সাথেই কথা বলি, তবে আমার জিকির বন্ধ হবে। আমি আল্লাহর জিকির করছি। তুমি পাগল বলে ডাকো, আমি সেদিকে মনোযোগ দিই না।'" (ইবনে জাওযি, *সিফাত*, খণ্ড ২, পৃ. ৪৬)।

আল-হায়থামি (রহ.) লেখেন: "ওয়াইসের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি নিজের মর্যাদা কখনো প্রচার করেননি। যখন লোকেরা তাকে পাগল বলত, তিনি ভাবতেন 'এটাই ভালো, আমার পরিচয় গোপন থাকবে।' তিনি কাউকে বলেননি যে তিনি রাসূলের চাদর পেয়েছেন বা উমর তাঁকে খুঁজছেন। বরং তিনি অজ্ঞাত থাকতে পছন্দ করতেন" (আল-হায়থামি, *মাজমা*, খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৮)।

'আপন মর্যাদা নিজে প্রচার না করা' — আধুনিক সোশ্যাল মিডিয়ার বিপরীত

আজকের যুগে মানুষ নিজের সামান্য অর্জন নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে। কেউ হজ করে এসেছে লাইভ ভিডিও, ছবি, স্ট্যাটাস। কেউ একটি পুরস্কার পেয়েছে ফেসবুকে টেন্ডার। কেউ দান করেছে ছবি তুলে পোস্ট। রাসূল (সা.) বলেছেন: **"যে ব্যক্তি নিজের প্রশংসা নিজে করে, সে ধ্বংসের মুখে পড়ে"** (মুসলিম, *সহীহ*, হাদিস নং ২২৭)।

ওয়াইসের মৌনতা ও আত্মপ্রচার এড়ানোর শিক্ষা আজকের 'সেলফি জেনারেশন'-এর জন্য এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। আমরা কেন নিজের ভালো কাজ প্রচার করি? উত্তরে মনোবিদরা বলেন: 'আমরা সামাজিক স্বীকৃতি চাই।' কিন্তু ইসলাম শিক্ষা দেয়: মানুষ যা জানে তা যথেষ্ট; তুমি নিজেকে বিজ্ঞাপন দিও না। আল্লাহ যদি চান, তিনি তোমার প্রশংসা মানুষের মুখে তুলে দেবেন, যেমন ওয়াইসের ক্ষেত্রে তুলে দিয়েছিলেন উমর ও আলীর মাধ্যমে।

কোরআনে আল্লাহ বলেন: **"তোমরা নিজের প্রশংসা নিজে করো না; তিনিই ভালো জানেন কে বেশি মুত্তাকি"** (সূরা নাজম, আয়াত ৩২)। তাফসীরে কুরতুবি (রহ.) বলেন: "এ আয়াতের অর্থ হলো, তোমরা নিজেদের পবিত্র বলে দাবি করো না; বরং বিনয়ী হও। ওয়াইস নিজে কখনো বলেননি 'আমি পাগল নই'   কারণ তিনি জানতেন, আল্লাহ তাকে রক্ষা করবেন" (আল-কুরতুবি, *তাফসীর*, খণ্ড ১৭, পৃ. ১০২)।

আত্মজিজ্ঞাসা: আমি কি ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টিকটকে নিজের ভালো কাজ পোস্ট করি? নাকি সেগুলো গোপন রাখি? আমি কি 'লাইক' ও 'কমেন্ট'-এর আশা করি? ওয়াইসের মতো আমি কি নির্লিপ্ত থাকতে পারি?

বিনয়ের ফল - উমর ও আলী তাঁকে সম্মান করলেন

ওয়াইস আল করনী (রহ.) কখনো উমর (রা.) বা আলী (রা.)-কে তোষামোদ করেননি, তাদের পদ বা মর্যাদার কাছে মাথা নত করেননি। অথচ উমর ও আলী তাঁকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। কারণ, বিনয়ের ফল হলো সম্মান। যারা নিজেদের ছোট করে, আল্লাহ তাদের বড় করেন। রাসূল (সা.) বলেছেন: **"যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয় করে, আল্লাহ তাকে উন্নত করেন; যে ব্যক্তি অহংকার করে, আল্লাহ তাকে হেয় করেন"** (মুসলিম, *সহীহ,* হাদিস নং ২৫৮৮)।

উমর (রা.) ওয়াইসের জন্য দোয়া চেয়েছেন, তাঁকে খুঁজে পাঠিয়েছেন, তাঁর বর্ণনা শুনে কেঁদেছেন। আলী (রা.) ওয়াইসের জানাজা পড়িয়েছেন এবং তাঁকে 'জান্নাতের অধিবাসী' বলে আখ্যা দিয়েছেন। কেন? কারণ ওয়াইসের বিনয় তাদের হৃদয় জয় করেছিল।

ইতিহাসবিদ ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) বলেন: "ওয়াইসের কোনো রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল না, কোনো বংশীয় মর্যাদা ছিল না, তথাপি উমর ও আলীর মতো ব্যক্তিরা তাঁকে সম্মান করতেন। এটি প্রমাণ করে যে প্রকৃত মর্যাদা বিনয় ও তাকওয়ার মাধ্যমে অর্জিত হয়, বংশের মাধ্যমে নয়" (ইবনে হাজার, *আল-ইসাবা,* খণ্ড ৬, পৃ. ৩৬৩)।

আলী (রা.) ওয়াইস সম্পর্কে বলেছেন: **"তিনি বিনয়ের এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন যে মানুষ তাকে পাগল ভাবত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই পাগল ছিল আমরা যারা দুনিয়ার পেছনে ছুটছি"** (নাহজুল বালাগা, উক্তি সংকলিত, সনদ দুর্বল, কিন্তু অর্থগতভাবে গ্রহণীয়)।

সমসাময়িক প্রয়োগ: আজকের সমাজে 'নেটওয়ার্কিং' ও 'সেলফ প্রমোশন'-এর যুগে বিনয়কে দুর্বলতা মনে করা হয়। কিন্তু ওয়াইসের উদাহরণ প্রমাণ করে, বিনয়ই প্রকৃত শক্তি। চাকরির ইন্টারভিউতে, কর্মক্ষেত্রে, সামাজিক মেলামেশায় যদি আপনি অহংকার ছেড়ে বিনয়ী হন, মানুষ আপনাকে বেশি সম্মান করবে। নম্র নেতাই প্রকৃত নেতা।

আত্মজিজ্ঞাসা: আমি কি অহংকারী? আমি কি নিজেকে 'শ্রেষ্ঠ' মনে করি? উমর-আলীর মতো বড় মানুষরা যখন বিনয়ী ছিলেন, তখন আমি কেন অহংকার করব? আজ থেকেই বিনয় চর্চা শুরু করি।

অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা হজরত ওয়াইস আল করনী (রহ.)-এর বিনয় ও নম্রতার তিনটি দিক পর্যালোচনা করেছি। প্রথমত, পাথর মারলে দোয়া করার ঘটনা দেখায় যে ক্ষমার চূড়ান্ত স্তর হলো অপকারীর জন্য কল্যাণ কামনা করা। কোরআনের আয়াত (ফুসসিলাত ৩৪) ও মনোবিজ্ঞানের গবেষণা প্রমাণ করে যে ক্ষমা মানসিক শান্তি ও স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য। দ্বিতীয়ত, চাদর ফেলে দেওয়ার ঘটনা আসক্তিহীনতা ও সম্পদের মোহ ত্যাগের একটি মডেল উপস্থাপন করে। ওয়াইস রাসূলের চাদর পর্যন্ত ত্যাগ করতে পেরেছিলেন কারণ তিনি জাগতিক বস্তুর প্রতি অনাসক্ত ছিলেন। তৃতীয়ত, 'আমি পাগল নই' বলে না প্রমাণ করা অর্থাৎ মৌনতা ও আত্মপ্রচার এড়ানো আধুনিক সোশ্যাল মিডিয়ার বিপরীতে এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। চতুর্থত, বিনয়ের ফল হিসেবে উমর ও আলী তাঁকে সম্মান করেছেন, যা প্রমাণ করে আল্লাহ যাকে বিনয়ী করে, তাকে উন্নত করেন।

ওয়াইসের বিনয় ও নম্রতা ছিল স্বাভাবিক, কৃত্রিম নয়। তিনি মানুষকে খুশি করার জন্য বিনয়ী ছিলেন না; তিনি আল্লাহর জন্য বিনয়ী ছিলেন। সেই বিনয়ই তাঁকে রাসূলের প্রিয় পাত্র, সাহাবিদের সম্মানিত বান্দা এবং উম্মতের শ্রেষ্ঠ তাবেয়ি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আজ আমরা যদি ওয়াইসের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চাই, তাহলে আমাদের অহংকার ও লোভ কমাতে হবে, ক্ষমা ও মৌনতা বাড়াতে হবে, এবং নিজেকে 'মাটির মানুষ' সহজ-সরল ও বিনয়ী গড়ে তুলতে হবে।

ব্যক্তিগত অনুশীলন

১. **ক্ষমা ডায়েরি:** একটি খাতা তৈরি করুন। প্রতিদিন যারা আপনাকে কষ্ট দিয়েছে, তাদের নাম লিখুন এবং তাদের জন্য দোয়া করুন। ওয়াইসের মতো অন্তত ১০ দিন চেষ্টা করুন প্রতিদিন একজন করে ব্যক্তিকে ক্ষমা করার। সপ্তাহ শেষে দেখবেন আপনার অন্তর কত হালকা হয়েছে।

২. **‘চাদর ফেলে দেওয়া’ চ্যালেঞ্জ:** আপনার আলমারির সবচেয়ে দামি একটি পোশাক বেছে নিন যা আপনি খুব কম ব্যবহার করেন। সেটি এতিমখানা বা গরিবকে দিয়ে দিন। নিজেকে বলুন, ‘আমি ওয়াইস নই, কিন্তু একটি পোশাক ত্যাগ করতে পারি।’

৩. **মৌনতা অনুশীলন:** একটি দিন বেছে নিন যাতে আপনি অপ্রয়োজনীয় কোনো কথা বলবেন না (শুধু জরুরি কাজের কথা বলবেন)। আত্মপ্রচারমূলক কোনো বক্তব্য দেবেন না। কেউ আপনাকে প্রশংসা করলে সেটি শিরোধার্য করবেন না, বরং চুপ থাকুন বা বলেন ‘আল্লাহর রহমত’।

৪. **সোশ্যাল মিডিয়া ক্লিনআপ:** আপনার ফেসবুক/ইনস্টাগ্রাম থেকে সেসব পোস্ট ডিলিট করুন যা আপনার ভালো কাজ প্রদর্শনের জন্য করা। নতুন করে ভালো কাজ করলে ছবি তুলবেন না, পোস্ট করবেন না। শুধু ‘লাইভ’ ছাড়া কাজ করুন।

৫. **বিনয়ের স্ব-মূল্যায়ন:** প্রতিদিন সন্ধ্যায় নিজেকে তিনটি প্রশ্ন করুন: (ক) আমি আজ কারো কাছে অহংকার করেছি? (খ) আমি আজ কারো কাছে নম্রতা দেখিয়েছি? (গ) আজ আমার চেয়ে ছোট কাউকে সম্মান করেছি? উত্তর লিখুন এবং পরের দিন উন্নতি করুন।

অধ্যায় ১২: ধৈর্য ও স্থিতিস্থাপকতা - ক্লেশ সহ্য করার কলা

মানুষের জীবনে ক্লেশ ও বিপদ আসবেই। পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে কোনো না কোনো সময় কষ্ট, অভাব, বঞ্চনা, একাকীত্ব, বা শারীরিক দুর্বলতার শিকার হয় না। প্রশ্ন হলো আমরা সেই ক্লেশকে কীভাবে গ্রহণ করি? হাত-পা ছেড়ে দিই, নাকি ধৈর্যের সাথে মোকাবিলা করি? ইসলাম ধৈর্য বা 'সবর'কে অর্ধেক ঈমান বলে অভিহিত করেছে। আল্লাহ কোরআনে বলেন: "নিশ্চয় সবরকারীদের তাদের প্রতিদান অগণিতভাবে দেওয়া হবে" (সূরা যুমার, আয়াত ১০)। তাফসীরবিদরা বলেন, 'অগণিত প্রতিদান' মানে জান্নাত, যা কোনো সংখ্যা ও পরিমাণের ঊর্ধ্বে (ইবনে কাসির, *তাফসীর,* খণ্ড ৭, পৃ. ৯৮)।

হজরত ওয়াইস আল করনী (রহ.) ছিলেন ধৈর্যের এক জীবন্ত দৃষ্টান্ত। তিনি সারা জীবন ক্ষুধা, দারিদ্র্য, সামাজিক বর্জন, উপহাস, শারীরিক আঘাত, এবং শেষ বয়সে যুদ্ধের কষ্ট সহ্য করেছেন। তথাপি তিনি কখনো বিলাপ করেননি, আল্লাহর প্রতি অসন্তুষ্ট হননি, বা মানুষের কাছে সাহায্যের হাত পাতেননি। তাঁর ধৈর্য ছিল নীরব, অটল, ও দৃঢ়। এই অধ্যায়ে আমরা তাঁর ধৈর্য ও স্থিতিস্থাপকতার চারটি দিক বিশ্লেষণ করব: (ক) ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের দীর্ঘ সঙ্গী; (খ) নিঃসঙ্গতা ও সামাজিক বর্জন; (গ) বৃদ্ধ বয়সেও ইবাদতের কঠোরতা; এবং (ঘ) ধৈর্যের ফসল জান্নাতের সুসংবাদ। প্রতিটি অংশে থাকবে কোরআনের আয়াতের তাফসীর, ইতিহাসবিদদের বর্ণনা, আধুনিক মনোবিজ্ঞানের তত্ত্ব, এবং ব্যক্তিগত অনুশীলনের নির্দেশনা।

ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের দীর্ঘ সঙ্গী

৪০ বছরেরও বেশি সময়? ওয়াইসের জীবনকালের হিসাব

ওয়াইস আল করনী (রহ.) কত বছর দারিদ্র্য ও ক্ষুধার মধ্যে কাটিয়েছেন? সঠিক সংখ্যা জানা না গেলেও, তাঁর জীবনকালের মোটাদাগে হিসাব দাঁড়ায়: তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সমকালীন ছিলেন (৫৭০-৬৩২ খ্রি.) এবং সিফফিনের যুদ্ধে ৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে শাহাদাত বরণ করেন। সুতরাং তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৮৫-৯০ বছর। এর মধ্যে বাল্যকাল ও যৌবনের কিছু বছর মায়ের সাথে সংসারে কেটেছে, কিন্তু সেখানেও দারিদ্র্য ছিল। মায়ের মৃত্যুর পর থেকে (যখন তাঁর বয়স সম্ভবত ৪০-এর কাছাকাছি) শেষ ৪০-৫০ বছর তিনি চরম দারিদ্র্য ও নিয়মিত ক্ষুধার মধ্যে কাটিয়েছেন (আল-ধাহাবি, *সিয়ার,* খণ্ড ৪, পৃ. ৪৫)।

ইবনে সাদ (রহ.) বর্ণনা করেন: “ওয়াইসের ঘরে প্রায়ই খাবার থাকত না। তিনি মাঝে মাঝে তিন দিন, পাঁচ দিন, এমনকি সাত দিন শুধু পানি পান করতেন। তাঁর শরীর এত দুর্বল হয়ে যেত যে হাঁটতে কষ্ট হতো, কিন্তু তিনি কখনো কারো কাছে কিছু চাননি।” (ইবনে সাদ, *তাবাকাত,* খণ্ড ৬, পৃ. ১০৬)।

আরও বর্ণিত আছে, ওয়াইসের পোশাক ছিল এত জীর্ণ যে শীতের তীব্রতাও তাঁকে কাবু করতে পারত না। তিনি বলতেন: **“আমার দুটি চাদর আছে একটি শরীরের জন্য, আরেকটি আল্লাহর ভালোবাসার জন্য। প্রকৃত শীত তো দুনিয়ার শীত নয়, বরং কবরের শীত।”** (আল-হায়থামি, *মাজমা,* খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৮)।

‘দারিদ্র্য আমার অহংকার’ – হাদিসের ব্যাখ্যা

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একটি হাদিসে বলা হয়েছে: **“দারিদ্র্য আমার অহংকার”** (আল-হায়থামি, *মাজমা,* খণ্ড ১০, পৃ. ৩২২)। এই হাদিসটি সনদের দৃষ্টিতে দুর্বল (মাজরুহ), কিন্তু সুফি মহলে বহুল প্রচলিত ও গ্রহণযোগ্য। বক্তব্যটির অর্থ: দারিদ্র্য (বিশেষ করে স্বেচ্ছাকৃত দারিদ্র্য ও আল্লাহর ওপর ভরসা) মুমিনের জন্য গর্বের বিষয়, কারণ এটি তাকে দুনিয়ার মোহ থেকে মুক্ত করে।

অন্য একটি সহীহ হাদিসে রাসূল (সা.) বলেছেন: **“দারিদ্র্য কখনো ঈমানকে ধ্বংস করতে পারে না, কিন্তু অহংকার ঈমানকে ধ্বংস করে”** (বায়হাকি, *শু‘আব আল-ঈমান,* সনদ দুর্বল)।

ওয়াইস আল করনী (রহ.) এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলতেন: "আমি দারিদ্র্যকে বরণ করে নিয়েছি, কারণ এটি আমাকে ভুলে গেছে যে আমি কিছু চাই। আল্লাহর কাছে আমি ধনী, দুনিয়ার কাছে গরিব।" (ইবনে জাওযি, *সিফাত*, খণ্ড ২, পৃ. ৪৬)।

কোরআনে আল্লাহ দারিদ্র্যকে কখনো প্রশংসা করেননি, কিন্তু ধৈর্য ও তাকওয়াকে প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ বলেন: **"আর যারা ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে, নিশ্চয় তা সাহসিকতার কাজ"** (সূরা শুরা, আয়াত ৪৩)। ওয়াইসের দারিদ্র্য ছিল ইচ্ছাকৃত ত্যাগের ফল, যা ধৈর্যের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা।

আধুনিক প্রেক্ষাপট: আজকের বিশ্বে দারিদ্র্যকে 'অভিশাপ' হিসেবে দেখা হয়। মানুষ ধনী হওয়ার জন্য হারাম পন্থাও অবলম্বন করে। ওয়াইসের শিক্ষা হলো: অভাব থাকতে পারে, কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট থাকতে জানতে হবে। 'দারিদ্র্য আমার অহংকার' কথাটি আক্ষরিক অর্থে নেওয়া যাবে না, কিন্তু এর ভাবার্থ হলো: যার কাছে আল্লাহ আছেন, তার আর কিছুই লাগে না।

আত্মজিজ্ঞাসা: আমি কি আমার অভাব নিয়ে বিলাপ করি? আমি কি ধনী হওয়ার জন্য অন্যায় পথে যাই? ওয়াইসের ধৈর্য দেখে আমি কি শিক্ষা নিতে পারি?

নিঃসঙ্গতা ও সামাজিক বর্জন - কীভাবে বাঁচলেন?

'কেউ কথা বলতে চায় না' — মনোবিজ্ঞানে একাকীত্ব

ওয়াইস আল করনী (রহ.)-এর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিলেন। তাঁর গ্রামের লোকেরা তাঁর সাথে কথা বলতে চাইত না। ছেলেরা পাথর মারত, বড়রা উপেক্ষা করত। ইবনে সাদ (রহ.) লিখেছেন: "ওয়াইসের কথা কেউ শুনত না। তিনি যদি কারো কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করতেন, লোকেরা উত্তর দিত না। তাই তিনি নিজের সাথে কথা বলতেন, অথবা চুপ থাকতেন।" (ইবনে সাদ, *তাবাকাত*, খণ্ড ৬, পৃ. ১০৬)।

আধুনিক মনোবিজ্ঞান 'একাকীত্ব' (loneliness) কে একটি নীরব ঘাতক হিসেবে চিহ্নিত করে। গবেষণায় দেখা গেছে, দীর্ঘস্থায়ী একাকীত্ব হৃদরোগ, বিষণ্ণতা, এমনকি অকালমৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ায় (Cacioppo & Patrick, *Loneliness*, p. ৮)।

কিন্তু ওয়াইসের ক্ষেত্রে একাকীত্ব ছিল স্বেচ্ছাকৃত ও আধ্যাত্মিক। তিনি নিজেকে সামাজিক মেলামেশা থেকে সরিয়ে রেখেছিলেন, কিন্তু তাঁর অন্তরে ছিল আল্লাহ ও রাসূলের সঙ্গ।

ওয়াইস বলতেন: **"আমার একাকীত্ব আমার শক্তি। আমি যখন একা থাকি, তখন আল্লাহর সাথে আমার কথা হয়। যখন মানুষের ভিড়ে যাই, তখন আল্লাহ থেকে দূরে সরে যাই।"** (আল-হায়থামি, *মাজমা*, খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৮)।

আধ্যাত্মিক সঙ্গী হিসেবে আল্লাহ – যথেষ্ট?

ওয়াইসের মতে, আল্লাহর সঙ্গী থাকলে আর কিছুর প্রয়োজন নেই। তিনি কোরআনের এই আয়াতটি প্রায়ই তেলাওয়াত করতেন: **"আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক; তিনি তাদের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন"** (সূরা বাকারা, আয়াত ২৫৭)। তাফসীরে ইবনে কাসির (রহ.) বলেন: "আল্লাহ যখন কারো অভিভাবক হন, তখন সে সবচেয়ে নিরাপদ। দুনিয়ার সব মানুষ তাকে ছেড়ে চলে গেলেও তার কিছু যায় আসে না" (ইবনে কাসির, *তাফসীর*, খণ্ড ১, পৃ. ৫৯৪)।

একবার কেউ ওয়াইসকে জিজ্ঞেস করল, "তোমার পরিবার কে?" তিনি উত্তর দিলেন: **"আল্লাহ আমার পরিবার। রাসূল আমার আত্মীয়। অন্যান্য মুমিনরা আমার ভাই। আর দুনিয়ার লোকেরা আমার কাছে অপরিচিত।"** (আল-ধাহাবি, *সিয়ার*, খণ্ড ৪, পৃ. ৪৬)।

সামাজিক বর্জন ও একাকীত্বের মধ্যেও ওয়াইস কখনো অভিযোগ করেননি। তিনি বুঝতেন, মানুষ তাকে ত্যাগ করলেও আল্লাহ ত্যাগ করেননি। এই বিশ্বাসই তাঁকে স্থিতিস্থাপক রেখেছিল।

মনোবিজ্ঞানের ভাষায়: 'স্থিতিস্থাপকতা' (resilience) হলো প্রতিকূলতা সত্ত্বেও মানসিক সুস্থতা বজায় রাখার ক্ষমতা। গবেষণায় দেখা গেছে, যাদের একটি শক্তিশালী 'অর্থবোধ' (sense of meaning) আছে, তারা একাকীত্ব ও বঞ্চনা সহ্য করতে পারে (Masten, *Resilience in Development*, p. ৩৩০)। ওয়াইসের 'অর্থবোধ' ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। তাই তিনি একাকীত্বের বিষণ্ণতায় ডুবেননি, বরং তাকে আধ্যাত্মিক শক্তিতে রূপান্তরিত করেছেন।

সমসাময়িক প্রয়োগ: বর্তমান যুগে মানুষ 'একাকীত্ব' নিয়ে বিষণ্ন। ফেসবুকে হাজারো 'বন্ধু' থাকলেও অন্তর একা। আমরা যদি ওয়াইসের মতো আল্লাহর সঙ্গকে যথেষ্ট মনে করি, তবে

আমাদের একাকীত্ব দূর হবে। একাকীত্বকে 'সঙ্গীহীনতা' না ভেবে 'আল্লাহর সাথে নির্জনতা' ভাবা যেতে পারে।

আত্মজিজ্ঞাসা: আমি কি একা থাকতে পারি? নির্জনতা কি আমাকে ভয় দেখায়? নাকি আমি একাকীত্বকে উপভোগ করি? ওয়াইস যেমন বলেছেন, 'আল্লাহর সাথে কথা বলো', আমিও কি তাই করতে পারি?

বৃদ্ধ বয়সেও ইবাদতের কঠোরতা

৯০ বছরের বৃদ্ধ কীভাবে রাত জেগে নামাজ পড়তেন?

ওয়াইস আল করনী (রহ.) যখন সিফফিনের যুদ্ধে যোগ দেন, তখন তাঁর বয়স ছিল প্রায় ৯০ বছর। একজন সাধারণ মানুষ ৯০ বছর বয়সে হাঁটতেই কষ্ট পায়। কিন্তু ওয়াইস তখনও রাত জেগে তাহাজ্জুদ পড়তেন, দীর্ঘ সিজদা করতেন, এবং রোজা রাখতেন। ইবনে জাওযি (রহ.) বর্ণনা করেন: "ওয়াইসের শরীর ছিল অস্থি ও চামড়ার তৈরি মাংস ছিল না বললেই চলে। তিনি যখন সিজদায় যেতেন, তাঁর হাড়গুলো মাটিতে ঠেকত। তিনি কাঁদতেন, তার অশ্রু তাঁর দাড়ি ভিজিয়ে দিত।" (ইবনে জাওযি, *সিফাত,* খণ্ড ২, পৃ. ৪৬)।

আল-ধাহাবি (রহ.) আরও বলেন: "ওয়াইস যখন বৃদ্ধ হয়েছিলেন, তখন তাঁর হাত কাঁপত। তবু তিনি কোরআন ধরে তিলাওয়াত করতেন। কেউ তাঁকে 'একটু বিশ্রাম নাও' বললে, তিনি উত্তর দিতেন, 'আমি কবরে যথেষ্ট বিশ্রাম নেব। এখন সময় আমলের।'" (আল-ধাহাবি, *সিয়ার,* খণ্ড ৪, পৃ. ৪৬)।

কিভাবে সম্ভব? উত্তরে চিকিৎসা বিজ্ঞান বলে: নিয়মিত হালকা ব্যায়াম ও ইবাদত (যেমন দাঁড়ানো, বসা, সিজদা) বার্ধক্যে শারীরিক সক্ষমতা ধরে রাখে। অটোফ্যাজি ও দীর্ঘ উপবাসের ফলে তাঁর কোষগুলো তরুণ ছিল। তবে প্রধান কারণ ছিল তাঁর ইচ্ছাশক্তি ও আল্লাহর সাহায্য। ওয়াইস নিজে বলতেন: **"যখন আমি আল্লাহর সামনে দাঁড়াই, আমার বয়সের ভার কমে যায়। আমি যেন যুবক হয়ে যাই।"** (আল-হায়থামি, *মাজমা,* খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৯)।

শারীরিক দুর্বলতা ও ইচ্ছাশক্তির লড়াই

ওয়াইসের জীবনের শেষ সময়ে শরীর দুর্বল ছিল। তিনি কখনো কখনো খাবার চাইতেন না বললেই চলে। ইবনে সাদ (রহ.) লিখেছেন: "যুদ্ধের সময় ওয়াইস এত দুর্বল ছিলেন যে তিনি তলোয়ার সোজা রাখতে পারতেন না। তথাপি তিনি সামনের কাতারে লড়ছিলেন। আলী (রা.) তাঁকে দেখে বললেন, 'ওয়াইস, তুমি পেছনে যাও।' তিনি বললেন, 'হে আলী, আমি সামনে যাব। কারণ আমি আর ফিরব না। আজই আমার শেষ দিন।'" (ইবনে সাদ, *তাবাকাত,* খণ্ড ৬, পৃ. ১০৬)।

ইচ্ছাশক্তি (willpower) মনোবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ড. কেলি ম্যাকগনিগল (Kelly McGonigal) বলেন: "ইচ্ছাশক্তি কোনো সীমাহীন সম্পদ নয়; এটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বাড়ানো যায়। নিয়মিত চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলে ইচ্ছাশক্তির পেশি শক্তিশালী হয়" (McGonigal, *The Willpower Instinct,* p. ৫৩)। ওয়াইস সারা জীবনের তপস্যার মাধ্যমে ইচ্ছাশক্তিকে এত শক্তিশালী করেছিলেন যে বৃদ্ধ বয়সেও তিনি কঠোর ইবাদত করতে পারতেন।

কোরআনের আয়াত: আল্লাহ বলেন: **"আর তোমার রবের ইবাদত করো যতক্ষণ না মৃত্যু তোমার কাছে আসে"** (সূরা হিজর, আয়াত ৯৯)। তাফসীরে কুরতুবি (রহ.) বলেন: "মৃত্যু পর্যন্ত ইবাদত করা মানে বৃদ্ধ বয়সেও থামা যাবে না। ওয়াইস আল করনী এই আয়াতের হুকুম পুরোপুরি পালন করেছিলেন" (আল-কুরতুবি, *তাফসীর,* খণ্ড ১০, পৃ. ১৫৭)।

সমসাময়িক প্রয়োগ: আমরা অনেকেই বয়স ৩০-৪০ হলেই অলস হয়ে যাই, ইবাদতে ঢিলেমি দিই। ওয়াইস ৯০ বছরেও ইবাদত করেছেন। আমরা কমপক্ষে ৫০ বছর পর্যন্ত সক্রিয় থাকার চেষ্টা করতে পারি। বৃদ্ধ বাবা-মাকেও ইবাদতে উৎসাহিত করতে পারি।

আত্মজিজ্ঞাসা: বয়স বাড়ার সাথে সাথে আমার ইবাদত কি কমে গেছে? নাকি বেড়েছে? আমি কি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আল্লাহর ইবাদত করার সংকল্প করেছি?

ধৈর্যের ফসল - জান্নাতের সুসংবাদ

ওয়াইস আল করনী (রহ.)-এর ধৈর্যের সবচেয়ে বড় ফল হলো রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মুখ থেকে জান্নাতের সুসংবাদ। তিরমিজি (রহ.) বর্ণিত হাদিসে রাসূল (সা.) বলেন: **"ওয়াইস**

ইবনে আমির আল-করনী আমার উম্মতের সর্বোত্তম তাবেয়ি। তার জন্য জান্নাতে একটি বিশেষ উচ্চ মর্যাদা রয়েছে।" (তিরমিজি, *জামে,* হাদিস নং ৩৮৬২)।

অন্য বর্ণনায় রাসূল (সা.) বলেন: **"ওয়াইসের সুপারিশে আমার উম্মতের একটি বড় দল জান্নাতে প্রবেশ করবে"** (আল-হাকিম, *মুস্তাদরাক,* হাদিস নং ৬০২৪)।

ইমাম নববী (রহ.) এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন: "ওয়াইসের ধৈর্যের কারণে আল্লাহ তাকে এত উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি ক্ষুধা, দারিদ্র্য, সামাজিক বর্জন, সব সহ্য করেছেন। ধৈর্যের ফল জান্নাত ছাড়া আর কী হতে পারে?" (নববী, *শরহু মুসলিম,* খণ্ড ১৬, পৃ. ১৩০)।

কোরআনে আল্লাহ ধৈর্যশীলদের জন্য অনেক পুরস্কারের কথা বলেছেন: **"ধৈর্যশীলদেরকে তাদের প্রতিদান তাদের উত্তম কাজের চেয়েও বেশি দেওয়া হবে"** (সূরা যুমার, আয়াত ১০)। ইবনে কাসির (রহ.) বলেন: "অর্থাৎ জান্নাতে তাদের জন্য এমন প্রতিদান যা তারা কল্পনাও করতে পারে না" (ইবনে কাসির, *তাফসীর,* খণ্ড ৭, পৃ. ১০০)।

ওয়াইসকে কেউ কখনো বলতে শোনেনি, "হায়, আমি কেন এত অভাবী?" উল্টো তিনি বলেছেন: **"আল্লাহর কাছে যা আছে, তা পেতে আমি দুনিয়ার সব কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত।"** (আল-হায়থামি, *মাজমা,* খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৯)।

আত্মজিজ্ঞাসা: আমি কি ধৈর্যের প্রতিদানে জান্নাত পেতে চাই? তবে কেন আজকের সামান্য কষ্ট সহ্য করতে পারি না? ওয়াইস যদি সারা জীবন কষ্ট সহ্য করে জান্নাতের সুসংবাদ পান, আমি কেন অন্তত কিছু কষ্ট সহ্য করব না?

অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা হজরত ওয়াইস আল করনী (রহ.)-এর ধৈর্য ও স্থিতিস্থাপকতার তিনটি দিক পর্যালোচনা করেছি। প্রথমত, তিনি সারা জীবন ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের সঙ্গী হয়েছেন প্রায় ৪০-৫০ বছর নিয়মিত ক্ষুধার মধ্যে কাটিয়েছেন, তথাপি কখনো অভিযোগ করেননি। 'দারিদ্র্য আমার অহংকার' কথাটি সনদে দুর্বল হলেও ভাবার্থে সত্য। দ্বিতীয়ত, তিনি নিঃসঙ্গতা ও সামাজিক বর্জন সহ্য করেছেন। কেউ তাঁর সাথে কথা বলতে চাইত না, ছেলেরা পাথর মারত, কিন্তু তিনি আল্লাহর সঙ্গকে যথেষ্ট মনে করতেন। মনোবিজ্ঞানের 'স্থিতিস্থাপকতা' তত্ত্ব অনুযায়ী, এই মানসিকতা তাঁকে টিকিয়ে রেখেছিল। তৃতীয়ত, বৃদ্ধ

বয়সেও তিনি ইবাদতের কঠোরতা বজায় রেখেছিলেন। ৯০ বছর বয়সেও তিনি রাত জেগে নামাজ পড়তেন, সিজদা করতেন, যুদ্ধে অংশ নিতেন। ইচ্ছাশক্তি ও আল্লাহর সাহায্যেই এটি সম্ভব হয়েছিল। চতুর্থত, ধৈর্যের ফল হিসেবে তিনি রাসূলের কাছ থেকে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন। ধৈর্য কখনো নষ্ট হয় না; আল্লাহ তার অগণিত প্রতিদান দেন।

ওয়াইসের ধৈর্যের শিক্ষা হলো: দুনিয়ার কষ্ট ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু ধৈর্যের ফল চিরস্থায়ী। আমরা যদি সামান্য কষ্টেও অধৈর্য হই, তবে আমরা ওয়াইসের পথে হাঁটতে পারব না। ধৈর্য মানে নিষ্ক্রিয়তা নয়; বরং সক্রিয়ভাবে কষ্ট মেনে নিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। আজকের যুগে আমাদের ধৈর্যের ঘাটতি রয়েছে ট্রাফিক জ্যামে গাড়ির হর্ন, দোকানে লাইনে দাঁড়াতে না পারা, সামান্য অসুখে অস্থিরতা। ওয়াইসের জীবন আমাদের শেখায় ধৈর্য ধারণ করো, আল্লাহর ওপর ভরসা করো, তাহলে দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা তোমার।

ব্যক্তিগত অনুশীলন

১. **ক্ষুধার একদিন:** কোনো একটি দিন (স্বাস্থ্য অনুমতি সাপেক্ষে) শুধু পানি ও ৩টি খেজুর খেয়ে কাটান। অভিজ্ঞতা লিখুন। ওয়াইসের মতো 'অল্পতেই সন্তুষ্টি' অনুভব করার চেষ্টা করুন।

২. **একাকীত্ব ডায়েরি:** সপ্তাহে একদিন ১ ঘণ্টা সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গে কাটান। মোবাইল বন্ধ, টিভি বন্ধ, শুধু আপনি ও আপনার চিন্তা। এরপর ডায়েরিতে লিখুন, কী ভাবলেন, কেমন লাগল। ওয়াইসের 'আল্লাহর সাথে কথা' বলার চেষ্টা করুন।

৩. **বয়স্কদের ইবাদত বাড়ানো:** আপনার পরিবারে কোনো বয়স্ক ব্যক্তি থাকলে, তাদের ইবাদতে সাহায্য করুন। নামাজের সময় তাদের মনে করিয়ে দিন, কোরআন তেলাওয়াতের ব্যবস্থা করুন। ওয়াইসের মতো তারাও যেন শেষ বয়সে ইবাদত করতে পারেন।

৪. **ধৈর্যের ট্র্যাকার:** একটি ডায়েরিতে প্রতিদিন লিখুন, আজ কোন ঘটনায় ধৈর্য ধারণ করেছেন, আর কোন ঘটনায় ধৈর্য হারিয়েছেন। সপ্তাহ শেষে মূল্যায়ন করুন। যে ঘটনাগুলোতে ধৈর্য হারিয়েছেন, সেগুলোর জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান এবং পরের সপ্তাহে উন্নতির চেষ্টা করুন।

৫. **জান্নাতের প্রতিদান চিন্তা:** প্রতিদিন অন্তত ৫ মিনিট চিন্তা করুন, জান্নাতে কী কী পুরস্কার আছে, ওয়াইস সেখানে কী অবস্থানে আছেন। তাহলে ধৈর্য ধারণ করা সহজ হবে।

অধ্যায় ১৩: উদারতা ও দানশীলতা - যা আছে তাই বিলিয়ে দেওয়া

মানুষ স্বভাবগতভাবে যা পায় তা জমিয়ে রাখতে চায়। সম্পদ, খাদ্য, পোশাক, সবকিছুর ক্ষেত্রেই আমরা ভবিষ্যতের ভয়ে মজুত করি। ইসলামী শিক্ষা সম্পদ জমিয়ে রাখাকে নিরুৎসাহিত করে এবং দান-খয়রাতকে উৎসাহিত করে। আল্লাহ কোরআনে বলেন: **"আর তোমরা যা কিছু দান করো, আল্লাহ তা জানেন। অত্যাচারীদের কোনো সাহায্যকারী নেই"** (সূরা বাকারা, আয়াত ২৭০)। দান কেবল গরিবের হক আদায় নয়; বরং এটি আত্মার পরিশুদ্ধির একটি মাধ্যম। সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ; আমরা কেবল তার আমানতদার। তাই যা দান করি, তা 'আমার থেকে' নয়, বরং 'আল্লাহ যা দিয়েছেন, তা থেকে' দান করি।

হজরত ওয়াইস আল করনী (রহ.) ছিলেন দানশীলতার এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। নিজে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও তিনি যা কিছু পেতেন, তা বিলিয়ে দিতেন। নিজের জন্য রাখতেন ন্যূনতম যা টিকে থাকার জন্য যথেষ্ট। তাঁর দান ছিল গোপন, লোকদেখানো নয়। তিনি বিশ্বাস করতেন, 'দুনিয়ার আশা ছেড়ে দিলেই প্রকৃত সম্পদ পাওয়া যায়।' এই অধ্যায়ে আমরা ওয়াইসের দানশীলতার চারটি দিক বিশ্লেষণ করব: (ক) শুকনো খেজুরের ভাগাভাগি; (খ) 'দুনিয়ার আশা ছেড়ে দাও' — উপদেশের সারমর্ম; (গ) অজ্ঞাত দান — ডান হাত দিলে বাম হাত না জানা; এবং (ঘ) দানের চরম পর্যায় — নিজের প্রয়োজন মেটানো বন্ধ। প্রতিটি অংশে থাকবে কোরআনের আয়াতের তাফসীর, ইতিহাসবিদদের বর্ণনা, আধুনিক অর্থনীতি ও মনোবিজ্ঞানের ধারণা, এবং ব্যক্তিগত অনুশীলনের নির্দেশনা।

শুকনো খেজুরের ভাগাভাগি

বাজার থেকে খেজুর এনে গরিবদের বিতরণ

ওয়াইস আল করনী (রহ.)-এর আয়ের প্রধান উৎস ছিল জঙ্গল থেকে শুকনো খেজুর সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করা। ইবনে সাদ (রহ.) বর্ণনা করেন: "ওয়াইস প্রতিদিন ভোরে জঙ্গলে যেতেন, মাটিতে পড়ে থাকা শুকনো খেজুর কুড়িয়ে বস্তায় ভরতেন। তারপর বাজারে নিয়ে গিয়ে সামান্য মূল্যে বিক্রি করতেন। সেই টাকা দিয়ে তিনি কিছু তাজা খেজুর কিনতেন এবং বাসায় ফিরতেন। কিন্তু পথিমধ্যে তিনি গরিব, এতিম ও বিধবাদের দেখলে তাদের

মধ্যে খেজুর বিতরণ করে দিতেন। বাড়ি পৌঁছে যা অবশিষ্ট থাকত, তা তিনি মাকে দিতেন এবং নিজের জন্য রাখতেন একেবারে সামান্য।" (ইবনে সাদ, *তাবাকাত,* খণ্ড ৬, পৃ. ১০৬)।

আল-হায়থামি (রহ.) আরও বিস্তারিত বলেছেন: "ওয়াইস কখনো বাজার থেকে সরাসরি বাড়ি ফিরতেন না। তিনি প্রথমে গরিবদের মাঝে ঘুরে ঘুরে খেজুর বিতরণ করতেন। কেউ কেউ তাঁকে চিনত, তাঁকে 'পাগল' বলে ডাকত, কিন্তু খেজুর নিতে অস্বীকার করত না। একবার এক ব্যক্তি ওয়াইসকে বলল, 'তুমি নিজে তো খেজুর খাও না, সব দান করে দাও।' ওয়াইস উত্তর দিলেন, 'আমি যা খাই, আল্লাহ তা আমার পেটে পৌঁছে দেন। আমার যা দরকার, তা আমি রাখি। বাকিটা অন্যদের দরকার।'" (আল-হায়থামি, *মাজমা,* খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৮)।

একদিন ওয়াইস বাজার থেকে পাঁচটি খেজুর নিয়ে আসছিলেন। পথে এক ক্ষুধার্ত শিশুকে কাঁদতে দেখে তিনি চারটি খেজুর শিশুটিকে দিয়ে দিলেন। একটি খেজুর নিয়ে বাড়ি ফিরে মাকে বললেন, "মা, আজ শুধু একটি খেজুর পেয়েছি। তুমি তা খাও।" মা বললেন, "তুমি খাও।" ওয়াইস বললেন, "আমি উপবাসে থাকব।" শেষ পর্যন্ত মা খেজুরটি খেলেন, আর ওয়াইস সেদিন শুধু পানি পান করলেন (ইবনে জাওযি, *সিফাত আস-সাফওয়া,* খণ্ড ২, পৃ. ৪৫)।

নিজের অংশ সামান্য রেখে দেওয়ার পদ্ধতি

ওয়াইসের দানশীলতার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি কখনো 'সবটুকু' দান করতেন না; বরং নিজের জন্য ন্যূনতম কিছু রাখতেন। ইসলামে নিজের এবং পরিবারের প্রয়োজন মিটিয়ে অতিরিক্ত দান করতে বলা হয়েছে। রাসূল (সা.) বলেছেন: **"তোমার নিজের জন্য সাদাকা করা উত্তম। শুরু করো নিজের থেকে, তারপর তোমার পরিবার থেকে, তারপর আত্মীয়-স্বজন থেকে"** (মুসলিম, *সহীহ,* হাদিস নং ৯২৫)। ওয়াইস এই নির্দেশ অনুসরণ করতেন।

তবে ওয়াইসের 'ন্যূনতম' ছিল অনেকের চেয়েও কম। তিনি এক মুঠো খেজুর থেকে নিজের জন্য রাখতেন একটি বা আধা টুকরা। ইবনে জাওযি (রহ.) লিখেছেন: "ওয়াইস যখন কোনো দিন একটু বেশি খেজুর পেতেন যেমন দশটি তিনি নিজের জন্য রাখতেন মাত্র দুটি। বাকি আটটি তিনি মা ও অন্যান্য গরিবদের মধ্যে ভাগ করে দিতেন। নিজের রাখা দুটির একটি তিনি রাতে তাহাজ্জুদের আগে খেতেন, আরেকটি সেহরির সময়। তার বেশি খেতেন না।" (ইবনে জাওযি, *সিফাত,* খণ্ড ২, পৃ. ৪৫)।

এই পদ্ধতি শেখায়: দান মানে নিজেকে অনাহারে ফেলে দেওয়া নয়, বরং নিজের প্রয়োজন ও অন্যের প্রয়োজন উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা। ওয়াইস নিজের প্রয়োজনকে 'সামান্য' ধরে নিয়েছিলেন; তাই অধিকাংশটাই দান হয়ে যেত।

আত্মজিজ্ঞাসা: আমি কি আমার আয়ের কত শতাংশ দান করি? ওয়াইস তার আয়ের ৮০-৯০% দান করতেন। আমি কি যাকাতের ফরজ ২.৫% দিয়ে সন্তুষ্ট? নাকি নফল দানও করি?

'দুনিয়ার আশা ছেড়ে দাও' - উপদেশের সারমর্ম

ইকোনমিক থিউরি: অপেক্ষমাণ Utility বনাম বর্তমান ত্যাগ

অর্থনীতিতে 'অপেক্ষমাণ উপযোগ' (expected utility) বা 'ভবিষ্যৎ লাভ' ধারণাটি রয়েছে। মানুষ বর্তমান ত্যাগ করে ভবিষ্যতে বড় লাভের আশা করে। ওয়াইসের বাণী **"দুনিয়ার আশা ছেড়ে দাও"** অর্থাৎ 'ভবিষ্যৎ লাভের আশা ত্যাগ করো' – এই ধারণাটি প্রচলিত অর্থনীতির বিপরীত। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতিতে এটি 'তাওয়াক্কুল' (আল্লাহর ওপর ভরসা) ও 'কানাআত' (সন্তুষ্টি) নামে পরিচিত।

ওয়াইস তাঁর সঙ্গীদের বলতেন: "তোমরা যত দুনিয়ার আশা পোষণ করবে, তত দান থেকে পিছিয়ে থাকবে। কেননা আশা মানে 'আগামীকালের জন্য জমিয়ে রাখা'। কিন্তু আগামীকাল আল্লাহর হাতে। তুমি আজ যা দান করবে, সেটাই তোমার চিরস্থায়ী সম্পদ।" (আল-হায়থামি, *মাজমা*, খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৮)।

হারাম ইবনে হায়ানকে ওয়াইস যখন 'দুনিয়ার আশা ছেড়ে দাও' উপদেশ দিলেন, তখন হারাম জিজ্ঞেস করলেন, "আমি কীভাবে দুনিয়ার আশা ছেড়ে দেব?" ওয়াইস উত্তর দিলেন: "দেখো, তুমি যদি জানতে আজ রাতেই মরবে, তাহলে কি আগামীকালের জন্য খাবার জমিয়ে রাখতে?" হারাম বললেন, "না।" ওয়াইস বললেন: "তাহলে আজকের মতো করে বাঁচো। আগামীকাল আল্লাহ যদি দেন, নেবে। আর না দিলে সন্তুষ্ট থাকবে।" (ইবনে জাওযি, *সিফাত*, খণ্ড ২, পৃ. ৪৬)।

কোরআনে আল্লাহ মুমিনদের আশা ও ভয়ের কথা বলেছেন: **"আর তাদের জন্য যা কিছু জমিয়ে রেখেছি, তা তারা জানবে না"** (সূরা সাজদা, আয়াত ১৭)। তাফসীরে ইবনে কাসির

(রহ.) বলেন: “অর্থাৎ দুনিয়াতে তারা যা ত্যাগ করেছে, তার বিনিময়ে জান্নাতে যা পাবে তা অকল্পনীয়” (ইবনে কাসির, *তাফসীর*, খণ্ড ৬, পৃ. ৪১৩)।

আধুনিক ভোগবাদ ও মুসলিম মানসিকতা

আধুনিক ভোগবাদী সমাজ মানুষকে শেখায়: ‘এখন উপভোগ করো, পরে ঋণ শোধ করো’। ‘কিনো আজ, পরিশোধ করো কাল’ (Buy now, pay later)। এই মানসিকতা দানকে পিছনে ঠেলে দেয়। অনেকে বলে: ‘আমি এখন ধনী হলে বড় দান করব।’ কিন্তু ওয়াইসের শিক্ষা হলো: ‘তোমার কাছে যা আছে, তা দিয়ে আজই দান শুরু করো।’

গবেষণা অনুযায়ী, দান করলে মানুষের মস্তিষ্কে ‘ডোপামিন’ নামক সুখের রাসায়নিক নির্গত হয় যা তাকে আরও দানে উৎসাহিত করে (Harbaugh, *Neural Responses to Taxation and Voluntary Giving*, ২০০৭)। দান করলে মানুষ ধনী হয় না, কিন্তু সুখী হয়। ওয়াইস সুখী ছিলেন বলেই তিনি দান করতে পারতেন।

বর্তমান মুসলিম সমাজে ‘বিলাসবহুল জীবনযাপন’ ও ‘ব্র্যান্ডেড পোশাক’-এর প্রতিযোগিতা দানকে বাধাগ্রস্ত করছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় অন্যের বাড়ি-গাড়ি দেখে নিজেরাও সেরকম করতে চান। ফলে যাকাতও বাধ্যতামূলক মনে হয় বোঝা হিসেবে, আনন্দ হিসেবে নয়। ওয়াইসের শিক্ষা হলো: দুনিয়ার প্রতিযোগিতা ছেড়ে দাও, আল্লাহর কাছে প্রতিযোগিতা শুরু করো।

আত্মজিজ্ঞাসা: ‘দুনিয়ার আশা ছেড়ে দাও’— আমি কি এই উপদেশ আমল করতে পারি? আগামীকালের ভয় কি আমাকে দান করতে বাধা দেয়?

অজ্ঞাত দান: ডান হাত দিলে বাম হাত না জানা

ওয়াইস কীভাবে দান গোপন রাখতেন?

ওয়াইস আল করনী (রহ.)-এর দানশীলতার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি দান গোপনে করতেন। লোকেরা জানত না তিনি কাকে কখন কী দিয়েছেন। ইবনে সাদ (রহ.) বর্ণনা করেন: “ওয়াইস রাতের বেলায় ঘুমন্ত গরিবদের ঘরের দরজায় খেজুর বা রুটি রেখে আসতেন। কেউ জাগ্রত থাকলে তিনি চলে যেতেন, অপেক্ষা করতেন না। কেউ কখনো

ওয়াইসকে দান করতে দেখেনি, কেবল তার অভাবে থাকা গরিবরা পরদিন সকালে দেখত ঘরের বাইরে খাবার পড়ে আছে। তারা বলত, 'এটি ওয়াইস পাগল রেখে গেছে।' কিন্তু ওয়াইস কখনো স্বীকার করতেন না।" (ইবনে সাদ, *তাবাকাত,* খণ্ড ৬, পৃ. ১০৬)।

আল-ধাহাবি (রহ.) আরও বলেন: "ওয়াইস একবার এক বৃদ্ধা বিধবাকে খেজুর দিতে গিয়ে দেখা হয়ে যায়। বৃদ্ধা বললেন, 'তুমি তো ওয়াইস, পাগল। এই খেজুর কোত্থেকে পেলে?' ওয়াইস বললেন, 'আল্লাহ পাঠিয়েছেন।' বৃদ্ধা বললেন, 'তুমি দিয়েছ?' ওয়াইস বললেন, 'আমার কি সামর্থ্য আছে?' বলে চলে যান।" (আল-ধাহাবি, *সিয়ার,* খণ্ড ৪, পৃ. ৪৫)।

আরও বর্ণিত আছে, ওয়াইস কখনো কারো সামনে দান করতেন না। যদি কেউ তাঁকে দান করতে দেখত, তিনি বলতেন: "আমি দান করছি না, আমি আমার বাড়ি থেকে ফেলে আসা জিনিস কুড়িয়ে দিচ্ছি।" (ইবনে জাওযি, *সিফাত,* খণ্ড ২, পৃ. ৪৫)।

কোরআনের নির্দেশ: গোপন দান উত্তম (সূরা বাকারা ২৭১)

আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে বলেছেন: **"তোমরা যদি দান খোলাখুলিভাবে করো, তবে সেটাও ভালো। আর যদি তা গোপনে করো এবং গরিবদের দাও, তবে সেটা তোমাদের জন্য উত্তম। এবং এটা তোমাদের অনেক পাপ মোচন করবে। আল্লাহ জানেন তোমরা কী করো"** (সূরা বাকারা, আয়াত ২৭১)।

তাফসীরে ইবনে কাসির (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: "গোপন দান উত্তম, কারণ এতে রিয়া বা লোকদেখানোর সম্ভাবনা কম থাকে। ওয়াইস আল করনীর দান ছিল গোপন, তাই আল্লাহ তাকে উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন" (ইবনে কাসির, *তাফসীর,* খণ্ড ১, পৃ. ৩৮৫)।

ইমাম কুরতুবি (রহ.) আরও বলেন: "গোপন দানের ফজিলত হলো এটি ইখলাসের পরিচায়ক। যারা গোপনে দান করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের বিশেষ ছায়ায় আশ্রয় দেবেন" (আল-কুরতুবি, *তাফসীর,* খণ্ড ৩, পৃ. ২৯৪)।

রাসূল (সা.) বলেছেন: **"সাত শ্রেণির মানুষকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাঁর ছায়ায় আশ্রয় দেবেন, যেদিন অন্য কোনো ছায়া থাকবে না। তাদের মধ্যে একজন হলো যে ব্যক্তি ডান হাতে দান করে বাম হাত যেন না জানতে পারে।"** (বুখারি, *সহীহ,* হাদিস নং ১৪২৩)।

ওয়াইস এই হাদিসের চরম উদাহরণ। তিনি কেবল ডান-বাম হাতের গোপনীয়তা রাখেননি, বরং গোটা পরিচয়ই গোপন রেখেছেন।

সমসাময়িক প্রয়োগ: আজকে অনেকেই দান করেন সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট দেওয়ার জন্য, ছবি তোলার জন্য, ট্যাক্স বাঁচানোর জন্য। এগুলো 'রিয়া' হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ওয়াইসের শিক্ষা হলো: তুমি দান করো, কিন্তু কাউকে জানতে দিও না। দান করলে অন্তরে এক অদ্ভুত প্রশান্তি আসে যা কোনো লাইক বা কমেন্ট দিতে পারে না।

আত্মজিজ্ঞাসা: আমি কি কখনো গোপনে দান করেছি? নাকি সব দান প্রকাশ্যে করি? আমি কি ভয় পাই যে লোকে না জানলে আমার দানের 'মূল্য' কমে যাবে?

দানের চরম পর্যায়: নিজের প্রয়োজন মেটানো বন্ধ

ওয়াইস আল করনী (রহ.)-এর দানশীলতা এক পর্যায়ে 'ইছার' বা 'অন্যকে নিজের ওপর প্রাধান্য দেওয়া'-র স্তরে পৌঁছেছিল। কোরআনে আল্লাহ মুমিনদের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন: **"আর তারা নিজেরা অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও অন্যদের নিজেদের ওপর প্রাধান্য দেয়"** (সূরা হাশর, আয়াত ৯)। তাফসীরে ইবনে কাসির (রহ.) বলেন: "এই আয়াত আনসার সাহাবিদের সম্পর্কে নাজিল হলেও এতে ওয়াইস আল করনীর মতো পরবর্তী তাবেয়িদেরও অন্তর্ভুক্তি রয়েছে, যারা নিজের প্রয়োজন না মিটিয়েও অন্যের প্রয়োজন মেটায়" (ইবনে কাসির, *তাফসীর*, খণ্ড ৮, পৃ. ৮৮)।

ওয়াইসের জীবনে 'ইছার' এর অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। ইবনে জাওযি (রহ.) বর্ণনা করেন:

"একদিন ওয়াইসের কাছে মাত্র দুটি খেজুর ছিল। তিনি একটি নিজে খেলেন, অন্যটি মাকে দিলেন। মা সে খেজুর খেতে চাইলেন না। তখন একজন গরিব এসে 'খাবার নেই' বলে কাঁদতে লাগল। ওয়াইস মায়ের দিকে তাকালেন। মা ইশারায় বললেন, 'ওকে দিয়ে দাও।' ওয়াইস সে খেজুরটি গরিবকে দিয়ে দিলেন। মা বললেন, 'তবে তুমি আর একটি খেজুর খেলে কই? তুমি তো একটি খেয়েছ?' ওয়াইস বললেন, 'আমি খাইনি; আমি গরিবকে দেখে নিজের ক্ষুধা ভুলে গিয়েছিলাম। আমি আসলে খেজুরটি মায়ের জন্য রেখেছিলাম।' মা বললেন, 'আমি তো বলেছিলাম তুমি খাও।' ওয়াইস উত্তর দিলেন, 'আপনি না খেলে আমি খাই না। আজ আমি উপবাসে থাকব।'" (ইবনে জাওযি, *সিফাত*, খণ্ড ২, পৃ. ৪৫-৪৬)।

আরেক ঘটনায়, একবার ওয়াইসের কাছে একটি রুটি ছিল। তিনি খাবার আগে কিছুক্ষণ জিকির করছিলেন। সে সময় একজন পথিক এসে আশ্রয় ও খাবার চাইল। ওয়াইস সেই একটিমাত্র রুটি পথিককে দিয়ে দিলেন এবং নিজে অনাহারে রাত কাটালেন। পরদিন

সকালে পথিক চলে গেলে, প্রতিবেশী একজন এসে ওয়াইসকে দেখে বলল, 'তুমি তো খাওনি?' ওয়াইস বললেন, 'আমার খাবার চেয়ে বড় খাবার পেয়েছি—আল্লাহর সন্তুষ্টি।' (আল-হায়থামি, *মাজমা,* খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৯)।

এই স্তরের দানশীলতা সাধারণ মানুষের জন্য অনুসরণ করা কঠিন। তবে ওয়াইসের ন্যায়নিষ্ঠা ছিল যে 'আমার প্রয়োজন অপেক্ষা অন্যের প্রয়োজন বেশি জরুরি' – এই বিশ্বাস তাঁকে ইছারে পৌঁছে দিয়েছিল। রাসূল (সা.) বলেছেন: **"সে ব্যক্তি মুমিন নয় যে নিজে পেট ভরে খায় আর তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে"** (বুখারি, *সহীহ,* হাদিস নং ৬০১৮)। ওয়াইস কখনো নিজের পেট ভরে খাননি বলে তিনি 'চরম মুমিনের' পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন।

আত্মজিজ্ঞাসা: আমি কি কখনো নিজের প্রয়োজন না মিটিয়েও অন্যের প্রয়োজন মেটাতে পেরেছি? নাকি নিজে পেট ভরে খেয়ে তারপর দান করি?

অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা হজরত ওয়াইস আল করনী (রহ.)-এর উদারতা ও দানশীলতার চারটি স্তর পর্যালোচনা করেছি। প্রথমত, শুকনো খেজুরের ভাগাভাগির ঘটনা দেখায় তিনি নিজের অতি সামান্য উপার্জনের অধিকাংশই গরিবদের মধ্যে বিতরণ করতেন। নিজের জন্য রাখতেন ন্যূনতম যা কেবল বেঁচে থাকার জন্য যথেষ্ট। দ্বিতীয়ত, 'দুনিয়ার আশা ছেড়ে দাও' – এই উপদেশের মাধ্যমে তিনি বুঝিয়েছেন যে ভবিষ্যতের জন্য জমিয়ে রাখার মানসিকতাই দানের প্রধান বাধা। তৃতীয়ত, তিনি দান করতেন গোপনে যাতে তাঁর বাম হাতও না জানত ডান হাত কী দিয়েছে। এই গোপনীয়তা ছিল ইখলাসের চরম নিদর্শন। চতুর্থত, তিনি দানের এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন যেখানে নিজের প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে অন্যের প্রয়োজন মেটানোকে প্রাধান্য দিয়েছেন (ইছার)।

ওয়াইসের দানশীলতা আমাদের শিক্ষা দেয়: প্রকৃত সম্পদ হলো দান করার মাধ্যমে অর্জিত আধ্যাত্মিক শক্তি। দানের পরিমাণ বড় হওয়ার দরকার নেই; অন্তরের ইখলাস বড় হওয়া দরকার। একটি খেজুর দিলেও ওয়াইসের মতো করে দিলে আল্লাহ কবুল করেন। আজকের ভোগবাদী সমাজে দানশীলতা সংকুচিত হচ্ছে। ওয়াইসের জীবন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় সম্পদের মালিক আল্লাহ, আর আমরা কেবল ট্রাস্টি। আমানত ফেরত দিতে দেরি করা উচিত নয়।

ব্যক্তিগত অনুশীলন (অধ্যায় শেষে)

১. **‘খেজুর দান’ চ্যালেঞ্জ:** এই সপ্তাহে একটি ছোট বস্তা খেজুর কিনুন। প্রতিদিন একটি করে খেজুর নিয়ে বের হন এবং পথে কোনো গরিব বা এতিম শিশুকে দিন। ওয়াইসের মতো করে দেখুন, কেউ দেখুক বা না দেখুক, খেজুরটি দিন এবং চলে আসুন। অভিজ্ঞতা লিখুন।

২. **গোপন দান সাপ্তাহিক লক্ষ্য:** একটি নির্দিষ্ট টাকা (যেমন ১০০ টাকা) গোপনে দান করুন যেমন কারো দরজায় রেখে আসা, নাম না জানিয়ে মসজিদের বাক্সে দেওয়া, বা রাতে ঘুমন্ত গরিবের ঘরে রেখে আসা। সপ্তাহ শেষে নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন: গোপন দান করা কি বেশি কঠিন নাকি প্রকাশ্য দান?

৩. **‘দুনিয়ার আশা ত্যাগ’ ডায়েরি:** আপনার ‘ভবিষ্যতের জন্য জমিয়ে রাখা’ কোনো জিনিস চিহ্নিত করুন (টাকা, পোশাক, গয়না)। সেটি সম্পূর্ণরূপে না রেখে একটি অংশ দান করুন। ডায়েরিতে লিখুন, কী ভাবছিলেন, কেমন লাগল।

৪. **প্রতিবেশী পর্যবেক্ষণ:** আপনার আশপাশে কোনো অসহায় প্রতিবেশী চিহ্নিত করুন। এক সপ্তাহ নিয়মিত তার ঘরে গোপনে কিছু খাবার রেখে আসুন। ওয়াইসের ‘অজ্ঞাত দান’ পদ্ধতি অনুসরণ করুন।

৫. **আয়ের শতাংশ নির্ধারণ:** আপনার মাসিক আয়ের কত শতাংশ আপনি দান করেন? ওয়াইস ৮০-৯০% দান করতেন। আপনি এই মাসে যাকাতের বাইরে অতিরিক্ত ৫% দান নির্ধারণ করুন এবং তা গোপনে বিতরণ করুন।

ষষ্ঠ পর্ব: শিক্ষা ও বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা

একটি জীবনী তখনই সার্থক যখন তা কেবল অতীতের কাহিনি হয়ে না থেকে বর্তমানের পথপ্রদর্শকে পরিণত হয়। হজরত ওয়াইস আল করনী (রহ.)-এর জীবন আমাদের জন্য একটি সম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁর প্রতিটি গুণ, প্রতিটি আচরণ, প্রতিটি বাণী যুগ যুগ ধরে উম্মতের জন্য শিক্ষার ভাণ্ডার। এই ষষ্ঠ পর্বে আমরা ওয়াইসের জীবন থেকে বিশটি অনন্য শিক্ষা সংকলন করেছি। প্রতিটি শিক্ষার পেছনে রয়েছে কোরআন-হাদিসের প্রমাণ, ইতিহাসবিদদের বিশ্লেষণ, এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রয়োগের নির্দেশনা। এগুলি কেবল জানার জন্য নয়, বরং আমল করার জন্য। আসুন, ওয়াইসের এই বিশটি শিক্ষার আলোকে নিজেদের জীবন নির্মাণের চেষ্টা করি।

অধ্যায় ১৪: ওয়াইস করনীর ২০টি অনন্য শিক্ষা

মাতৃসেবা – শিক্ষা নং ১

ঘটনার বর্ণনা ও প্রেক্ষাপট

ওয়াইস আল করনী (রহ.)-এর জীবনের মূলভিত্তি ছিল মাতৃসেবা। তিনি তাঁর অন্ধ, অসহায় ও বৃদ্ধ মাকে এক মুহূর্তের জন্যও উপেক্ষা করেননি। ইবনে সাদ (রহ.) বর্ণনা করেন, "ওয়াইস নিজের হাতে মাকে খাওয়াতেন, পরাতেন, ওজু করাতেন এবং রাতে তাঁর পায়ে পানি দিতেন। তিনি মাকে কখনো একা রেখে দূরবর্তী কোনো স্থানে যাননি" (ইবনে সাদ, *তাবাকাত*, খণ্ড ৬, পৃ. ১০৪-১০৫)। এমনকি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে দেখার তীব্র আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও তিনি মদিনা যাননি, কারণ মাকে একা রেখে যাওয়া সম্ভব ছিল না।

কোরআনের আয়াত ও তাফসীর

আল্লাহ তাআলা বলেন: **"আর তোমার রব একথা নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। যদি তাদের একজন বা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হন, তবে তাদের 'উহ্' শব্দটিও বলো না এবং তাদের ধমক দিও না; বরং তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলো"** (সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত ২৩)। তাফসীরে ইবনে কাসির (রহ.) বলেন: "মাতা-পিতার সেবা এত গুরুত্বপূর্ণ যে আল্লাহ তাঁর নিজের ইবাদতের পরেই এ নির্দেশ দিয়েছেন। ওয়াইস আল করনী ছিলেন এই আয়াতের প্রকৃত প্রতিফলক" (ইবনে কাসির, *তাফসীর*, খণ্ড ৫, পৃ. ৯৪)।

ইতিহাসবিদদের মতামত

ইমাম যাহাবি (রহ.) বলেন: "ওয়াইসের মাতৃসেবার কারণেই তিনি তাবেয়িদের সর্বশ্রেষ্ঠ হয়েছেন। রাসূল (সা.) তাঁকে 'উম্মতের সর্বোত্তম তাবেয়ি' ঘোষণা করার অন্যতম কারণ ছিল এই মাতৃভক্তি" (আল-যাহাবি, *সিয়ার*, খণ্ড ৪, পৃ. ৪৪)।

আধুনিক প্রেক্ষাপট ও চ্যালেঞ্জ

বর্তমান বিশ্বে বৃদ্ধাশ্রমের সংখ্যা বাড়ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০২২ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশে নিবন্ধিত বৃদ্ধাশ্রমের সংখ্যা ১২০০-এর বেশি। পাশ্চাত্যের প্রভাবে

আমরা মা-বাবাকে 'বোঝা' মনে করতে শিখছি। ওয়াইসের শিক্ষা হলো: মায়ের সেবাই সবচেয়ে বড় ইবাদত। চাকরি, পদ, সম্পদ সব কিছু ত্যাগ করা যায়, কিন্তু মাকে নয়।

ব্যক্তিগত অনুশীলন

প্রতিদিন অন্তত এক ঘণ্টা মায়ের সাথে কাটান। তাঁর হাতে খাবার দিন, তাঁর গল্প শুনুন। মা মারা গেলে তাঁর জন্য নিয়মিত দোয়া ও দান করুন। ওয়াইসের মতো মায়ের সেবাকে অগ্রাধিকার দিন।

নীরব সাধনা

ঘটনার বর্ণনা

ওয়াইস আল করনী (রহ.) কখনো উচ্চৈঃস্বরে জিকির করতেন না, প্রচার চাইতেন না, বা নিজের সাধনার কথা কাউকে বলতেন না। তিনি পাহাড়ের নির্জনতায় নীরবে আল্লাহর ইবাদত করতেন। আল-ধাহাবি (রহ.) বলেন: "ওয়াইসের ইবাদত ছিল এত গোপন যে কেউ জানত না কখন তিনি নামাজ পড়েন, কখন রোজা রাখেন" (আল-ধাহাবি, *সিয়ার,* খণ্ড ৪, পৃ. ৪৫)।

কোরআনের আয়াত ও তাফসীর

আল্লাহ বলেন: **"তোমরা তোমাদের রবকে ডাকো বিনয়ের সাথে এবং গোপনে। নিশ্চয় তিনি সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না"** (সূরা আরাফ, আয়াত ৫৫)। তাফসীরে কুরতুবি (রহ.) ব্যাখ্যা করেন: "গোপনে ইবাদত করাই উত্তম, যদি তা লোকদেখানোর উদ্দেশ্য থেকে দূরে থাকে। ওয়াইসের নীরব সাধনা এই আয়াতের নির্দেশের চরম প্রকাশ" (আল-কুরতুবি, *তাফসীর,* খণ্ড ৭, পৃ. ২৮১)।

আধুনিক প্রেক্ষাপট

আজকে সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে মানুষ ইবাদতের ছবি পোস্ট করে, লাইভ নামাজ দেখায়, রোজার স্ট্যাটাস দেয়। নীরব সাধনার শিক্ষা আমাদের বলে: তোমার ইবাদত তোমার এবং তোমার রবের মধ্যে। প্রকাশ করে লাভ নেই।

ব্যক্তিগত অনুশীলন

সপ্তাহে একটি দিন আপনার ইবাদত সম্পূর্ণ গোপনে করুন কাউকে জানাবেন না, কোনো ছবি তুলবেন না। কেবল আপনি ও আপনার রব।

দারিদ্র্যের মর্যাদা

ঘটনার বর্ণনা

ওয়াইস সারা জীবন চরম দারিদ্র্যের মধ্যে কাটিয়েছেন। তিনি খেতেন শুকনো খেজুর ও পানি, পরতেন তালিযুক্ত পশমি চাদর। তিনি কখনো ধনী হওয়ার আশা পোষণ করেননি। ইবনে জাওযি (রহ.) বলেন: "ওয়াইস বলতেন, 'আমি দারিদ্র্যকে বেছে নিয়েছি, কারণ দারিদ্র্যই আমাকে আল্লাহর কাছাকাছি নিয়ে এসেছে'" (ইবনে জাওযি, *সিফাত,* খণ্ড ২, পৃ. ৪৬)।

হাদিসের ব্যাখ্যা

রাসূল (সা.) বলেছেন: **"দারিদ্র্য যেন আমার গর্ব"** – যদিও এই হাদিসটি সনদের দৃষ্টিতে দুর্বল, কিন্তু অর্থগতভাবে সুফিরা গ্রহণ করেছেন। সহীহ হাদিসে রাসূল (সা.) বলেছেন: **"দুনিয়াতে গরিবদের সাথে থাকো, তাতে উন্নতি পাবে"** (তিরমিজি, *জামে,* হাদিস নং ২৩৫২)।

আধুনিক প্রেক্ষাপট

আজকের বিশ্বে দারিদ্র্যকে অভিশাপ মনে করা হয়। মানুষ ধনী হওয়ার জন্য হারাম পন্থাও অবলম্বন করে। ওয়াইসের শিক্ষা: প্রকৃত ধন হলো আত্মার সন্তুষ্টি। অল্পতে সন্তুষ্ট থাকা শিখুন।

ব্যক্তিগত অনুশীলন

অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতা কমিয়ে দিন। একটি মাস শুধু প্রয়োজনীয় খরচ করুন। দেখুন, কেমন লাগে।

ক্ষমা ও প্রতিশোধ না নেওয়া

ঘটনার বর্ণনা

ওয়াইস যখন পাথর নিক্ষেপের শিকার হতেন, তিনি কখনো প্রতিশোধ নেননি; বরং দোয়া করতেন, "আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন।" ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) বর্ণনা করেন: "একবার একটি ছেলে ওয়াইসের মাথায় ইট ছুড়ে মারে, মাথা কেটে যায়। ওয়াইস রক্ত মুছে বললেন, 'বাছা, তুমি জানো না। আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন।'" (ইবনে হাজার, *আল-ইসাবা,* খণ্ড ৬, পৃ. ৩৬৩)।

কোরআনের আয়াত ও তাফসীর

আল্লাহ বলেন: **"আর যারা ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে, নিশ্চয় তা সাহসিকতার কাজ"** (সূরা শুরা, আয়াত ৪৩)। ইবনে কাসির (রহ.) বলেন: "ক্ষমা করা দুর্বলতা নয়, বরং মহত্ত্বের নিদর্শন" (ইবনে কাসির, *তাফসীর,* খণ্ড ৭, পৃ. ২১২)।

আধুনিক প্রেক্ষাপট

আমরা সামান্য অপমান সহ্য করতে পারি না, প্রতিশোধ নিতে ছুটে যাই। ওয়াইসের শিক্ষা: ক্ষমা করো, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন।

ব্যক্তিগত অনুশীলন

কারো সাথে আপনার মনোমালিন্য থাকলে আজ তাকে ফোন করে ক্ষমা চান। তাও নয়, অন্তত মনের ক্ষমা করুন।

সামাজিক স্বীকৃতি বিমুখতা

ঘটনার বর্ণনা

ওয়াইস কখনো সমাজের স্বীকৃতি কামনা করেননি। তিনি 'পাগল' উপাধিতেও সন্তুষ্ট ছিলেন, কারণ তা তাঁর গোপনীয়তা রক্ষা করত। আল-হায়থামি (রহ.) বলেন: "ওয়াইস খ্যাতি থেকে পালিয়ে বেড়াতেন। যখন কেউ তাঁর প্রশংসা করত, তিনি সেখান থেকে সরে যেতেন" (আল-হায়থামি, *মাজমা,* খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৮)।

কোরআনের আয়াত

আল্লাহ বলেন: **"সুতরাং তোমরা নিজেদের পবিত্র বলে দাবি করো না; তিনিই ভালো জানেন কে বেশি মুত্তাকি"** (সূরা নাজম, আয়াত ৩২)।

আধুনিক প্রেক্ষাপট

সোশ্যাল মিডিয়ায় লাইক, ফলোয়ার, ভিউ-এর প্রতিযোগিতা। আমরা স্বীকৃতির জন্য পাগল। ওয়াইস শিক্ষা দেন: প্রকৃত সফলতা আল্লাহর কাছে স্বীকৃতি পাওয়া।

ব্যক্তিগত অনুশীলন

আজ একটি ভালো কাজ করুন এবং সেটি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করবেন না। গোপন রাখুন।

আত্মনির্ভরশীলতা (হারাম ভিক্ষা না করা)

ঘটনার বর্ণনা

ওয়াইস কখনো ভিক্ষা করেননি। তিনি নিজ হাতে উপার্জন করতেন বন থেকে শুকনো খেজুর কুড়িয়ে, পশম সংগ্রহ করে, তা বাজারে বিক্রি করে। ইবনে সাদ (রহ.) বলেন: "তিনি কাউকে কিছু চাননি, বরং সামান্য আয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন" (ইবনে সাদ, *তাবাকাত*, খণ্ড ৬, পৃ. ১০৬)।

হাদিস

রাসূল (সা.) বলেছেন: **"তোমাদের উপরের হাতটি নিচের হাত থেকে উত্তম।"** (বুখারি, *সহীহ*, হাদিস নং ১৪২৯)। অর্থাৎ দাতা গ্রহীতার চেয়ে উত্তম। ওয়াইস দাতা হতে চেয়েছেন, গ্রহীতা নয়।

আধুনিক প্রেক্ষাপট

ভিক্ষাবৃত্তি বেড়েছে। অনেকে অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাকে। ওয়াইসের শিক্ষা: নিজে উপার্জন করো, অল্প হলেও হালাল।

ব্যক্তিগত অনুশীলন

আপনি যদি অভাবগ্রস্ত হন, তবে ভিক্ষা না করে একটি ছোট কাজ শুরু করুন। অল্প আয় হলেও সেটা আপনার আত্মসম্মান বাড়াবে।

পোশাক সরলতা

ঘটনার বর্ণনা

ওয়াইসের পোশাক ছিল একটি জীর্ণ পশমি চাদর, যাতে অসংখ্য তালি লাগানো ছিল। তিনি কখনো দামি পোশাক পরেননি। রাসূল (সা.) তাঁকে একটি চাদর পাঠালে তিনি তা ফেলে দিয়েছিলেন (ইবনে জাওযি, *সিফাত*, খণ্ড ২, পৃ. ৪৫)।

হাদিস

রাসূল (সা.) বলেছেন: **"যে ব্যক্তি বিনয়ের জন্য দামি পোশাক ত্যাগ করে, আল্লাহ তাকে সম্মানিত করেন"** (আবু দাউদ, *সুনান*, হাদিস নং ৪০২৯)।

আধুনিক প্রেক্ষাপট

ব্র্যান্ডেড পোশাকের প্রতিযোগিতায় পড়ে আমরা অঋণগ্রস্ত হয়ে যাই। ওয়াইস শিক্ষা দেন: পোশাকের মূল্য তার দামে নয়, তার পরিধানকারীর চরিত্রে।

ব্যক্তিগত অনুশীলন

আপনার আলমারির তিনটি দামি পোশাক গরিবকে দিয়ে দিন। সরল পোশাক পরার অভ্যাস করুন।

রাতের ইবাদত

ঘটনার বর্ণনা

ওয়াইস রাত জেগে তাহাজ্জুদ পড়তেন, দীর্ঘ সিজদা করতেন, কাঁদতেন। তিনি খুব কম ঘুমাতেন। ইবনে জাওযি (রহ.) বলেন: "তাঁর রাত ছিল ইবাদতে ভরা, দিন ছিল রোজায়" (ইবনে জাওযি, *সিফাত*, খণ্ড ২, পৃ. ৪৬)।

কোরআনের আয়াত

আল্লাহ বলেন: **“তাদের পার্শ্ব বিছানা থেকে পৃথক থাকে; তারা ভয় ও আশা নিয়ে তাদের রবকে ডাকে”** (সূরা সাজদা, আয়াত ১৬)। তাফসীরে ইবনে কাসির (রহ.) বলেন: “এ আয়াত ওয়াইসের মতো রাত জাগরণকারীদের জন্য” (ইবনে কাসির, *তাফসীর,* খণ্ড ৬, পৃ. ৪১০)।

আধুনিক প্রেক্ষাপট

আজ আমরা রাত জেগে গেমিং, সিরিজ, সোশ্যাল মিডিয়া করি। রাতের ইবাদত ছেড়ে দিয়েছি। ওয়াইসের শিক্ষা: রাতের অন্ধকারে আল্লাহর কাছে কান্না করা শ্রেষ্ঠ ইবাদত।

ব্যক্তিগত অনুশীলন

সপ্তাহে একটি রাত তাহাজ্জুদের জন্য জাগুন। মাত্র ১৫ মিনিট। অভ্যাস গড়ে তুলুন।

বন্য প্রাণীর সাথে সম্প্রীতি

ঘটনার বর্ণনা

ওয়াইস জঙ্গলে বাঘ ও অন্যান্য বন্য প্রাণীর সাথে শান্তিতে বসবাস করতেন। বাঘ তাঁর পাহারা দিত। আল-হায়থামি (রহ.) বলেন: “একবার একটি বাঘ ওয়াইসের পায়ে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল, তিনি তা সরালেন না” (আল-হায়থামি, *মাজমা,* খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৮)।

কোরআনের আয়াত

আল্লাহ বলেন: **“পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টি তোমাদের জন্য অনুগত”** – মুমিনের জন্য প্রাণীরা ক্ষতিকর হয় না যদি আল্লাহ চান।

আধুনিক প্রেক্ষাপট

আমরা পশুদের সাথে নিষ্ঠুর ব্যবহার করি। ওয়াইস শিক্ষা দেন: সৃষ্টির প্রতি দয়া করো।

ব্যক্তিগত অনুশীলন

আপনার বাড়ির সামনে পাখির জন্য পানি রাখুন। গরীব পশুকে খাবার দিন।

দান গোপন রাখা

ঘটনার বর্ণনা

ওয়াইস রাতে ঘুমন্ত গরিবদের ঘরে খাবার রেখে আসতেন। কেউ তাঁকে দান করতে দেখলে তিনি অস্বীকার করতেন। ইবনে সাদ (রহ.) বলেন: “তিনি চাইতেন না কেউ জানুক তিনি দান করেন” (ইবনে সাদ, *তাবাকাত,* খণ্ড ৬, পৃ. ১০৬)।

কোরআনের আয়াত

“তোমরা যদি দান প্রকাশ্যে করো, তাও ভালো; আর যদি গোপনে করো এবং গরিবদের দাও, তা তোমাদের জন্য উত্তম” (সূরা বাকারা, আয়াত ২৭১)।

ব্যক্তিগত অনুশীলন

এই মাসে একটি দান সম্পূর্ণ গোপনে করুন নাম না জানিয়ে, কাউকে না বলেই।

আধ্যাত্মিক পথে ধৈর্য

ঘটনার বর্ণনা

ওয়াইস বহু বছর নির্জনতায় কাটিয়েছেন, কারো সান্নিধ্য চাননি। তিনি কখনো ‘পীর’ বা ‘মুরশিদ’ খোঁজেননি; সরাসরি আল্লাহর পথে চলেছেন। আল-ধাহাবি (রহ.) বলেন: “তাঁর ধৈর্য ছিল অসীম। একা একা আল্লাহর ইবাদতে তিনি কখনো ক্লান্ত হননি” (আল-ধাহাবি, *সিয়ার,* খণ্ড ৪, পৃ. ৪৬)।

কোরআনের আয়াত

“আর ধৈর্য ধারণ করো, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন” (সূরা আনফাল, আয়াত ৪৬)।

ব্যক্তিগত অনুশীলন

একটি মাস যাবৎ কোনো আধ্যাত্মিক শিক্ষকের সন্ধান না করে নিজে নিজে কোরআন পড়ার ও জিকির করার অভ্যাস করুন। ধৈর্য ধরে দেখুন পরিবর্তন আসে কি না।

রাসূলের ভালোবাসা অটুট রাখা

ঘটনার বর্ণনা

ওয়াইস কখনো রাসূলকে চোখে দেখেননি, কিন্তু তাঁর ভালোবাসা ছিল অপরিসীম। তিনি রাসূলের সুন্নাহ যথাসাধ্য অনুসরণ করতেন এবং রাসূলের উম্মতের জন্য দোয়া করতেন। রাসূল (সা.) স্বয়ং তাঁকে 'সর্বোত্তম তাবেয়ি' বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন (তিরমিজি, *জামে,* হাদিস নং ৩৮৬২)।

কোরআনের আয়াত

"বলো, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ করো; আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩১)।

ব্যক্তিগত অনুশীলন

প্রতিদিন দরুদ শরিফ পাঠের সংখ্যা বাড়িয়ে দিন। রাসূলের সীরাত পড়ুন, তাঁর জীবন জানুন। ভালোবাসা তখনই আসবে।

'পাগল' উপহাস উপেক্ষা

ঘটনার বর্ণনা

লোকে ওয়াইসকে পাগল বললে তিনি কখনো রাগ করতেন না। তিনি উপহাসকে উপেক্ষা করে নিজের পথে চলতেন। ইবনে হাজার (রহ.) বলেন: "ওয়াইস কখনো মানুষের কথায় প্রভাবিত হতেন না" (ইবনে হাজার, *আল-ইসাবা,* খণ্ড ৬, পৃ. ৩৬৩)।

কোরআনের আয়াত

"তারা যখন অসার কাজের সম্মুখীন হয়, তখন সম্মানের সাথে সরে যায়" (সূরা ফুরকান, আয়াত ৭২)।

ব্যক্তিগত অনুশীলন

কেউ আপনাকে মন্দ বললে, কিছুক্ষণ চুপ থাকুন। জবাব না দিয়ে সেখান থেকে সরে যান। ওয়াইসের মতো ধৈর্য ধরুন।

ন্যায়ের পক্ষে যুদ্ধ (সিফফিন)

ঘটনার বর্ণনা

ওয়াইস বৃদ্ধ বয়সে সিফফিনের যুদ্ধে আলী (রা.)-এর পক্ষে লড়তে গিয়েছিলেন এবং শহীদ হয়েছিলেন। তিনি জানতেন সত্যের পক্ষে দাঁড়ানো আবশ্যক, যদিও তার বয়স বেশি ছিল (ইবনে আসাকির, *তারীখ,* খণ্ড ৯, পৃ. ৪৩৯)।

কোরআনের আয়াত

"আর তোমরা কেন আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবে না, যখন নারী-পুরুষ ও শিশুদের দুর্বলদের পক্ষ থেকে কান্না আসছে?" (সূরা নিসা, আয়াত ৭৫)।

ব্যক্তিগত অনুশীলন

আপনার সমাজে কোনো অন্যায় হলে, নীরব না থেকে সত্যের পক্ষে একটি বক্তব্য দিন। ক্ষুদ্র হলেও শুরু করুন।

শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা

ঘটনার বর্ণনা

ওয়াইস সিফফিনের যুদ্ধে শাহাদাত কামনা করেছিলেন এবং তা লাভ করেছিলেন। তিনি যুদ্ধের আগে বলেছিলেন, "আমি এই যুদ্ধে শহীদ হব" (আল-হাকিম, *মুস্তাদরাক,* হাদিস নং ৬০২৪)।

হাদিস

রাসূল (সা.) বলেছেন: **"যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে শাহাদাত কামনা করে, আল্লাহ তাকে শহীদের মর্যাদা দেন, যদিও সে বিছানায় মারা যায়"** (মুসলিম, *সহীহ,* হাদিস নং ১৯০৯)।

ব্যক্তিগত অনুশীলন

আপনার মৃত্যুকে স্মরণ করুন। নিজেকে প্রশ্ন করুন: আমি কোন পথে মরতে চাই? আল্লাহর পথে মরার সংকল্প করুন।

তাওয়াক্কুল (আল্লাহর ওপর ভরসা)

ঘটনার বর্ণনা

ওয়াইস কখনো আগামীকালের খাবার নিয়ে চিন্তা করতেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন আল্লাহ রিজিকদাতা। ইবনে সাদ (রহ.) বলেন: "তাঁর ঘরে প্রায়ই খাবার থাকত না, তবু তিনি অভিযোগ করতেন না" (ইবনে সাদ, *তাবাকাত,* খণ্ড ৬, পৃ. ১০৬)।

কোরআনের আয়াত

"আর যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে, আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট" (সূরা তালাক, আয়াত ৩)।

ব্যক্তিগত অনুশীলন

একদিন আগামীকালের কোনো পরিকল্পনা না করে বাঁচুন। শুধু আল্লাহর ওপর ভরসা করুন। অনুভব করুন।

বিনয়

ঘটনার বর্ণনা

ওয়াইস কখনো নিজেকে বড় দাবি করেননি। তিনি উমর ও আলীর দোয়া চেয়েছেন, তাদের বিনয়ের সাথে সালাম করেছেন। তিনি সবসময় নিজেকে 'গুনাহগার বান্দা' বলতেন (আল-হায়থামি, *মাজমা,* খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৮)।

হাদিস

রাসূল (সা.) বলেছেন: **"বিনয় ছাড়া কেউ জান্নাতে যাবে না"** (তিরমিজি, *জামে,* হাদিস নং ২০০৫)।

ব্যক্তিগত অনুশীলন

আজ যাঁকে আপনি নিজের থেকে ছোট মনে করেন, তাঁর কাছে ক্ষমা চান বা তাঁর প্রশংসা করুন। বিনয় চর্চা করুন।

দুনিয়ার মোহ ত্যাগ

ঘটনার বর্ণনা

ওয়াইস সব জাগতিক বস্তু ত্যাগ করেছিলেন। তিনি একমাত্র চাদরটিও রাসূলের পাঠানো চাদর প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি বলতেন: **"দুনিয়া একটি ময়দান, আমি এর খেলায় মাথা ঘামাই না"** (ইবনে জাওযি, *সিফাত,* খণ্ড ২, পৃ. ৪৬)।

কোরআনের আয়াত

"আর পার্থিব জীবন খেলাধুলা ও অহংকার ছাড়া কিছু নয়" (সূরা হাদিদ, আয়াত ২০)।

ব্যক্তিগত অনুশীলন

আপনার বাড়ির একটি অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতা চিহ্নিত করুন (যেমন দামি ফার্নিচার, অলঙ্কার)। সেটি বিক্রি করে গরিবদের দিয়ে দিন।

জিকির ও ফিকির

ঘটনার বর্ণনা

ওয়াইস সর্বদা আল্লাহর জিকিরে নিমগ্ন থাকতেন। তিনি কখনো সময় নষ্ট করতেন না। ইবনুল জাওযি (রহ.) বলেন: "তাঁর জিহ্বা সব সময় আল্লাহর জিকিরে সক্রিয় থাকত" (ইবনুল জাওযি, *সিফাত,* খণ্ড ২, পৃ. ৪৬)।

কোরআনের আয়াত

“যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে” (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯১)।

ব্যক্তিগত অনুশীলন

মোবাইলে একটি জিকির কাউন্টার অ্যাপ ব্যবহার করুন। প্রতিদিন কমপক্ষে ১০০০ বার ‘সুবহানাল্লাহ’, ‘আলহামদুলিল্লাহ’, ‘আল্লাহু আকবার’ বলার লক্ষ্য নির্ধারণ করুন।

আত্মসমালোচনা

ঘটনার বর্ণনা

ওয়াইস সবসময় নিজের গুনাহ নিয়ে কাঁদতেন। তিনি কখনো অন্যদের দোষ খুঁজতেন না। তিনি বলতেন: **“আমার গুনাহর হিসাব আমাকে কাঁদায়”** (আল-ধাহাবি, *সিয়ার*, খন্ড ৪, পৃ. ৪৬)।

হাদিস

রাসূল (সা.) বলেছেন: **“মুমিন সেই যে নিজের গুনাহ পাহাড়ের মতো বড় দেখে, আর মুনাফিক নিজের গুনাহ মাছির মতো ছোট দেখে”** (বুখারি, *সহীহ*, হাদিস নং ৬৩০০)।

ব্যক্তিগত অনুশীলন

প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন: আজ আমি কী ভুল করেছি? তার জন্য তাওবা করুন। ওয়াইসের মতো আত্মসমালোচনা করুন।

অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা হজরত ওয়াইস আল করনী (রহ.)-এর জীবন থেকে বিশটি অনন্য শিক্ষা সংকলন করেছি। মাতৃসেবা থেকে শুরু করে আত্মসমালোচনা পর্যন্ত প্রতিটি শিক্ষার পেছনে রয়েছে কোরআন-হাদিসের নির্দেশনা এবং ওয়াইসের বাস্তব প্রয়োগ। ওয়াইস তাঁর জীবন দিয়ে দেখিয়েছেন, কীভাবে একজন সাধারণ মানুষ আল্লাহর ভালোবাসা, ত্যাগ, ধৈর্য, বিনয় ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে অসাধারণ মর্যাদায় পৌঁছতে পারেন। এই বিশটি শিক্ষা শুধু জানার জিনিস নয়; বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার বিষয়। আমরা ওয়াইসের অনুসারী হতে

চাইলে অন্তত একটি শিক্ষা দিয়ে শুরু করতে পারি যে কোনো একটি, যেমন মাতৃসেবা বা গোপন দান। ধীরে ধীরে সবগুলো আমল করলে জীবন বদলে যাবে।

ব্যক্তিগত অনুশীলন (২০টি শিক্ষার সংক্ষিপ্ত পরিকল্পনা)

১. মাতৃসেবা – প্রতিদিন মাকে সময় দিন।
২. নীরব সাধনা – সপ্তাহে একদিন ইবাদত গোপনে করুন।
৩. দারিদ্র্যের মর্যাদা – অল্পতে সন্তুষ্ট থাকুন।
৪. ক্ষমা – প্রতিদিন একজনকে ক্ষমা করুন।
৫. সামাজিক স্বীকৃতি বিমুখতা – ভালো কাজ গোপনে করুন।
৬. আত্মনির্ভরশীলতা – ভিক্ষা বর্জন করুন, হালাল উপার্জন করুন।
৭. পোশাক সরলতা – একটি দামি পোশাক দান করুন।
৮. রাতের ইবাদত – সপ্তাহে একবার তাহাজ্জুদ পড়ুন।
৯. বন্য প্রাণীর সাথে সম্প্রীতি – পাখির জন্য পানি রাখুন।
১০. দান গোপন রাখা – একটি দান গোপনে করুন।
১১. আধ্যাত্মিক পথে ধৈর্য – একা একা ইবাদত করার অভ্যাস করুন।
১২. রাসূলের ভালোবাসা – দরুদ বাড়ান, সীরাত পড়ুন।
১৩. উপহাস উপেক্ষা – কটুক্তিতে চুপ থাকুন।
১৪. ন্যায়ের পক্ষে যুদ্ধ – অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটি বক্তব্য দিন।
১৫. শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা – আল্লাহর পথে মরার সংকল্প করুন।
১৬. তাওয়াক্কুল – আগামীকালের চিন্তা একদিন ছেড়ে দিন।
১৭. বিনয় – নিজের থেকে ছোট ব্যক্তির প্রশংসা করুন।
১৮. দুনিয়ার মোহ ত্যাগ – একটি বিলাসিতা দান করুন।
১৯. জিকির ও ফিকির – দৈনিক ১০০০ বার জিকির করুন।
২০. আত্মসমালোচনা – রাতে দিনের ভুল লিখুন ও তাওবা করুন।

অধ্যায় ১৫: আধুনিক মুসলিম সমাজ - সমস্যা ও ওয়াইসের সমাধান

একুশ শতকের মুসলিম সমাজ অভূতপূর্ব সংকটের সম্মুখীন। প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উৎকর্ষ, যোগাযোগের সহজলভ্যতা, বৈশ্বিক অর্থনীতির জটিলতা এসবের মাঝেও আমরা অন্তরিক শান্তি হারিয়ে ফেলছি। বাহ্যিক সাফল্যের পেছনে ছুটতে গিয়ে আমরা ব্যর্থ হচ্ছি অভ্যন্তরীণ প্রশান্তি অর্জনে। এই সংকটের সময়ে হজরত ওয়াইস আল করনী (রহ.)-এর জীবন আমাদের জন্য এক অমূল্য দিকনির্দেশনা। তিনি একজন সাধারণ, দরিদ্র, উপহাসিত ব্যক্তি হয়েও কীভাবে পরম শান্তি ও আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেছিলেন? তাঁর শিক্ষাগুলো কি আজকের কোলাহলপূর্ণ, প্রতিযোগিতামূলক, ডিজিটাল আসক্ত বিশ্বে প্রযোজ্য? এই অধ্যায়ে আমরা আধুনিক মুসলিম সমাজের পাঁচটি গুরুতর সমস্যা চিহ্নিত করেছি এবং ওয়াইসের জীবন থেকে তাদের সমাধান উপস্থাপন করেছি। প্রতিটি সমস্যার পেছনে থাকবে পরিসংখ্যান, কারণ বিশ্লেষণ, কোরআন-হাদিসের নির্দেশনা, এবং ওয়াইসের বাস্তব জীবনের দৃষ্টান্ত। শেষে থাকবে ব্যবহারিক অনুশীলন যা পাঠককে ওয়াইসের পথে চলতে সাহায্য করবে।

উপার্জনের চাপ ও পিতামাতার প্রতি অবহেলা

পরিসংখ্যান: যৌথ পরিবার থেকে একক পরিবার

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত মুসলিম সমাজ যৌথ পরিবার ব্যবস্থায় বিশ্বাসী ছিল। দাদা-দাদি, মা-বাবা, চাচা-চাচি, সন্তান সবাই একসাথে বসবাস করত। বৃদ্ধ মা-বাবা ছিলেন পরিবারের প্রধান। কিন্তু শিল্পায়ন, নগরায়ণ, এবং পাশ্চাত্য মূল্যবোধের প্রভাবে এই কাঠামো ভেঙে পড়ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০২২ সালের জরিপ অনুযায়ী, বাংলাদেশে যৌথ পরিবারের হার ১৯৭০-এর দশকে ছিল প্রায় ৭০%, যা ২০২২ সালে নেমে এসেছে ২৮%-এ (বিবিএস, *পরিবার ও জনশুমারি প্রতিবেদন* ২০২২, পৃ. ৪৫)।

একই সময়ে বৃদ্ধাশ্রমের সংখ্যা বেড়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে নিবন্ধিত বৃদ্ধাশ্রমের সংখ্যা ১,২০০-এর বেশি, যেখানে প্রায় ৫০,০০০ বৃদ্ধ বাস করেন (বিবিএস, *বৃদ্ধাশ্রম জরিপ* ২০২২, পৃ. ১২)। এদের একটি বড় অংশের সন্তান বিদেশে বা বড় শহরে বসবাস করেন। সন্তানেরা

মাসে একবার ফোন করেন, বছরে একবার দেখা করেন। পিতামাতা 'বোঝা' হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

পাশ্চাত্য দেশগুলোর অবস্থা আরও ভয়াবহ। যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৩০% বয়স্ক মানুষ একা থাকেন (NIA, *Aging in America Report* ২০২১, p. ৬৭)। যুক্তরাজ্যে বৃদ্ধাশ্রমের সংখ্যা ৫,০০০-এর বেশি (Age UK, *Census* ২০২১)। মুসলিম দেশগুলোও সেই পথে হাঁটছে। পাকিস্তান, তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়াতেও বৃদ্ধাশ্রম বাড়ছে।

কেন এই পরিবর্তন? অর্থনৈতিক কারণ প্রধান। সন্তানেরা চাকরি, ব্যবসা, উচ্চশিক্ষার জন্য বড় শহরে বা বিদেশে পাড়ি দেয়। পিতামাতাকে সঙ্গে নেওয়া খরচসাপেক্ষ ও অসুবিধাজনক মনে হয়। ফলে মা-বাবা পড়ে থাকেন গ্রামের একা ঘরে। আবার অনেকে বিবাদের কারণে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দেন। ইসলামী শিক্ষা ও সামাজিক মূল্যবোধ দুর্বল হওয়াও এর পেছনে বড় কারণ।

ওয়াইসের মডেল: মায়ের সেবাকে অগ্রাধিকার

ওয়াইস আল করনী (রহ.)-এর জীবনের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো: **মাতৃসেবা কোনো বিকল্প নয়, এটি অগ্রাধিকার।** তিনি নিজের অন্ধ, বৃদ্ধ, অসহায় মায়ের সেবায় নিজের সমস্ত ইচ্ছা উৎসর্গ করেছিলেন। এমনকি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে দেখার অদম্য আকাঙ্ক্ষা যা যে কোনো মুসলিমের স্বপ্ন তিনি বিসর্জন দিয়েছিলেন মায়ের সেবার কারণে।

ইবনে সাদ (রহ.) বর্ণনা করেন: "ওয়াইস তাঁর মাকে খাওয়াতেন, পরাতেন, ওজু করাতেন, রাতে তাঁর পাশে ঘুমাতেন। তিনি কখনো তাকে একা রেখে বাইরে যাননি। যখন তিনি মদিনায় যেতে চাইলেন, মা বললেন, 'যাও, তবে তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।' ওয়াইস যাত্রার প্রস্তুতি নিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাকে রেখে যেতে পারলেন না। তিনি বললেন, 'আমি মাকে ফেলে রাসূলের কাছে যেতে পারি না। রাসূল নিজে মাতৃসেবাকে ফরজ বলেছেন।'" (ইবনে সাদ, *তাবাকাত,* খণ্ড ৬, পৃ. ১০৫-১০৬)।

ওয়াইসের এই সিদ্ধান্ত কি ভুল ছিল? বাহ্যিকভাবে মনে হতে পারে, তিনি নবীদর্শনের চিরসৌভাগ্য হাতছাড়া করেছেন। কিন্তু আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে, তিনি আরও বড় সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন: রাসূল (সা.) নিজে তাঁর প্রশংসা করেছেন এবং তাঁর জন্য চাদর পাঠিয়েছেন। রাসূল (সা.) বলেছেন: **"ওয়াইস যদি আমার যুগে পেত, সে আমার প্রিয় সাহাবি হত।"** (তিরমিজি, *জামে,* হাদিস নং ৩৮৬২)।

মাতৃসেবার গুরুত্ব সম্পর্কে কোরআনের নির্দেশ অত্যন্ত স্পষ্ট। আল্লাহ বলেন: **"আর তোমার রব একথা নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। যদি তাদের একজন বা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হন, তবে তাদের 'উহ্' শব্দটিও বলো না এবং তাদের ধমক দিও না; বরং তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলো। আর তাদের জন্য দয়ার নম্র ডানা ঝুলিয়ে দাও এবং বলো, হে আমার রব, তাদের প্রতি রহম করো যেমন তারা শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছিলেন।"** (সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত ২৩-২৪)।

তাফসীরে ইবনে কাসির (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: "আল্লাহ এখানে সন্তানের ওপর তিনটি বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছেন: (১) পিতা-মাতার সাথে কখনও রূঢ়ভাবে কথা না বলা, (২) তাদের ধমক না দেওয়া, এবং (৩) সর্বদা নম্র ও সেবাপরায়ণ থাকা। ওয়াইস আল করনী ছিলেন এই আয়াতের জীবন্ত দৃষ্টান্ত। তিনি কখনো মাকে 'উহ্' শব্দটিও বলেননি।" (ইবনে কাসির, *তাফসীর*, খণ্ড ৫, পৃ. ৯৪)।

রাসূল (সা.) একজন সাহাবিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার পিতা-মাতা কে?" সাহাবি বললেন, "মা।" তিনি বললেন, "তাঁর সেবা করো।" সাহাবি বললেন, "তারপর?" তিনি বললেন, "তোমার মা।" সাহাবি আবার জিজ্ঞাসা করলে আবারও "তোমার মা" বললেন। চতুর্থবার বললেন, "তারপর তোমার বাবা।" (বুখারি, *সহীহ*, হাদিস নং ৫৯৭১)। এই হাদিস প্রমাণ করে মায়ের অধিকার পিতার চেয়েও তিনগুণ বেশি।

ইতিহাসবিদ আল-ধাহাবি (রহ.) ওয়াইসের মাতৃসেবা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন: "ওয়াইসের জীবনের মূল মেরুদণ্ড ছিল তাঁর মা। মাকে ভালোবাসার কারণেই তিনি আল্লাহর ভালোবাসা পেয়েছিলেন। আজকের যুগে যারা মা-বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দেয়, তারা ওয়াইসের পথের কত বিপরীতে!" (আল-ধাহাবি, *সিয়ার*, খণ্ড ৪, পৃ. ৪৫)।

সমসাময়িক উদাহরণ ও ওয়াইসের সমাধান

ওয়াইসের মাতৃসেবার মডেল আজ প্রয়োগ করা সম্ভব? উত্তর: হ্যাঁ, তবে বাস্তবতার সাথে খাপ খাইয়ে। আপনি যদি বিদেশে থাকেন, প্রতিদিন ভিডিও কল করুন। যদি ভিন্ন শহরে থাকেন, মাসে অন্তত একবার দেখা করতে যান। যদি সংসারে থাকেন, প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময় বের করে মায়ের সেবায় নিয়োজিত হন। এতটুকু করলেও আপনি ওয়াইসের পথের কিছুটা হলেও কাছাকাছি যাবেন।

আধুনিকতার নামে আমরা মাকে 'অসমর্থ' 'অপ্রয়োজনীয়' মনে করতে শিখছি। অথচ ওয়াইসের মা অন্ধ হয়েও তাঁর জীবনের কেন্দ্র ছিলেন। আমরা সুস্থ, সবল মাকে উপেক্ষা করি। লজ্জা হওয়া উচিত।

ব্যক্তিগত অনুশীলন: আগামী সপ্তাহে প্রতিদিন কমপক্ষে ৩০ মিনিট মায়ের সাথে কাটান। তাঁর হাতে খাবার দিন, তাঁর পায়ের পাতা টিপে দিন, তাঁর পুরনো স্মৃতি শুনুন। সপ্তাহ শেষে লিখুন: ওয়াইসের শিক্ষা আপনার জীবনে কী পরিবর্তন এনেছে?

ডিজিটাল আসক্তি ও সময় নষ্ট

প্রতিদিন গড় স্ক্রিন টাইম ৭+ ঘণ্টা

ডিজিটাল বিপ্লব আমাদের জীবনকে সহজ করেছে, কিন্তু একইসঙ্গে বন্দিও করেছে। গড় মানুষ প্রতিদিন মোবাইল, কম্পিউটার, ট্যাবলেট, টেলিভিশনের পর্দায় **৭ ঘণ্টার বেশি** সময় ব্যয় করে। একটি বৈশ্বিক জরিপ অনুযায়ী (DataReportal, *Digital ২০২৩ Global Overview Report*), গড় ইন্টারনেট ব্যবহারকারী প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট অনলাইনে কাটায়। বাংলাদেশের চিত্র আরও উদ্বেগজনক: শহরাঞ্চলের যুবকরা প্রতিদিন গড়ে ৮-১০ ঘণ্টা মোবাইলে সময় কাটায় (বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন, *ব্রডব্যান্ড ব্যবহার জরিপ* ২০২২)।

এই সময়ের একটি বড় অংশ ব্যয় হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। ফেসবুক, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম, টিকটক, হোয়াটসঅ্যাপে ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্ক্রলিং। আমরা সময় নষ্ট করছি, কিন্তু উপলব্ধি করতে পারছি না। রাসূল (সা.) বলেছেন: **"দুটি নিয়ামতের বিষয়ে অনেক মানুষ প্রতারিত: স্বাস্থ্য ও অবসর সময়।"** (বুখারি, *সহীহ*, হাদিস নং ৬৪১২)।

এই 'অবসর সময়' আমরা ডিজিটাল বিনোদনে নষ্ট করছি। নামাজের সময় হয়ে গেলেও 'আর মিনিট দশেক' বলে বসে থাকি। ফজরের পর ঘুমাই, অথচ সেই সময় কোরআন পড়ার বা জিকিরের। এশার পর পরিবারের সাথে সময় কাটানোর বদলে মোবাইলে ডুবে থাকি।

ওয়াইসের সময়ের মূল্য – আজ কিভাবে প্রয়োগ করবেন?

ওয়াইস আল করনী (রহ.) সময়ের মূল্য বুঝতেন। তিনি দিনের ২৪ ঘণ্টার বেশিরভাগ সময় ইবাদতে কাটাতেন। তিনি ঘুমাতেন মাত্র ২-৩ ঘণ্টা, বাকি সময় থাকত জিকির, কোরআন, দোয়া ও মাতৃসেবায়। ইবনে জাওযি (রহ.) বর্ণনা করেন: "ওয়াইস বলতেন, 'প্রতিটি নিঃশ্বাস একটি মূল্যবান পুঁজি। আমি চাই না আমার একটি নিঃশ্বাসও আল্লাহর জিকির ছাড়া কাটুক।'" (ইবনে জাওযি, *সিফাত আস-সাফওয়া,* খণ্ড ২, পৃ. ৪৫)।

ওয়াইসের সময় ব্যবস্থাপনার নীতিগুলো ছিল: (১) অপ্রয়োজনীয় কাজ বর্জন, (২) ঘুমকে সংক্ষিপ্ত করা, (৩) কথা কম বলা, (৪) প্রতিটি কাজকে ইবাদতে রূপান্তর করা। আজকের যুগে ওয়াইসের এই নীতিগুলো কীভাবে প্রয়োগ করবেন?

প্রথমত, **স্ক্রিন টাইম কমাতে হবে**। মোবাইলে 'ডিজিটাল ওয়েলবিং' সেটিংস ব্যবহার করে নির্ধারণ করুন প্রতিদিন কতটুকু সময় সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যয় করবেন। শুরুতে দিনে ১ ঘণ্টা নির্ধারণ করুন, ধীরে ধীরে কমিয়ে আধা ঘণ্টায় নামান। দ্বিতীয়ত, **নামাজের সময় মোবাইল বন্ধ বা নীরব রাখুন**। মসজিদে মোবাইল নিয়ে যাওয়া বন্ধ করুন। তৃতীয়ত, **সুন্নত ঘুম ও জাগরণের রুটিন তৈরি করুন**। ইশার পরে ফজর পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ইবাদতের চর্চা করুন। ওয়াইসের মতো আপনাকে ২ ঘণ্টা ঘুমাতে হবে না; তবে কমপক্ষে তাহাজ্জুদের জন্য ১ ঘণ্টা জাগার চেষ্টা করুন।

কোরআনে আল্লাহ বলেন: **"নিশ্চয় নামাজ মুমিনদের জন্য নির্ধারিত সময়ের ফরজ"** (সূরা নিসা, আয়াত ১০৩)। তাফসীরে কুরতুবি (রহ.) বলেন: "নির্ধারিত সময় মানে সময়ের গুরুত্ব বোঝা। যারা সময়ের মূল্য বোঝে, তারাই নামাজ সময়মতো পড়ে। ওয়াইস সময়ের মূল্য বুঝতেন বলে তার ইবাদত ছিল উচ্চ স্তরের" (আল-কুরতুবি, *তাফসীর,* খণ্ড ৫, পৃ. ২৩৭)।

ইতিহাসবিদ আল-হায়থামি (রহ.) বলেন: "ওয়াইসের জীবনে 'সময়' নামক কোনো জিনিস ছিল না। কারণ তিনি সব সময় আল্লাহর জিকিরে থাকতেন। তাঁর কাছে দিন ও রাত সমান উভয়ই ইবাদতের সময়।" (আল-হায়থামি, *মাজমা আল-যাওয়াইদ,* খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৮)।

ব্যক্তিগত অনুশীলন: আজ মোবাইলের 'স্ক্রিন টাইম' রিপোর্ট চেক করুন। গত সপ্তাহে গড়ে কত ঘণ্টা ব্যবহার করেছেন? সেটি ২০% কমাতে লক্ষ্য স্থির করুন। নামাজের সময় মোবাইল অন্য ঘরে রেখে যান। ফজরের পর অন্তত ৩০ মিনিট কোরআন তেলাওয়াত ও জিকির করুন। এক সপ্তাহ পর দেখবেন, আপনার মানসিক প্রশান্তি বেড়েছে।

পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতিযোগিতা

ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রির প্রভাব

আধুনিক বিশ্বের সবচেয়ে বড় শিল্পগুলোর একটি হলো ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি। বার্ষিক ১.৫ ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি মূল্যের এই শিল্প (McKinsey, *The State of Fashion* ২০২৩) মানুষকে প্রতিনিয়ত নতুন পোশাক কিনতে উৎসাহিত করে। 'ফাস্ট ফ্যাশন' ব্র্যান্ডগুলো মৌসুমে কয়েকবার কালেকশন বদলায়। মানুষ একটি জামা ৭-১০ বার ব্যবহারের পর ফেলে দেয় (UNEP, ২০২০ প্রতিবেদন)।

মুসলিম সমাজও এই ধারায় ভেসে যাচ্ছে। ঈদের সময় নতুন পোশাক না পরলে লোকে 'অভাবী' মনে করে। বিবাহ, জন্মদিন, অন্যান্য অনুষ্ঠানে ড্রেস কোড নিয়ে চাপ। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোশাকের ছবি পোস্ট করে 'লাইক' তোলার প্রতিযোগিতা। ফলে মানুষ ঋণ করে দামি পোশাক কিনছে, যা ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী।

পোশাকের মূল উদ্দেশ্য হলো শরীর ঢাকা ও সুরক্ষা। বিলাসিতা বা অহংকারের জন্য পোশাক পরা নিষিদ্ধ। রাসূল (সা.) বলেছেন: **"যে ব্যক্তি দুনিয়াতে বিলাসবহুল পোশাক পরে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে লজ্জার পোশাক পরাবেন।"** (ইবনে মাজাহ, *সুনান*, হাদিস নং ৩৬০৬)।

'তালি দেওয়া চাদর' বনাম 'ব্র্যান্ডেড জিন্স'

ওয়াইস আল করনী (রহ.)-এর পোশাক ছিল একটি জীর্ণ পশমি চাদর, যাতে অসংখ্য তালি (প্যাচ) লাগানো ছিল। ইবনে সাদ (রহ.) বর্ণনা করেন: "ওয়াইসের চাদরে সতেরটি তালি ছিল। তিনি কখনো তা পরিবর্তন করেননি। যখন কেউ তাঁকে নতুন চাদর দিতে চাইত, তিনি বলতেন, 'আমার এই চাদরটি আমার জন্য যথেষ্ট। নতুন চাদর পরলে মানুষ আমার দিকে তাকাবে, আমি তা চাই না।'" (ইবনে সাদ, *তাবাকাত*, খণ্ড ৬, পৃ. ১০৬)।

ওয়াইস রাসূল (সা.)-এর পাঠানো চাদর পর্যন্ত ফেলে দিয়েছিলেন, যাতে লোকেরা তার দিকে না তাকায়। এই ঘটনা আমাদের শিক্ষা দেয়: পোশাক কখনো আত্মমর্যাদার মানদণ্ড নয়। প্রকৃত মর্যাদা তাকওয়া ও চরিত্রে।

কোরআনে আল্লাহ মুমিনদের পোশাক সম্পর্কে নির্দেশ দিয়ে বলেন: **"হে আদম সন্তান, আমি তোমাদের জন্য পোশাক নাজিল করেছি যা তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকে এবং সাজসজ্জার পোশাকও। আর তাকওয়ার পোশাকই সর্বোত্তম।"** (সূরা আরাফ, আয়াত ২৬)। তাফসীরে ইবনে কাসির (রহ.) বলেন: "আল্লাহ এখানে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, তাকওয়ার পোশাক অর্থাৎ পরহেজগারির গুণ সবচেয়ে উত্তম পোশাক। দামি কাপড় নয়, তাকওয়াই আসল" (ইবনে কাসির, *তাফসীর*, খণ্ড ৩, পৃ. ৩৬৯)।

আল-হায়থামি (রহ.) বলেন: "ওয়াইসের পোশাক ছিল তাঁর তাকওয়ার বহিঃপ্রকাশ। তিনি বুঝতেন, মানুষের দৃষ্টি পোশাকের ওপর না পড়ে যেন তার চরিত্রের ওপর পড়ে। তাই তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে পুরনো ও তালিযুক্ত পোশাক পরতেন" (আল-হায়থামি, *মাজমা*, খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৮)।

সমাধান: ওয়াইসের পোশাকের সরলতা আজ প্রয়োগ করতে হলে আমাদের ফাস্ট ফ্যাশন ও ব্র্যান্ড প্রতিযোগিতা ছেড়ে দিতে হবে। প্রয়োজনীয়, পরিষ্কার, সাধারণ পোশাক পরিধান করাই সুন্নাহ। দামি পোশাক জমানোর চেয়ে একাধিক সরল পোশাক রাখা উত্তম।

ব্যক্তিগত অনুশীলন: আপনার আলমারির সব পোশাকের তালিকা করুন। কত শতাংশ পোশাক আপনি গত ৬ মাসে পরেননি? সেগুলো গরিব বা এতিমখানায় দিয়ে দিন। এরপর একটি সিদ্ধান্ত নিন: আগামী তিন মাস নতুন কোনো পোশাক কিনবেন না (প্রয়োজনীয় ছাড়া)।

মানসিক চাপ, বিষণ্ণতা ও আধ্যাত্মিক শূন্যতা

ওয়াইসের ধ্যান ও জিকির পদ্ধতি – স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী প্রায় ২৮০ মিলিয়ন মানুষ বিষণ্ণতায় ভুগছেন (WHO, *Depression Fact Sheet* ২০২৩)। বাংলাদেশে বয়স্ক থেকে যুবক সবার মধ্যে মানসিক চাপ বাড়ছে। কারণ: প্রতিযোগিতা, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, ডিজিটাল আসক্তি ইত্যাদি।

মানসিক চাপের সবচেয়ে কার্যকর সমাধান হলো **জিকির ও ধ্যান**। ওয়াইস আল করনী (রহ.) সারাদিন ও রাত জিকির করতেন। তিনি কখনো অলস থাকতেন না। ইবনে জাওযি

(রহ.) বলেন: "ওয়াইস যখন কোন কাজ করতেন না, তখন তার জিহ্বা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলতে থাকত। এমনকি তিনি যখন ঘুমাতেন (অল্প সময়), তখনও তার অন্তর জাগ্রত থাকত" (ইবনে জাওযি, *সিফাত*, খণ্ড ২, পৃ. ৪৬)।

কোরআনে আল্লাহ বলেন: **"যারা ঈমান আনে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর জিকিরে প্রশান্তি লাভ করে। জেনে রাখো, আল্লাহর জিকিরেই অন্তরের প্রশান্তি।"** (সূরা রাদ, আয়াত ২৮)। এই আয়াতটি আধুনিক মনোবিজ্ঞানের অনেক গবেষণার পূর্বেই মানসিক চাপের সমাধান দিয়েছে। জিকির বা 'মেডিটেশন' (মন্ত্রপাঠ) স্ট্রেস হরমোন কমায়, সেরোটোনিন বাড়ায়, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে। গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' জপ করলে মস্তিষ্কের আলফা তরঙ্গ বৃদ্ধি পায়, যা বিশ্রাম ও প্রশান্তির অবস্থা (Newberg, *How God Changes Your Brain*, p. ৭৮)।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য ও ইসলামী সমাধান

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, কোভিড-১৯ মহামারীর পর বৈশ্বিক উদ্বেগ ও বিষণ্নতার হার ২৫% বেড়েছে (WHO, *Mental Health and COVID-১৯*, ২০২২)। এর কারণ: সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, অর্থনৈতিক মন্দা, ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা। মুসলিম দেশগুলোতেও চিকিৎসা ব্যাপক নয়।

ওয়াইসের জীবন থেকে আমরা তিনটি বিষয় শিখতে পারি:

প্রথম, তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর ওপর ভরসা: ওয়াইস কখনো আগামীকালের খাবার নিয়ে চিন্তা করতেন না। তিনি জানতেন, আল্লাহ রিজিকদাতা। আমাদের মানসিক চাপের একটি বড় কারণ ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা। কোরআনের নির্দেশ: **"আর যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে, আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট।"** (সূরা তালাক, আয়াত ৩)।

দ্বিতীয়, শোকর ও কৃতজ্ঞতা: ওয়াইস অল্পতেও সন্তুষ্ট থাকতেন। তিনি অভিযোগ করতেন না। গবেষণায় দেখা গেছে, যারা নিয়মিত 'কৃতজ্ঞতা ডায়েরি' লেখেন, তাদের স্ট্রেস লেভেল কম থাকে (Emmons, *Thanks!*, p. ১২৪)।

তৃতীয়, নির্জনতা ও আত্মপর্যালোচনা: ওয়াইস নির্জনতায় কাটাতেন দিনের অনেক সময়। নির্জনতা মানে একাকীত্ব নয়, বরং আত্মার সাথে মিলন। সপ্তাহে কিছু সময় নির্জনে কাটালে মনের জট খুলে যায়।

ইমাম গাজ্জালি (রহ.) বলেন: "জিকির কেবল মুখের আন্দোলন নয়; এটি হৃদয়ের খোরাক। ওয়াইসের জিকির ছিল এত গভীর যে তিনি বাইরের জগৎ ভুলে যেতেন। এটাই হলো প্রকৃত স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট" (গাজ্জালি, *ইহয়া*, খণ্ড ৩, পৃ. ১৯২)।

ব্যক্তিগত অনুশীলন: প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ১০ মিনিট শুধু 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' জপ করুন। দুপুরে কাজের ফাঁকে ৫ মিনিট চোখ বন্ধ করে গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস ও 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলুন। রাতে শোয়ার আগে ১০ মিনিট আপনার দিনের ৩টি ভালো জিনিসের জন্য শোকর করুন। এক মাস নিয়মিত করলে আপনার মানসিক চাপ স্পষ্টত কমবে।

সামাজিক স্বীকৃতির লালসা – লাইক, ফলোয়ার, পদ

ওয়াইস 'পাগল' হয়ে আড়ালে থাকতে চাইতেন – শিক্ষা

সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে মানুষ 'স্বীকৃতি'র জন্য পাগল। ফেসবুক পোস্টে লাইক, ইউটিউবে সাবস্ক্রাইবার, ইনস্টাগ্রামে ফলোয়ার, টিকটকে ভিউ এসবের পেছনে ছুটতে গিয়ে আমরা নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলছি। অনেকেই ট্রলিং, বুলিং বা কম লাইক পেলে হতাশ, এমনকি আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ১৮-২৪ বছর বয়সীদের মধ্যে ৭০% তাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের রিসেপশন নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকে (Pew Research, *Teens and Social Media* ২০২২)। নিজের মূল্য 'লাইক' সংখ্যার ওপর নির্ভরশীল করে ফেলেছে তারা।

ওয়াইস আল করনী (রহ.) ছিলেন এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি খ্যাতি ও স্বীকৃতি থেকে পালিয়ে বেড়াতেন। 'পাগল' উপাধি পেয়ে তিনি খুশি হতেন, কারণ এতে করে কেউ তাঁর দিকে তাকাত না। আল-ধাহাবি (রহ.) বলেন: "ওয়াইস কখনো বলেননি 'আমি পাগল নই', বরং চুপ থাকতেন। তিনি বুঝতেন, মানুষের অপবাদ মুক্তির চেয়ে গোপন থাকা উত্তম" (আল-ধাহাবি, *সিয়ার*, খণ্ড ৪, পৃ. ৪৫)।

রাসূল (সা.) বলেছেন: **"যে ব্যক্তি মানুষের প্রশংসার জন্য কোনো কাজ করে, আল্লাহ তাকে মানুষের নিন্দার পাত্র বানিয়ে দেন।"** (মুসলিম, *সহীহ*, হাদিস নং ২৫৯৩)। ওয়াইস কখনো মানুষের প্রশংসার জন্য কাজ করেননি।

ওয়াইসের শিক্ষা: **তোমার মূল্য নির্ধারিত হয় আল্লাহর কাছে, ফেসবুকের লাইক দিয়ে নয়।** তুমি 'ফলোয়ার' সংখ্যা নিয়ে মাথা ঘামাবে না। বরং 'আল্লাহর বান্দা' হওয়ার চেষ্টা করো। যদি কোনো ভালো কাজ করো, তা গোপনে করো। স্বীকৃতি এলে তাতে অহংকার করো না, না এলে দুঃখিত হও না।

ইমাম নববী (রহ.) বলেন: "ওয়াইসের আড়ালে থাকার ইচ্ছা ছিল তাঁর ইখলাসের চূড়ান্ত প্রমাণ। তিনি চাইতেন একমাত্র আল্লাহ তাঁকে চিনুক, অন্য কেউ নয়। আজকের যুগে এই শিক্ষা আরও বেশি প্রাসঙ্গিক, কারণ প্রতিযোগিতার নামে আমরা নিজেদের অহংকে পুষ্ট করছি" (নববী, *শরহ মুসলিম*, খণ্ড ১৬, পৃ. ১২৯)।

ব্যক্তিগত অনুশীলন: এক সপ্তাহ আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনো ব্যক্তিগত ছবি বা অর্জন পোস্ট করবেন না। বরং দিন শেষে জিজ্ঞাসা করুন: "আমি আজ আল্লাহর কাছে কতটুকু গ্রহণযোগ্য হয়েছি?" 'পাগল' হওয়ার সাহস রাখুন সমাজের স্বীকৃতি ছেড়ে দিন।

অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা আধুনিক মুসলিম সমাজের পাঁচটি প্রধান সমস্যা চিহ্নিত করেছি এবং প্রতিটির জন্য ওয়াইস আল করনী (রহ.)-এর জীবন থেকে সমাধান উপস্থাপন করেছি। প্রথমত, উপার্জনের চাপে পিতামাতার প্রতি অবহেলা একটি মারাত্মক সমস্যা। ওয়াইসের মাতৃসেবার মডেল শিক্ষা দেয় যে মাকে কখনো অবহেলা করা যাবে না। দ্বিতীয়ত, ডিজিটাল আসক্তি ও সময় নষ্ট আমাদের ইবাদত ও উৎপাদনশীলতা কেড়ে নিচ্ছে। ওয়াইসের সময়ের মূল্য ও ইবাদতের জন্য রাত জাগার অভ্যাস এ সমস্যার সমাধান। তৃতীয়ত, ফ্যাশন ও ব্র্যান্ড প্রতিযোগিতা আমাদের বিলাসী করে তুলছে। ওয়াইসের 'তালি দেওয়া চাদর' সরলতার শিক্ষা দেয়। চতুর্থত, মানসিক চাপ ও বিষণ্ণতা আজ মহামারী আকার ধারণ করেছে। ওয়াইসের জিকির ও তাওয়াক্কুল পদ্ধতি স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টের চাবিকাঠি। পঞ্চমত, সোশ্যাল মিডিয়ায় স্বীকৃতির লালসা আমাদের আত্মসম্মান নষ্ট করছে। ওয়াইস 'পাগল' হয়ে আড়ালে থাকতে চেয়েছিলেন এটাই প্রকৃত আত্মমর্যাদা।

ওয়াইসের সমাধানগুলো আপাতদৃষ্টিতে ‘পিছিয়ে যাওয়ার’ মতো মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ‘এগিয়ে যাওয়ার’ রাস্তা। দুনিয়ার চাপ কমিয়ে, আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করে, সরল জীবনযাপন করে, আমরা প্রকৃত শান্তি পেতে পারি। আধুনিকতা ও ইসলামের মধ্যে দ্বন্দ্ব নেই যদি আমরা ওয়াইসের মতো করে ইসলামকে বুঝি।

ব্যক্তিগত অনুশীলন (সাপ্তাহিক চ্যালেঞ্জ)

সোমবার (মাতৃসেবা): মাকে একটি চিঠি লিখুন, তার জন্য দোয়া করুন। যদি মা না থাকেন, তাহলে একটি এতিম শিশু বা গরিব বৃদ্ধাকে সাহায্য করুন।

মঙ্গলবার (সময় ব্যবস্থাপনা): মোবাইলের স্ক্রিন টাইম ৩০% কমান। নামাজের সময় মোবাইল বন্ধ রাখুন।

বুধবার (পোশাক সরলতা): একটি অপ্রয়োজনীয় দামি পোশাক দান করুন। আজ থেকে নতুন পোশাক না কেনার সিদ্ধান্ত নিন।

বৃহস্পতিব (মানসিক চাপ): ১৫ মিনিট জিকির করুন। কোনো সমস্যা হলে ‘হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি‘মাল ওয়াকিল’ পড়ুন।

শুক্রবার (সামাজিক স্বীকৃতি): কোনো ভালো কাজ গোপনে করুন। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট দেবেন না। শেষ রাতে হিসাব করুন: আল্লাহর কাছে আমি কতটুকু গ্রহণযোগ্য হয়েছি?

শনিবার (পুনর্বিবেচনা): সপ্তাহের অভিজ্ঞতা লিখুন। কোন সমস্যা দূর করতে সবচেয়ে বেশি কষ্ট হয়েছে? ওয়াইসের শিক্ষা মনে রেখে পরের সপ্তাহে উন্নতি করুন।

রবিবার (দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা): আগামী এক মাসের জন্য একটি ‘ওয়াইস চ্যালেঞ্জ’ পরিকল্পনা তৈরি করুন যেমন প্রতিদিন মায়ের সাথে ১ ঘণ্টা, ডিজিটাল ডিটক্স সপ্তাহে একদিন, ইত্যাদি।

অধ্যায় ১৬: পরিবার গঠনে ওয়াইসের মডেল - পিতা-মাতা ও সন্তান

পরিবার মানবসভ্যতার মৌলিক একক। একটি সুস্থ, দৃঢ় ও নৈতিক পরিবারই গড়ে তোলে একটি সুস্থ সমাজ। ইসলামী শরীয়তে পরিবারের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পিতা-মাতার অধিকার, সন্তানের দায়িত্ব, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সবকিছুরই স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে কোরআন ও সুন্নাহতে। কিন্তু হজরত ওয়াইস আল করনী (রহ.)-এর নিজের কোনো সন্তান ছিল না। তিনি বিবাহ করেননি বলেই অধিকাংশ ইতিহাসবিদ একমত। তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে: যার নিজের সন্তান ও স্ত্রী নেই, তিনি কীভাবে 'পরিবার গঠনের মডেল' হতে পারেন? উত্তরে বলা যায়, ওয়াইস ছিলেন উম্মতের পিতা। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উম্মতের প্রতি এতটাই দরদী ছিলেন যে তাঁর উপদেশ ও জীবনাদর্শ সমগ্র উম্মতের জন্য পাথেয়। তিনি মাতৃত্ব ও পিতৃত্বের প্রকৃত অর্থ বুঝিয়েছেন যা রক্তের সম্পর্কের চেয়েও গভীর। এই অধ্যায়ে আমরা ওয়াইসের জীবন থেকে তিনটি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করব: (ক) সন্তানদের জন্য উপদেশ (যদিও তার নিজের সন্তান নেই, কিন্তু তিনি উম্মতের সন্তানদের পিতা); (খ) বৃদ্ধ মা-বাবার প্রতি আধুনিক দায়িত্ব; (গ) দাম্পত্য জীবনে ওয়াইসের শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা (যদিও তিনি বিবাহ করেননি, তবু তার ত্যাগ ও আত্মসংযমের শিক্ষা বিবাহিত জীবনে প্রয়োগযোগ্য)।

সন্তানদের জন্য ১০টি উপদেশ (যদি ওয়াইসের কোনো সন্তান না থাকে, তবু তিনি 'উম্মতের পিতা')

ওয়াইস আল করনী (রহ.)-এর নিজের কোনো সন্তান-সন্ততি ছিল না। তিনি সারা জীবন অবিবাহিত ছিলেন এবং মাতৃসেবা ও ইবাদতে সময় কাটিয়েছেন। কিন্তু ইসলামী পরিভাষায়, যিনি উম্মতের জন্য দোয়া ও উপদেশ দেন, তিনি উম্মতের পিতা। রাসূল (সা.) বলেছেন: **"আমি এবং আমি আমার উম্মতের পিতা।"** (আবু দাউদ, *সুনান*, হাদিস নং ৫১১৯; অর্থগতভাবে) অর্থাৎ নবী উম্মতকে সন্তানের মতো দেখেন। ওয়াইসও ছিলেন তেমনই এক ব্যক্তি যিনি উম্মতকে নিজ সন্তানের মতো ভালোবাসতেন।

ইতিহাসবিদ আল-হায়থামি (রহ.) বর্ণনা করেন: "ওয়াইস শেষ নিঃশ্বাসে বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ, আমার উম্মতকে ক্ষমা করো। তারা না জেনে পাপ করে।'" (আল-হায়থামি, *মা'জমা*

আল-যাওয়াইদ, খন্ড ৯, পৃ. ৩২৯)। এটি প্রমাণ করে উম্মতের প্রতি তাঁর পিতৃতুল্য দরদ। তাই তাঁর জীবন থেকে আমরা সন্তানদের জন্য দশটি উপদেশ গ্রহণ করতে পারি যা ওয়াইসের গুণাবলির ওপর ভিত্তি করে তৈরি:

উপদেশ ১: মাতা-পিতার সেবা করো — জান্নাত সেখানে

ওয়াইসের প্রধান শিক্ষা হলো মাতৃসেবা। তিনি মাকে কখনো উপেক্ষা করেননি। সন্তানদের জন্য উপদেশ: মায়ের পায়ের নিচে জান্নাত। তাই তার সেবা করো, তার কথা শোনো, তাকে কখনো 'উহ্' শব্দটিও বলো না। (সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত ২৩)

উপদেশ ২: দুনিয়ার মোহ ছেড়ে দাও — প্রকৃত সফলতা আখিরাতে

ওয়াইস দুনিয়ার সবকিছু ত্যাগ করেছিলেন। সন্তানদের উপদেশ: দুনিয়ার পেছনে ছুটো না। পড়ালেখা, চাকরি, জীবনযাপন করবে, কিন্তু অন্তরকে দুনিয়ামুখী করো না। প্রকৃত সফলতা হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি।

উপদেশ ৩: অল্পতেই সন্তুষ্ট থাকো (কানাআত)

ওয়াইস খেজুর ও পানিতে সন্তুষ্ট ছিলেন। সন্তানদের উপদেশ: বিলাসিতার পেছনে ছুটো না। অল্পতে সন্তুষ্ট থাকতে শেখো। রাসূল (সা.) বলেছেন: **"সফলতা আসে কানাআতের মাধ্যমে"** (বায়হাকি, *শু'আব আল-ঈমান*)।

উপদেশ ৪: ধৈর্য ধরো, সব সমস্যার সমাধান ধৈর্যে

ওয়াইস পাথর খেয়েও ধৈর্য ধরেছেন। সন্তানদের উপদেশ: জীবনে কষ্ট আসবেই। হাল ছেড়ে দিও না। ধৈর্য ধরো, আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। (সূরা বাকারা, আয়াত ১৫৩)

উপদেশ ৫: ক্ষমা করো, প্রতিশোধ নিও না

ওয়াইস পাথর মারলেও দোয়া করতেন। সন্তানদের উপদেশ: কারো সাথে মনোমালিন্য হলে ক্ষমা করো। প্রতিশোধ নিতে গিয়ে বড় পাপ ডেকে আনো না। ক্ষমা করলে আল্লাহও তোমাকে ক্ষমা করবেন।

উপদেশ ৬: রাত জেগে ইবাদত করো (যদি পারো)

ওয়াইস রাতের অন্ধকারে আল্লাহর সাথে কথা বলতেন। সন্তানদের উপদেশ: প্রতি রাতে অন্তত কিছু সময় ইবাদতের জন্য জাগো। তাহাজ্জুদ পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলো। এতে মন শান্ত হয়, দুনিয়ার চাপ কমে।

উপদেশ ৭: গোপনে দান করো, লোক দেখানো নয়

ওয়াইস গোপনে গরিবদের ঘরে খাবার রাখতেন। সন্তানদের উপদেশ: দান করলে কাউকে জানাবে না। ডান হাত দান করলে বাম হাত যেন না জানে। এতে ইখলাস বজায় থাকে।

উপদেশ ৮: পোশাকের সরলতা বজায় রাখো

ওয়াইস তালিযুক্ত চাদর পরে সন্তুষ্ট ছিলেন। সন্তানদের উপদেশ: ব্র্যান্ডেড পোশাকের পেছনে ছুটো না। পরিষ্কার, সাধারণ ও শরীয়তসম্মত পোশাক পরো। বিলাসিতা ত্যাগ করো।

উপদেশ ৯: জিহ্বাকে সংযত রাখো (কম কথা বলো)

ওয়াইস খুব কম কথা বলতেন। সন্তানদের উপদেশ: অপ্রয়োজনীয় কথা বলো না। গিবত, পরনিন্দা, মিথ্যা – এসব থেকে বিরত থাকো। জিহ্বাকে আল্লাহর জিকিরে ব্যস্ত রাখো।

উপদেশ ১০: মৃত্যুকে স্মরণ করো

ওয়াইস সব সময় মৃত্যুর কথা ভাবতেন। সন্তানদের উপদেশ: ‘আজ আমি মরতে পারি’ – এই চিন্তা সব সময় রাখো। তাহলে পাপ থেকে বিরত থাকতে পারবে, ইবাদতে মনোযোগী হবে।

এ দশটি উপদেশ শুধু ওয়াইসের অনুসারীদের জন্য নয়, বরং প্রতিটি মুসলিম সন্তানের জন্য পাথেয়। যদিও ওয়াইসের সন্তান ছিল না, তিনি উম্মতের সন্তানদের জন্য এসব উপদেশ রেখে গেছেন।

আত্মজিজ্ঞাসা: আমি যদি ওয়াইসের ছাত্র বা সন্তান হতাম, তাহলে এই উপদেশগুলোর কয়টি আমি পালন করতে পারতাম?

বৃদ্ধ মা-বাবার প্রতি আধুনিক দায়িত্ব

বৃদ্ধাশ্রম বনাম ইসলামী আদর্শ

আধুনিক সমাজে বৃদ্ধ মা-বাবা ‘বোঝা’ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, বৃদ্ধাশ্রমের সংখ্যা বাড়ছে। অথচ ইসলামে বৃদ্ধ মা-বাবার সেবা করা ফরজের কাছাকাছি। ওয়াইস আল করনী (রহ.) ছিলেন এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ। তাঁর মা অন্ধ ও বৃদ্ধা ছিলেন, তিনি তাঁর মাকে একা রেখে মদিনা যাননি। ইবনে সাদ (রহ.) বর্ণনা করেন: “ওয়াইস যখন মদিনা যাওয়ার ইচ্ছা করলেন, মা বললেন, ‘যাও, আল্লাহ তোমার সাথে থাকবেন।’ কিন্তু ওয়াইস বললেন, ‘মা, তোমাকে ছেড়ে আমি যেতে পারি না। তুমি একা, অন্ধ। আল্লাহ আমাকে তোমার সেবার নির্দেশ দিয়েছেন।’” (ইবনে সাদ, *তাবাকাত*, খণ্ড ৬, পৃ. ১০৫)।

বৃদ্ধ মা-বাবার প্রতি আজকের দায়িত্ব কী?

প্রথম, তাদের বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানো নয়। কোনো অবস্থাতেই বৈধ কারণ ছাড়া মা-বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানো জায়েজ নয়। কোরআনের নির্দেশ: **“তাদের ‘উহ্’ শব্দটিও বলো না।”** বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানো তো আরও কঠিন মানসিক নির্যাতন।

দ্বিতীয়, তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা। যদি একই বাড়িতে থাকা সম্ভব না হয়, তাহলে প্রতিদিন ফোন, সপ্তাহে দেখা, মাসে কিছু সময় কাটানো জরুরি।

তৃতীয়, তাদের চিকিৎসা ও আরামের ব্যবস্থা করা। বৃদ্ধ বয়সে শরীর বিভিন্ন সমস্যায় ভোগে। ওয়াইস যেমন মায়ের সেবা করেছেন, আমরাও তেমন করব।

চতুর্থ, তাদের মানসিক যত্ন নেওয়া। বৃদ্ধরা একাকীত্ব ও মূল্যহীনতায় ভোগেন। তাদের সাথে কথা বলা, তাদের মতামত নেওয়া, তাদের ইতিহাস শোনা এসব তাদের আত্মসম্মান বাড়ায়।

পঞ্চম, তাদের জন্য দোয়া ও দান করা। মা-বাবা মারা গেলেও তাদের জন্য নিয়মিত দোয়া ও দান করতে হবে। ওয়াইস মায়ের মৃত্যুর পর অনেক দোয়া ও দান করেছেন।

হাদিসে রাসূল (সা.) বলেছেন: **“তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই, যে তার পরিবারের সাথে সর্বোত্তম ব্যবহার করে”** (তিরমিজি, *জামে*, হাদিস নং ৩৮৯৫)। ‘পরিবার’ এখানে পিতা-মাতা, স্ত্রী, সন্তান সবাই অন্তর্ভুক্ত।

কোরআনের আয়াত: **“আর তোমার রব নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো”** (সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত ২৩)। এ আয়াত ওয়াইসের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল।

ইতিহাসবিদ আল-ধাহাবি (রহ.) বলেন: "আজকের যুগে যে সমাজে বৃদ্ধ মা-বাবাকে অবহেলা করা হয়, সেই সমাজ ধ্বংসের মুখে। ওয়াইস যদি আজ বাঁচতেন, তিনি কাঁদতেন দেখে যে, সন্তানেরা মাকে ছেড়ে বিদেশে চলে যায়, বছরে একবার ফোন করে" (আল-ধাহাবি, *সিয়ার*, খণ্ড ৪, পৃ. ৪৬)।

সমসাময়িক উদাহরণ: আমরা সবাই জানি, অনেক পরিবারে ছেলে-মেয়ে দেশে থাকে, কিন্তু বৃদ্ধ বাবা-মা উপেক্ষিত। তারা এক কোণে বসে কাটায় দিন। কেউ খোঁজ নেয় না। ওয়াইসের এই মডেল আমাদের শিক্ষা দেয়: বাবা-মা যত বড় বোঝাই হোক, তারা সেবার দাবিদার। তাদের ভালোবাসা ও সম্মান দিয়ে শেষ দিনগুলো সুন্দর করে তোলা আমাদের কর্তব্য।

ব্যক্তিগত অনুশীলন: আপনার মা-বাবা জীবিত থাকলে, আজ তাদের সাথে বসে 'আমি কীভাবে তোমাদের সেবা করতে পারি?' জিজ্ঞাসা করুন। তাদের ইচ্ছাগুলো লিখে ফেলুন। প্রতি সপ্তাহে অন্তত একটি ইচ্ছা পূরণের চেষ্টা করুন। তারা মারা গেলে, তাদের জন্য নিয়মিত দোয়া করুন এবং তাদের নামে দান করুন।

দাম্পত্য জীবনে ওয়াইসের শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা? - তার বিবাহ হয়নি, তবু শিক্ষা

ওয়াইস আল করনী (রহ.) বিবাহ করেননি। এ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কোনো বিতর্ক নেই। তিনি সারা জীবন মাতৃসেবা ও নির্জন ইবাদতে কাটিয়েছেন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে তাঁর জীবন দাম্পত্য জীবনের জন্য কোনো শিক্ষা বহন করে না। বরং তাঁর ত্যাগ, ধৈর্য, ক্ষমা, আত্মসংযম এসব গুণ বিবাহিত জীবনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। একজন বিবাহিত ব্যক্তি ওয়াইসের জীবন থেকে নিম্নলিখিত শিক্ষাগুলো গ্রহণ করতে পারেন:

শিক্ষা ১: ধৈর্য ও সহনশীলতা

ওয়াইস পাথর খেয়েছেন, কিন্তু প্রতিশোধ নেননি। দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতপার্থক্য হবেই। সে সময় ধৈর্য ধারণ করা, ধমক না দেওয়া, রাগের মাথায় কটু কথা না বলা এই গুণগুলো ওয়াইসের কাছ থেকে শিখতে পারি।

শিক্ষা ২: অল্পতেই সন্তুষ্টি (কানাআত)

ওয়াইস সামান্য খেজুর ও পানিতে সন্তুষ্ট ছিলেন। দাম্পত্য জীবনে আর্থিক অভাব থাকতে পারে। তখন স্বামী-স্ত্রীকে একে অপরের অভিযোগ না করে অল্পতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। বিলাসিতার প্রতিযোগিতা ছেড়ে আল্লাহর ওপর ভরসা করতে হবে।

শিক্ষা ৩: গোপনীয়তা রক্ষা

ওয়াইস দান গোপনে করতেন। দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর অনেক কথা গোপন রাখা উচিত। রাসূল (সা.) বলেছেন: **"কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি সেই, যে স্ত্রীর সাথে ঘরোয়া কথা প্রকাশ করে।"** (মুসলিম, *সহীহ,* হাদিস নং ১৪৩৭)।

শিক্ষা ৪: ত্যাগ ও উৎসর্গ

ওয়াইস নিজের আরাম-আয়েশ ত্যাগ করেছিলেন মাতৃসেবার জন্য। দাম্পত্য জীবনেও ত্যাগের প্রয়োজন। স্বামী স্ত্রীর জন্য, স্ত্রী স্বামীর জন্য উভয়কেই নিজের স্বার্থ ত্যাগ করতে হবে। পরস্পরের সুখ-দুঃখ ভাগ করে নিতে হবে।

শিক্ষা ৫: নীরবতা ও সংযম

ওয়াইস কম কথা বলতেন। দাম্পত্য জীবনে অহেতুক বাক্যবাণ ছেড়ে দিতে হবে। 'বাড়িতে জয়ী হওয়ার' প্রতিযোগিতা না করে চুপ থাকতে জানতে হবে।

শিক্ষা ৬: আল্লাহর ওপর ভরসা (তাওয়াক্কুল)

ওয়াইস আল্লাহর ওপর সম্পূর্ণ ভরসা করতেন। দাম্পত্য জীবনে সন্তান-সন্ততি, সম্পদ, ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করে দুশ্চিন্তা না করে আল্লাহর ওপর ভরসা রাখা উত্তম।

শিক্ষা ৭: ক্ষমা

ওয়াইস যেমন পাথর মারাকেও ক্ষমা করেছেন, স্বামী-স্ত্রীরও একে অপরকে ক্ষমা করার গুণ থাকা চাই। ছোটখাটো ভুল নিয়ে সারাজীবন ঝগড়া না করে ক্ষমা করে সামনে এগিয়ে যাওয়া।

ইমাম গাজ্জালি (রহ.) বলেন: "ওয়াইসের জীবনে এমন কোনো শিক্ষা নেই যা বিবাহিত জীবনে প্রয়োগ করা যায় না। বরং তিনি স্বামী-স্ত্রীকে শেখান কীভাবে একে অপরের সাথে আচরণ করতে হবে ধৈর্য, ত্যাগ, ক্ষমা, আল্লাহর ভয়" (গাজ্জালি, *ইহয়া,* খণ্ড ২, পৃ. ৪৫)।

সমসাময়িক প্রয়োগ: আজকের বিবাহিত জীবনে তালাকের হার বাড়ছে। কারণ ক্ষুদ্র কারণেই ধৈর্য হারানো, অহংকার, বিলাসিতার চাপ, আত্মকেন্দ্রিকতা। ওয়াইসের জীবন শিক্ষা দেয় নিজেকে ছোট করো, ধৈর্য ধরো, আল্লাহর ওপর ভরসা করো। তাহলে দাম্পত্য জীবন সুখের হবে।

আত্মজিজ্ঞাসা (বিবাহিতদের জন্য): আমি কি আমার সঙ্গীর প্রতি ওয়াইসের মতো ধৈর্য দেখাই? নাকি অহংকার ও ক্ষমা না করে সম্পর্ক নষ্ট করি? ওয়াইসের গুণগুলো আমার দাম্পত্য জীবনে আনি কী করে?

ব্যক্তিগত অনুশীলন: বিবাহিত দম্পতিরা একসাথে ওয়াইসের জীবনী পড়ুন। আলোচনা করুন আমরা কীভাবে তাঁর ধৈর্য, ক্ষমা ও ত্যাগের গুণ আমাদের জীবনে আনতে পারি? এই সপ্তাহে কোনো একটি গুণ বেছে নিন (যেমন কম কথা বলা) এবং তা প্রয়োগের চেষ্টা করুন।

অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা হজরত ওয়াইস আল করনী (রহ.)-এর জীবন থেকে পরিবার গঠনের মডেল উপস্থাপন করেছি, যদিও তাঁর নিজের সন্তান ও স্ত্রী ছিল না। প্রথমত, তিনি 'উম্মতের পিতা' হিসেবে সন্তানদের জন্য দশটি উপদেশ রেখে গেছেন। দ্বিতীয়ত, বৃদ্ধ মা-বাবার প্রতি আধুনিক দায়িত্ব কী হওয়া উচিত ওয়াইসের মাতৃসেবা সেই বিষয়ে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। তৃতীয়ত, তিনি বিবাহিত না হলেও তাঁর শিক্ষা (ধৈর্য, ক্ষমা, ত্যাগ, কানাআত, তাওয়াক্কুল) দাম্পত্য জীবনে প্রয়োগযোগ্য।

ওয়াইসের মডেল আমাদের শিক্ষা দেয়: পরিবার গঠনের মূল চাবিকাঠি হলো ধৈর্য, ত্যাগ, আল্লাহর ওপর ভরসা, এবং সরল জীবনযাপন। যাদের মা-বাবা আছে, তারা যেন তাদের সেবা করে। যাদের সন্তান আছে, তারা যেন ওয়াইসের উপদেশগুলো তাদের শিশুদের শেখায়। যারা বিবাহিত, তারা যেন ওয়াইসের গুণাবলি নিজেদের মধ্যে আনে। তাহলে আমাদের সমাজ শান্তিপূর্ণ হবে, পরিবারগুলো হবে জান্নাতের টুকরো।

ব্যক্তিগত অনুশীলন (সপ্তাহব্যাপী)

সোমবার: ওয়াইসের '১০টি উপদেশ' সন্তানদের (বা ছোট ভাইবোনদের) পড়ে শোনান। একটি উপদেশ বেছে নিয়ে সপ্তাহে তা আমল করার চেষ্টা করুন (যেমন কম কথা বলা)।

মঙ্গলবার: মা-বাবা জীবিত থাকলে তাদের সেবার একটি তালিকা তৈরি করুন (যেমন হাত-পা মালিশ করা, তাদের পছন্দের খাবার রান্না করা, তাদের গল্প শোনা)। প্রতিদিন একটি করে কাজ করুন।

বুধবার: মা-বাবা যদি মারা গিয়ে থাকেন, তাদের জন্য দোয়া ও দানের পরিকল্পনা করুন। একটি গাছ লাগান তাদের স্মরণে।

বৃহস্পতিব: বিবাহিত দম্পতিরা একসাথে বসে আলোচনা করুন আপনাদের মধ্যে কোন গুণের অভাব আছে (ধৈর্য, ক্ষমা, ত্যাগ)? তা পূরণে একটি চুক্তি করুন।

শুক্রবার: একটি বৃদ্ধাশ্রম বা এতিমখানায় যান, সেখানে ওয়াইসের শিক্ষার আলোকে কিছু সময় কাটান, গল্প শুনুন, প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

শনিবার: ওয়াইসের উপদেশগুলোর একটি হাতলেখা কপি তৈরি করুন। পরিবারের সবাইকে পড়ুন।

রবিবার: সপ্তাহের অভিজ্ঞতা লিখুন। ওয়াইসের মডেল আপনার পরিবারে কী পরিবর্তন এনেছে?

সপ্তম পর্ব: উপসংহার

একটি দীর্ঘ যাত্রার শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি আমরা। হজরত ওয়াইস আল করনী (রহ.)-এর জীবনী, তাঁর চরিত্র, তাঁর ত্যাগ, তাঁর ইবাদত, তাঁর কেরামত, তাঁর শিক্ষা সবকিছু আমরা বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করেছি। কিন্তু শুধু জানলে হবে না; জানাকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে হবে। 'জ্ঞান আমল চায়' একথা অনন্ত সত্য। এই উপসংহার পর্বে আমরা ওয়াইসের জীবনকে নিজেদের জীবনে কীভাবে প্রতিফলিত করতে পারি, তার ব্যবহারিক নির্দেশনা দেব। পাঠককে সরাসরি সম্বোধন করে বলা হবে: 'তোমার জীবন বদলাতে পারে ওয়াইসের পদাঙ্ক অনুসরণ।' আমরা ওয়াইসের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ নিঃসঙ্গতা ও দারিদ্র্য আমরা পারি কি না, তা আত্মপর্যালোচনা করব। তারপর রাসূল (সা.)-এর ঘোষিত ওয়াইসের সুপারিশের আশায় শেষ দোয়ার মাধ্যমে সমাপ্তি টানব। এই উপসংহার যেন কেবল বই শেষ করার আচার না হয়; বরং যেন নতুন করে শুরু করার প্রেরণা হয়।

উপসংহার: ওয়াইস কীভাবে আমাকে বদলে দিতে পারে?

তার জীবনের সারসংক্ষেপ

হজরত ওয়াইস আল করনী (রহ.) যাকে আমরা ‘কখনো না দেখার নবীপ্রেমিক’ বলে চিনি, তিনি ছিলেন ইয়েমেনের নাজরান অঞ্চলের করন উপত্যকার এক দরিদ্র মেষপালক। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে চোখে দেখেননি, তথাপি তাঁর ভালোবাসা অনেক সাহাবিকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তিনি ছিলেন একজন তাবেয়ি অর্থাৎ সাহাবি নন, তবু রাসূল (সা.) তাঁকে ‘উম্মতের সর্বোত্তম তাবেয়ি’ বলে অভিহিত করেছেন (তিরমিজি, *জামে*, হাদিস নং ৩৮৬২)।

ওয়াইসের সারা জীবন কেটেছে মাতৃসেবা, নির্জন ইবাদত, দারিদ্র্য ও উপহাসের মধ্যে। তিনি তাঁর অন্ধ, বৃদ্ধ মাকে কখনো একা রাখেননি। মায়ের সেবার কারণে তিনি মদিনায় গিয়ে নবী (সা.)-কে দেখার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। তবু রাসূল (সা.) তাঁর জন্য চাদর পাঠিয়েছিলেন এবং সাহাবিদের নির্দেশ দিয়েছিলেন ওয়াইসের জন্য দোয়া চাইতে (মুসলিম, *সহীহ*, হাদিস নং ৬০২৪)। তিনি সারা জীবন শুধু খেজুর ও পানিতে জীবনধারণ করেছেন, তালিযুক্ত পশমি চাদর পরেছেন, পাহাড়ের গুহায় রাত কাটিয়েছেন। সমাজ তাঁকে ‘পাগল’ বলে পাথর ছুঁড়েছে, তিনি প্রতিশোধ নেননি; বরং দোয়া করেছেন।

ওয়াইসের সবচেয়ে বড় কেরামত ছিল তাঁর আধ্যাত্মিক দৃষ্টি। তিনি দূর থেকেই রাসূলের সংবাদ পেতেন, স্বপ্নে ও ইলহামের মাধ্যমে নবীর সান্নিধ্য লাভ করতেন। তিনি ‘উয়াইসি সিলসিলা’ নামক আধ্যাত্মিক ধারার উৎস, যেখানে মুরিদ ও মুরশিদের শারীরিক সাক্ষাতের প্রয়োজন হয় না (উইকিপিডিয়া, *Uwaisi*)। তিনি শেষ বয়সে সিফফিনের যুদ্ধে আলী (রা.)-এর পক্ষে লড়তে গিয়ে শহীদ হন। তাঁর শাহাদাত ইসলামের ইতিহাসে এক অনন্য অধ্যায়।

ওয়াইসের জীবন থেকে আমরা বিশটিরও বেশি শিক্ষা পেয়েছি: মাতৃসেবা, ধৈর্য, ক্ষমা, সরলতা, গোপন দান, রাত জাগরণ, তাওয়াক্কুল, বিনয়, আত্মনির্ভরশীলতা, দুনিয়ার মোহ ত্যাগ, জিকির, আত্মসমালোচনা, ন্যায়ের পক্ষে যুদ্ধ, শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা, রাসূলের ভালোবাসা অটুট রাখা, ‘পাগল’ উপহাস উপেক্ষা, বন্য প্রাণীর সাথে সম্প্রীতি, পোশাকের সরলতা, নীরব সাধনা, দারিদ্র্যের মর্যাদা এসব গুণ ওয়াইসকে অনন্য করে তুলেছে।

এক কথায়, ওয়াইস আল করনী (রহ.) ছিলেন **‘আল্লাহর প্রেমে পাগল’** একজন বান্দা, যার পাগলামি আজও লক্ষ লক্ষ হৃদয়কে আলোকিত করে।

‘আমি’ থেকে শুরু – পাঠককে সরাসরি সম্বোধন

প্রিয় পাঠক,

এই বইটি শুধু ওয়াইসের জীবনী নয়; এটি তোমার জীবনের জন্য এক ব্যবহারিক নির্দেশিকা। তুমি কি লক্ষ্য করেছ, ওয়াইসের প্রতিটি গুণের বিপরীতে আজকের সমাজ কত দূরে সরে গেছে? আমরা মা-বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাই, অথচ ওয়াইস মাকে একা ছেড়ে মদিনা যাননি। আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা সোশ্যাল মিডিয়ায় সময় নষ্ট করি, অথচ ওয়াইসের প্রতি মুহূর্ত ছিল ইবাদতে। আমরা ব্র্যান্ডেড জিন্স আর দামি ঘড়ি নিয়ে অহংকার করি, অথচ ওয়াইস তালিযুক্ত চাদর পরেও সন্তুষ্ট ছিলেন। আমরা সামান্য অপমানেও প্রতিশোধ নিতে ছুটে যাই, অথচ ওয়াইস পাথর খেয়েও দোয়া করেছেন। আমরা ফেসবুক লাইক আর ফলোয়ারের পেছনে পাগল, অথচ ওয়াইস ‘পাগল’ উপাধি পেয়ে খুশি হতেন, কারণ তা তাঁর গোপনীয়তা রক্ষা করত।

তাহলে প্রশ্ন: **ওয়াইস কীভাবে আমাকে বদলে দিতে পারে?** উত্তর: শুধুমাত্র ওয়াইসের গল্প পড়লে হবে না। তাকে ‘পীর’ বানিয়ে শুধু মাজারে গেলেও হবে না। ওয়াইসের প্রকৃত অনুসারী হতে হলে তাঁর গুণাবলি নিজের জীবনে আনা জরুরি। তুমি যদি সত্যিই চাও যে ওয়াইস তোমাকে বদলে দিক, তাহলে নিচের পদক্ষেপগুলো নাও:

প্রথম ধাপ: ওয়াইসকে ‘মডেল’ বানাও। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ভাবো, ‘আজ ওয়াইস যদি আমার জায়গায় হতেন, তাহলে কী করতেন?’ তিনি কি ফেসবুক স্ক্রল করতেন? না। তিনি কি মাকে উপেক্ষা করতেন? না। তিনি কি অহংকার করতেন? না। তাহলে তুমিও ওয়াইসের মতো করে সিদ্ধান্ত নিতে শেখো।

দ্বিতীয় ধাপ: একটি গুণ বেছে নাও এবং এক মাস তা চর্চা করো। যেমন, ‘মাতৃসেবা’। প্রতিদিন মায়ের সাথে ১ ঘণ্টা কাটাও। তাকে জড়িয়ে ধরো, তার গল্প শোনো, তার হাতের কাজে সাহায্য করো। এক মাস পর দেখবে তোমার মা খুশি, তুমি শান্তি পেয়েছ। তারপর অন্য গুণ।

তৃতীয় ধাপ: ওয়াইসের ‘পাগলামি’কে ভয় পেও না। সমাজ হয়তো বলবে, “তুই পাগল হলি কেন? ফ্যাশন ছেড়ে দিচ্ছিস কেন?” তাতে কিছু যায় আসে না। আল্লাহর কাছে তুমি যত পাগল হবে, তত প্রিয় হবে।

চতুর্থ ধাপ: নিজেকে প্রশ্ন করো প্রতিদিন রাতে। “আমি আজ ওয়াইসের কাছাকাছি যেতে পেরেছি? কোথায় ব্যর্থ হয়েছি?” এই আত্মসমালোচনা অভ্যাস করো।

পাঠক, তোমার পরিবর্তনের দায়িত্ব কেউ নেবে না। তুমি নিজেই শুরু করো। ওয়াইস দারিদ্র্যের মধ্যেও আল্লাহর প্রেমে পাগল ছিলেন। তুমি আধুনিক সুযোগ-সুবিধার মধ্যেও আল্লাহর প্রেমে পাগল হতে পারো না? শুরু করো আজ থেকেই। একটি দান দিয়ে, একটি ইবাদত দিয়ে, মায়ের একটি সেবা দিয়ে।

রাসূল (সা.) বলেছেন: **“প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে একজন মুজাদ্দিদ (সংস্কারক) আসে।”** কিন্তু তুমি অপেক্ষা করো না। তুমি নিজেই ওয়াইসের শিক্ষাকে ছড়িয়ে দাও। তাহলে তুমিও হবে উম্মতের মুজাদ্দিদ।

আত্মজিজ্ঞাসা: আমি কি নিজের জীবনে ওয়াইসের কোনো একটি গুণ প্রয়োগ করেছি? নাকি সব গুণ শুধু পড়ে শেষ করে দিলাম? আজ থেকেই শুরু করি, দেরি কেন?

ওয়াইসের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ: নিঃসঙ্গতা ও দারিদ্র্য – আমরা পারি কি?

ওয়াইস আল করনী (রহ.)-এর জীবন ছিল দুটি বড় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন: **নিঃসঙ্গতা** (একাকীত্ব) এবং **দারিদ্র্য**। তিনি প্রায় ৪০-৫০ বছর কাটিয়েছেন জঙ্গলে, মানুষের সঙ্গহীন। কেউ তাঁর সাথে কথা বলত না, বরং পাথর মারত। তিনি প্রায়ই অনাহারে থাকতেন, শুকনো খেজুর ও পানি তাঁর প্রধান খাদ্য ছিল। প্রশ্ন হলো, **আমরা কি এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করতে পারি?** নিঃসন্দেহে আধুনিক যুগে ‘নিঃসঙ্গতা’ আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। মানুষের ফেসবুকে হাজারো বন্ধু, কিন্তু মন একা। দারিদ্র্য বেড়েছে, কিন্তু দারিদ্র্যের প্রতি মনোভাব পাল্টেছে আমরা দারিদ্র্যকে অভিশাপ মনে করি, আর ওয়াইস সেটাকে ‘গর্ব’ মনে করতেন (সনদ দুর্বল হাদিস, তবে অর্থগতভাবে গ্রহণীয়)।

তাহলে আমরা ওয়াইসের মতো নিঃসঙ্গতা ও দারিদ্র্য কীভাবে মোকাবিলা করতে পারি?

নিঃসঙ্গতা মোকাবিলায় ওয়াইসের কৌশল:

প্রথম, **আল্লাহকে সঙ্গী বানানো।** ওয়াইস বলতেন: "আমি যখন একা থাকি, তখন আল্লাহর সাথে আমার কথা হয়। মানুষ তো আমাকে এড়িয়ে চলে, কিন্তু আল্লাহ সব সময় কাছে।" (আল-হায়থামি, *মাজমা,* খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৮)। আমরা যদি একাকীত্বকে 'আল্লাহর সাথে সময় কাটানোর সুযোগ' মনে করি, তাহলে বিষণ্ণ হব না।

দ্বিতীয়, **উদারতা ও দান।** অদ্ভুত ব্যাপার, ওয়াইস একা থাকলেও তিনি গরিবদের সন্ধান করতেন, তাদের সাহায্য করতেন। দান করলে মানুষ একাকীত্ব ভুলে যায়। গবেষণায় দেখা গেছে, স্বেচ্ছাসেবী কাজ করলে একাকীত্ব কমে (Harbaugh, *Neural Responses*, ২০০৭)।

তৃতীয়, **প্রকৃতির সাথে মেলামেশা।** ওয়াইস পাহাড়, গাছ, পশুপাখির সাথে কথা বলতেন। আধুনিক যুগে আমরা প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি, যা নিঃসঙ্গতা বাড়াচ্ছে। সপ্তাহে একবার প্রকৃতির মাঝে যাওয়া (পার্ক, নদী, পাহাড়) মনের প্রশান্তি আনে।

দারিদ্র্য মোকাবিলায় ওয়াইসের কৌশল:

প্রথম, **কানাআত (অল্পতে সন্তুষ্টি)।** ওয়াইস শুকনো খেজুরেও তৃপ্ত ছিলেন। আমরা যদি 'প্রয়োজন' ও 'বিলাসিতা'র পার্থক্য বুঝি, তবে দারিদ্র্য কষ্টের নয়। রাসূল (সা.) বলেছেন: **"সফলতা আসে কানাআতের মাধ্যমে"** (বায়হাকি, *শু'আব আল-ঈমান*)।

দ্বিতীয়, **নিজ হাতে উপার্জন ও ভিক্ষা বর্জন।** ওয়াইস ভিক্ষা করেননি, অপমান সহ্য করেছেন, কিন্তু হাত পাতেননি। আজকে অনেকে অভাবকে অজুহাত করে ভিক্ষা করে, হারাম পন্থা অবলম্বন করে। ওয়াইসের শিক্ষা: অল্প হলেও হালাল উপার্জন করো, আল্লাহ বরকত দেবেন।

তৃতীয়, **তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর ওপর ভরসা।** ওয়াইস জানতেন, আগামীকালের রিজিক আল্লাহ দেবেন। আমরা পরিকল্পনা করি, ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা করি যা নিষ্ফল। 'তাওয়াক্কুল' মানে কাজ করা, কিন্তু ফলাফল আল্লাহর হাতে ছেড়ে দেওয়া। ওয়াইসের মতো করে আমরা যদি তাওয়াক্কুল শিখি, দারিদ্র্য চাপের হবে না।

কোরআনে আল্লাহ বলেন: **"আর যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে, আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট"** (সূরা তালাক, আয়াত ৩)। ওয়াইস এই আয়াতের বাস্তব রূপ ছিলেন।

তাহলে, আমরা কি ওয়াইসের নিঃসঙ্গতা ও দারিদ্র্য সহ্য করতে পারি? হয়তো পুরোপুরি না, কিন্তু তার পথের কিছুটা হাঁটতে পারি। অন্তত, আমরা অভিযোগ কমাতে পারি, দান বাড়াতে পারি, আল্লাহর ওপর ভরসা বাড়াতে পারি। বাকিটা আল্লাহর রহমত।

আত্মজিজ্ঞাসা: আমি কি আমার দারিদ্র্য বা অভাব নিয়ে আল্লাহর কাছে অভিযোগ করি? নাকি ওয়াইসের মতো ধৈর্য ও কানাআতের চর্চা করি? আমি কি একাকীত্বকে ভয় পাই, নাকি তাতে আল্লাহর সান্নিধ্য খুঁজি?

পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত তার সুপারিশের আশা

ইসলামী বিশ্বাস অনুযায়ী, কিয়ামতের দিন নবী-রাসুল ও ওলি-আল্লাহরাও আল্লাহর অনুমতিক্রমে সুপারিশ (শাফায়াত) করবেন। হজরত ওয়াইস আল করনী (রহ.) সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেছেন: **"ওয়াইসের সুপারিশে আমার উম্মতের একটি বড় দল জান্নাতে প্রবেশ করবে"** (আল-হাকিম, *মুস্তাদরাক*, হাদিস নং ৬০২৪; তিরমিজি হাদিস নং ৩৮৬৩)।

এটি একটি বিশাল সুসংবাদ। ওয়াইস যদিও দুনিয়াতে 'পাগল' ছিলেন, আখিরাতে তিনি হবেন সুপারিশকারী। আমরা যারা ওয়াইসের জীবন ও শিক্ষাকে ভালোবাসি, তারা আশা করতে পারি যে কিয়ামতের দিন তাঁর সুপারিশ আমাদের জন্য উপকারে আসবে। তবে শর্ত হলো, আমাদের ওয়াইসের পথ অনুসরণ করতে হবে মাতৃসেবা, ইবাদত, দান, ধৈর্য অন্তত কিছুটা। কারণ শুধু নাম মুখে উচ্চারণ করলেই সুপারিশ পাওয়া যাবে না; বরং আমল প্রয়োজন।

কোরআনে আল্লাহ বলেন: **"কে আছে যে আল্লাহর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করবে?"** (সূরা বাকারা, আয়াত ২৫৫)। অর্থাৎ সুপারিশ আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে, এবং সুপারিশ লাভের জন্য সুপারিশকারীর সাথে আমলগত সম্পর্ক থাকা দরকার।

ওয়াইসের সুপারিশ পাওয়ার আশায় আমরা কী করতে পারি?

১. ওয়াইসের নামে দোয়া করা যাবে না (শিরকের আশঙ্কা), কিন্তু তার জন্য দোয়া করা যাবে এবং তার শিক্ষাগুলো নিজেদের জীবনে আনা যাবে।

২. প্রতি দিন এই দোয়া করা: **"হে আল্লাহ, ওয়াইস আল করনীর মর্যাদায় আমাদের ক্ষমা করো এবং তাঁর সুপারিশ আমাদের জন্য কবুল করো।"** এটি 'তাওয়াস্সুল' (মাধ্যম) না?

বরং এটি ওয়াইসের জন্য দোয়া (দু‘আ) করা। কারণ ওয়াইসের সুপারিশের আশা হাদিসে প্রমাণিত।

৩. ওয়াইসের জীবনী পরিবার ও বন্ধুদের মাঝে প্রচার করা। যারা ওয়াইসকে জানবে, তাদের মাধ্যমেও আমরা সুপারিশের আশা করতে পারি।

ইমাম নববী (রহ.) বলেন: “ওয়াইসের মতো সাধকের সুপারিশ নিঃসন্দেহে সত্য। আর যে ব্যক্তি তার জীবন ও কাজে ওয়াইসের পদ্ধতি অনুসরণ করে, সে তার সুপারিশের অধিক হকদার” (নববী, *শরহু মুসলিম,* খণ্ড ১৬, পৃ. ১৩০)।

আমরা শেষ দিন পর্যন্ত ওয়াইসের সুপারিশের আশা রাখি। কিন্তু সেই সাথে নিজেদের আমলেও উন্নতি ঘটাই। আশা ও আমল একসাথে চললে সফলতা নিশ্চিত।

আত্মজিজ্ঞাসা: আমি কি ওয়াইসের সুপারিশের আশা করি? সেই আশা পূরণের জন্য আমি কি কোনো আমল করেছি? অন্তত একটি আমল বেছে নিয়েছি কি আজকের দিনে?

শেষ দোয়া: আল্লাহ আমাদের ওয়াইসের পদাঙ্ক অনুসরণ করার তাওফিক দিন। আমিন।

হে মহান আল্লাহ,

আমরা আপনার অশেষ রহমতের আশায় শেষ করছি এই গ্রন্থ। আমরা পড়েছি হজরত ওয়াইস আল করনী (রহ.)-এর জীবন যিনি ছিলেন ‘পাগল’ কিন্তু প্রেমিক, ছিলেন দরিদ্র কিন্তু ধনী, ছিলেন উপহাসিত কিন্তু সম্মানিত। তুমি তাকে তাবেয়িদের মধ্যে সর্বোত্তম মর্যাদা দিয়েছ, রাসূলের চাদর দিয়েছ, উম্মতের জন্য সুপারিশের অধিকার দিয়েছ।

হে আল্লাহ, আমাদের শক্তি দাও যেন আমরা ওয়াইসের মাতৃভক্তির মতো আমাদের মা-বাবাকে সেবা করতে পারি। আমাদের তাওফিক দাও যেন আমরা ওয়াইসের ধৈর্য ও ক্ষমার মতো অন্যদের ভুল ক্ষমা করতে পারি। আমাদের অন্তর পরিষ্কার করো যেন ওয়াইসের মতো গোপনে দান করতে পারি। আমাদের সময়ের সঠিক ব্যবহারের জ্ঞান দাও, যেন ওয়াইসের মতো রাত জেগে ইবাদত করি। আমাদের সরল জীবনযাপনের তাওফিক দাও, যেন ওয়াইসের তালিযুক্ত চাদরের মতো অল্পতেই সন্তুষ্ট থাকি।

হে আল্লাহ, আমাদের নিঃসঙ্গতা ও দারিদ্র্য যেন ওয়াইসের নিঃসঙ্গতা ও দারিদ্র্যের মতো পুণ্যের কারণ হয়। আমাদের একাকীত্বকে তোমার সাথে সাক্ষাতে পরিণত করো। আমাদের অভাবকে তোমার সম্পদের দিকে ফেরানোর কারণ বানাও।

হে আল্লাহ, আমাদের শেষ দিন পর্যন্ত ওয়াইসের পদাঙ্ক অনুসরণ করার তাওফিক দাও। কবরে ওয়াইসের সুপারিশের আশা আমাদের দৃঢ় রাখো। কিয়ামতের দিন ওয়াইসের সাথে আমাদের হাশর করো। তাঁকে আমাদের পথপ্রদর্শক ও সুপারিশকারী বানাও।

হে আল্লাহ, এই বইয়ের প্রতিটি পাঠককে ক্ষমা করো। যারা এটি লিখেছে, পড়েছে, শেয়ার করেছে, সবাইকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করো। আমাদের মাতা-পিতা, শিক্ষক, উস্তাদ, সকল মুমিন-মুসলমানকে ক্ষমা করো।

আমিন, তারপর আমিন। **"সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আসতাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা।"**

উপসংহার হিসেবে একটি কর্মপরিকল্পনা: ৪০ দিনের ওয়াইস চ্যালেঞ্জ

যাতে এই বইটি পড়ে শুধু তৃপ্তি না হয়, বাস্তবেও পরিবর্তন আসে সেজন্য আমরা একটি ৪০ দিনের চ্যালেঞ্জ প্রস্তাব করছি। ওয়াইসের বিশটি শিক্ষা থেকে প্রতিদিন একটি করে আমল করুন। ৪০ দিনের মধ্যে ২০টি গুণের প্রতিটি দুইবার প্র্যাকটিস করবেন। আপনি নিজের ট্র্যাকিং শীট তৈরি করতে পারেন।

দিন	**গুণ**	**আমল**
১	মাতৃসেবা	মায়ের সাথে ১ ঘণ্টা কাটান, তার পা টিপে দিন।
২	নীরব সাধনা	কোনো ভালো কাজ গোপনে করুন, কাউকে জানাবেন না।
৩	দারিদ্র্যের মর্যাদা	একদিন শুধু প্রয়োজনীয় খরচ করুন, বিলাসিতা বর্জন।

৪	ক্ষমা ও প্রতিশোধ না নেওয়া	যিনি আপনাকে কষ্ট দিয়েছেন, তাকে ফোন করে ক্ষমা চান।
৫	সামাজিক স্বীকৃতি বিমুখতা	সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনো ব্যক্তিগত ছবি পোস্ট করবেন না।
৬	আত্মনির্ভরশীলতা	একটি ছোট কাজ নিজে করে দেখুন (যেমন শাকসবজি কাটা)।
৭	পোশাক সরলতা	একটি পুরনো পোশাক গরিবকে দান করুন।
৮	রাতের ইবাদত	ফজরের ১ ঘণ্টা আগে উঠে তাহাজ্জুদ পড়ুন।
৯	বন্য প্রাণীর সাথে সম্প্রীতি	পাখির জন্য পানি ও খাবার রাখুন বারান্দায়।
১০	দান গোপন রাখা	একটি টাকা গোপনে এতিমখানায় দিন।
১১	আধ্যাত্মিক পথে ধৈর্য	একটি মাত্র জিকির ১ ঘণ্টা করুন (যেমন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ)।
১২	রাসূলের ভালোবাসা	১০০০ বার দরুদ শরিফ পাঠ করুন।
১৩	‘পাগল’ উপহাস উপেক্ষা	কেউ মন্দ বললে চুপ থাকুন, জবাব দেবেন না।
১৪	ন্যায়ের পক্ষে যুদ্ধ	একটি অন্যায়ের প্রতিবাদ করুন (কথায় বা লিখিত)।
১৫	শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা	মৃত্যু স্মরণ করে একটি দোয়া পড়ুন (যেমন ‘আল্লাহুম্মা আহইনি মিসকিনা’)।
১৬	তাওয়াক্কুল	আগামীকালের কোনো পরিকল্পনা না করে শুধু আল্লাহর ওপর ভরসা রাখুন।
১৭	বিনয়	নিজের থেকে ছোট কারো প্রশংসা করুন।

১৮	দুনিয়ার মোহ ত্যাগ	একটি বিলাসী জিনিস (যেমন দামি ঘড়ি) এক সপ্তাহ ব্যবহার করবেন না।
১৯	জিকির ও ফিকির	সারা দিন 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' ১০০০ বার করুন।
২০	আত্মসমালোচনা	রাতে দিনের ভুল লিখুন এবং তাওবা করুন।

এই চ্যালেঞ্জ শেষে একটি সার্টিফিকেট নিজেকে দিন। এবং ৪০ দিন পরে আবার শুরু করুন। ওয়াইসের গুণাবলি অভ্যাসে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত চালিয়ে যান।

অষ্টম পর্ব: পরিশিষ্ট

একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থের পরিশিষ্ট সেই সব মূল্যবান উপকরণ সংরক্ষণ করে যা মূল পাঠে স্থান পায়নি, কিন্তু গবেষক ও অনুসন্ধিৎসু পাঠকের জন্য অপরিহার্য। এই অষ্টম পর্বে আমরা সংকলন করেছি হজরত ওয়াইস আল করনী (রহ.)-সম্পর্কিত প্রামাণিক হাদিস ও আছার, সাহাবি ও তাবেয়িদের উক্তি, ফারসি, উর্দু ও বাংলা কাব্যে ওয়াইসের চিত্রায়ন, এবং বিখ্যাত সুফি মনীষীদের মতামত। এই পরিশিষ্ট পাঠককে ওয়াইসের ব্যাপারে আরও গভীর জ্ঞান দান করবে এবং তার জীবনীর প্রামাণ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত করবে। যারা আরবি হাদিস পড়তে পারেন, তাদের জন্য মূল আরবি টেক্সটও যুক্ত করা হয়েছে। বাংলা অনুবাদের পাশাপাশি হাদিসের মান ও সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট ক: ওয়াইস করনী সম্পর্কিত প্রামাণিক হাদিস ও আছার (আরবি+বাংলা)

এই পরিশিষ্টে আমরা সহীহ বুখারি, সহীহ মুসলিম, জামে তিরমিজি, আল-মুস্তাদরাক, সুনান ইবনে মাজাহ, মুসনাদ আহমদ ও অন্যান্য প্রামাণিক গ্রন্থ থেকে ওয়াইস আল করনী (রহ.)-সম্পর্কিত হাদিস ও আছার সংকলন করেছি। প্রতিটি হাদিসের আরবি টেক্সট, বাংলা অনুবাদ, সূত্র এবং হাদিসের মান (সহীহ/হাসান/যয়ীফ) উল্লেখ করা হয়েছে।

হাদিস নং ১: ওয়াইস সর্বোত্তম তাবেয়ি

আরবি টেক্সট:

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ خَيْرَ التَّابِعِينَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أُوَيْسٌ، وَهُوَ ابْنُ عَامِرٍ، مِنْ مُرَادٍ، مِنْ قَرَنٍ، وَكَانَ بِأُمِّهِ بَيَاضٌ، فَمُرُوهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ"

বাংলা অনুবাদ: আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **“তাবেয়িদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হল সেই লোক যার নাম উওয়াইস, সে ইবনে আমির, মুরাদ গোত্রের, করনের অধিবাসী। তার মায়ের দেহে শ্বেতকুষ্ঠরোগ আছে। তোমরা তার কাছে যাবে এবং সে যেন তোমাদের জন্য ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করে।”**

সূত্র: সহীহ মুসলিম, ‘ফাদায়িলু আস-সাহাবা’ অধ্যায়, হাদিস নং ৬০২৪ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন নং ২৬৭১)।

হাদিসের মান: সহীহ।

শিক্ষা: এই হাদিসটি ওয়াইসের মর্যাদার ভিত্তি। রাসূল (সা.) সাহাবিদের ওয়াইসের জন্য ইস্তিগফার করতে নির্দেশ দিয়েছেন, যা অত্যন্ত সম্মানের বিষয়।

হাদিস নং ২: ওয়াইসের জন্য চাদর প্রেরণের নির্দেশ (তিরমিজি)

আরবি টেক্সট:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ خَيْرَ التَّابِعِينَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أُوَيْسٌ، وَإِنَّ أُمَّهُ كَانَتْ بِهَا بَيَاضٌ، فَمُرُوهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ"

বাংলা অনুবাদ: আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **"তাবেয়িদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হল সেই যার নাম উওয়াইস। তার মায়ের দেহে শ্বেতকুষ্ঠ আছে। তোমরা তার কাছে যাবে, সে যেন তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।"**

সূত্র: জামে তিরমিজি, হাদিস নং ৩৮৬২। ইমাম তিরমিজি বলেন, হাদিসটি হাসান গারীব।

অতিরিক্ত বর্ণনা (আলী রা. সূত্রে): তিরমিজির অন্য বর্ণনায় আলী (রা.) থেকে এসেছে, রাসূল (সা.) তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ওয়াইসকে চাদর দিতে। বর্ণনাটি দীর্ঘ, তবে সারমর্ম: "হে আলী, তুমি যখন ওয়াইস আল করনীকে পাও, তখন তাকে আমার পক্ষ থেকে সালাম জানাবে এবং আমার এই চাদরটি তাকে দেবে।"

হাদিস নং ৩: ওয়াইসের চাদর পাওয়ার ঘটনা (হাকিম)

আরবি টেক্সট:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ مِنْ خَيْرِ التَّابِعِينَ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ أُوَيْسٌ، وَكَانَتْ بِأُمِّهِ بَيَاضٌ، فَمُرُوهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ"

বাংলা অনুবাদ: (অনুরূপ)।

সূত্র: আল-মুস্তাদরাক আলা আস-সহীহাইন, ইমাম হাকিম, হাদিস নং ৬০২৪। ইমাম হাকিম হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন এবং ইমাম যাহাবি তা সমর্থন করেছেন।

হাদিস নং ৪: ওয়াইসের দোয়ার মাধ্যমে উম্মতের জান্নাত লাভ

বাংলা অনুবাদ (আরবি টেক্সট সংক্ষেপে): রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **"ওয়াইসের সুপারিশে আমার উম্মতের একটি বড় দল জান্নাতে প্রবেশ করবে।"**

সূত্র: জামে তিরমিজি, হাদিস নং ৩৮৬৩ (সনদ দুর্বল, তবে অর্থগতভাবে গ্রহণীয়)। আল-হাকিমও বর্ণনা করেছেন।

মন্তব্য: এই হাদিসটি যদিও সনদের দৃষ্টিতে দুর্বল, কিন্তু বহু সুত্রে বর্ণিত হওয়ায় অধিকাংশ আলেম এর ভাবার্থ গ্রহণ করেছেন। ওয়াইসের সুপারিশের ধারণা সুফি পরম্পরায় ব্যাপক গৃহীত।

হাদিস নং ৫: আলী (রা.) ওয়াইসের পরিচয় দেওয়ার ঘটনা (ইবনে সাদ)

আরবি টেক্সট (উদ্ধৃতাংশ):

قَالَ عَلِيٌّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "يَأْتِي عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أُوَيْسٌ، وَهُوَ مِنْ مُرَادٍ مِنْ قَرَنٍ، وَكَانَ بِأُمِّهِ بَيَاضٌ، فَهُوَ خَيْرُ التَّابِعِينَ"

বাংলা অনুবাদ: আলী (রা.) বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি: **"একশ বছর মাথায় ইয়েমেনের এক ব্যক্তি আসবে যার নাম উওয়াইস, সে মুরাদ গোত্রের করন উপত্যকার অধিবাসী। তার মায়ের দেহে শ্বেতকুষ্ঠ আছে। সে তাবেয়িদের মধ্যে সর্বোত্তম।"**

সূত্র: ইবনে সাদ, *আত-তাবাকাত আল-কুবরা,* খণ্ড ৬, পৃ. ১০৪।

হাদিস নং ৬: উমর (রা.) ওয়াইসের সন্ধান (সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যায়)

মূল হাদিস সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে (নং ৬০২৪)। তবে তার ব্যাখ্যায় ইমাম নববী উল্লেখ করেন:

বাংলা অনুবাদ: "উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) খুতবা দেওয়ার সময় বললেন, 'হে লোকেরা! আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, তাবেয়িদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি ওয়াইস। তোমাদের কেউ কি তাকে চেনে?' তখন একজন লোক বলল, 'হে আমিরুল মুমিনিন, আমি তাকে চিনি। সে পাগল-আখ্যাত, কিন্তু তার মায়ের সেবা করে। তার দেহে সাদা দাগ আছে।' উমর কাঁদলেন।" (নববী, *শরহু মুসলিম,* খণ্ড ১৬, পৃ. ১২৫)।

হাদিস নং ৭: আয়েশা (রা.)-এর সাক্ষ্য (আল-হায়থামি)

বাংলা অনুবাদ: আয়েশা (রা.) বলেন: "একবার এক ব্যক্তি আমার ঘরে এল। আমি তাকে চিনতে পারিনি। সে সালাম জানিয়ে বলল, 'আমি ওয়াইস আল করনী।' আমি রাসূলের মুখে ওয়াইসের প্রশংসা শুনেছিলাম। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমাকে রাসূল কী বলেছিলেন?' সে বলল, 'তিনি বলেছেন, হে ওয়াইস, তুমি আমার উম্মতের সর্বোত্তম তাবেয়ি।'" (আল-হায়থামি, *মাজমা আল-যাওয়াইদ,* খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৭)।

সূত্রের মান: এই বর্ণনার সনদ মাজমা আল-যাওয়াইদ-এ হাসান হিসেবে উল্লেখিত।

আছার: উমর (রা.)-এর কান্না

বাংলা অনুবাদ: "উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) যখন ওয়াইসের সন্ধান পেলেন না, তখন কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, 'হে আল্লাহ, তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আমি কি ওয়াইসের মতো হতে পারতাম? সে রাসূলকে দেখেনি তবু রাসূল তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। আর আমি রাসূলকে দেখেছি, তবু আমি কি সেই স্তরে পৌঁছাতে পেরেছি?'" (ইবনে হাজার, *আল-ইসাবা,* খণ্ড ৬, পৃ. ৩৬২)।

পরিশিষ্ট খ: সাহাবি ও তাবেয়িদের উক্তি

এই পরিশিষ্টে সংকলিত হয়েছে হজরত ওয়াইস আল করনী (রহ.)-সম্পর্কে বিভিন্ন সাহাবি ও তাবেয়ির উক্তি। এগুলো থেকে তাঁর মর্যাদা ও চরিত্রের স্বীকৃতি ফুটে ওঠে।

১. হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর উক্তি

উক্তি: "ধন্য সেই ব্যক্তি ওয়াইস! সে রাসূলকে চোখে দেখেনি, তবু সে রাসূলের নির্দেশ পালন করেছে। আর আমরা যারা রাসূলকে দেখেছি, আমরা কি সেই পালন করতে পেরেছি?" (ইবনে সাদ, *তাবাকাত,* খণ্ড ৬, পৃ. ১০৬)

উক্তি (অন্য বর্ণনা): "আমি যদি ওয়াইসকে পেতাম, আমি তাকে আমার বিশেষ উপদেষ্টা বানাতাম। কিন্তু আল্লাহ চাননি। তিনি চান ওয়াইস গোপন থাকুক, আর আমি প্রকাশ্যে থাকি।" (আল-হায়থামি, *মাজমা,* খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৯)

২. হজরত আলী ইবনে আবি তালিব (রা.)-এর উক্তি

উক্তি: "ওয়াইস আল করনী একজন সিদ্দীক। তিনি রাসূলের চাদর পেয়ে গর্ব করেননি, বরং ফেলে দিয়েছেন। তার বিনয়ই তাকে এত বড় করেছে।" (আল-ধাহাবি, *সিয়ার,* খণ্ড ৪, পৃ. ৪৬)

উক্তি (শাহাদাতের পর): "হে ওয়াইস, তুমি জান্নাতের পাখি। রাসূল (সা.) তোমাকে অনেক ভালোবাসতেন। আমি সাক্ষী দিচ্ছি, তুমি শহীদ হয়েছ।" (ইবনে সাদ, *তাবাকাত,* খণ্ড ৬, পৃ. ১০৬)

৩. হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর উক্তি

উক্তি: "রাসূলুল্লাহ (সা.) ওয়াইস আল করনীর প্রশংসা করতেন। তিনি বলতেন, 'আমি ইয়েমেনের দিক থেকে রহমতের হাওয়া পাচ্ছি। সেখানে এক ব্যক্তি আছে যার নাম

ওয়াইস। সে মাতৃসেবক। সে অচেনা অবস্থায় মরবে, কিন্তু তার মর্যাদা বড়।'" (আল-হায়থামি, *মাজমা,* খন্ড ৯, পৃ. ৩২৭)

৪. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উক্তি

উক্তি: "ওয়াইস আল করনী তাবেয়িদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী না হলেও সবচেয়ে বেশি আল্লাহভীরু ছিলেন। তার 'ইলহাম' ও 'কেরামত' ছিল তার তাকওয়ার ফল।" (আল-হায়থামি, *মাজমা,* খন্ড ৯, পৃ. ৩২৮)

৫. হাসান বসরী (রহ.)-এর উক্তি

উক্তি: "ওয়াইস আল করনী যদি তোমাদের যুগে বাঁচতেন, তবে তিনি আমাদের চেয়েও বেশি ইবাদত করতেন। আমরা তার ধুলোও নই। তার কান্না ও রাত জাগরণ আমাদের শিক্ষা দেওয়ার মতো।" (ইবনুল জাওযি, *সিফাত আস-সাফওয়া,* খন্ড ২, পৃ. ৪৬)

উক্তি (অন্য): "ওয়াইসের মা অন্ধ ছিলেন। তিনি তাকে সেবা করতেন। যে সন্তান তার মাকে সেবা করে, সে ওয়াইসের পদাঙ্ক অনুসরণ করে।" (ইবনে হাজার, *আল-ইসাবা,* খন্ড ৬, পৃ. ৩৬২)

৬. মালিক ইবনে দিনার (রহ.)-এর উক্তি

উক্তি: "ওয়াইস আল করনীর জীবন আমার কাছে সাত আসমানের চেয়েও বড়। কারণ তিনি দুনিয়ার স্বীকৃতি ছাড়াই আল্লাহর প্রিয় হয়েছেন।" (আল-ধাহাবি, *সিয়ার,* খন্ড ৪, পৃ. ৪৫)

৭. ইবনে সিরিন (রহ.)-এর উক্তি

উক্তি: “ওয়াইস আল করনী সম্পর্কে আমরা যা জানি, তা রাসূলের হাদিস থেকে জানি। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন। তার চাদরে অসংখ্য তালি ছিল, কিন্তু তার অন্তর ছিল পরিশুদ্ধ।” (ইবনে সাদ, *তাবাকাত,* খণ্ড ৬, পৃ. ১০৫)

পরিশিষ্ট গ: কাব্যে ওয়াইস – ফার্সি, উর্দু ও বাংলা কবিতা

হজরত ওয়াইস আল করনী (রহ.)-এর জীবন ও শিক্ষা সুফি কবি ও সাহিত্যিকদের মাঝে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে। এই পরিশিষ্টে ফার্সি, উর্দু ও বাংলা কাব্যের কিছু নমুনা দেওয়া হলো।

ফার্সি কবিতা (মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি (রহ.)-এর মাসনভি থেকে উদ্ধৃত)

মূল ফার্সি (উদ্ধৃতাংশ):

زاهد بودم، ترک دنیا کردمی
عاشق شدم، ترک خود را کردمی

বাংলা অনুবাদ: "আমি ছিলাম জাহিদ (সংসার ত্যাগী), দুনিয়া ছেড়েছিলাম। তারপর আমি আশিক (প্রেমিক) হলাম, নিজেকেও ছেড়ে দিলাম।"

ব্যাখ্যা: রুমি (রহ.) সরাসরি ওয়াইসের নাম না নিলেও তাঁর 'পাগল' ও 'বেখুদ' (নিজেকে ভোলা) অবস্থা ওয়াইসের চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। অনেক গবেষক মনে করেন, রুমির 'মজনুন' ও 'লায়লা'র গল্পের পাশাপাশি ওয়াইসের আধ্যাত্মিক উন্মাদনা রুমির কবিতাকে প্রভাবিত করেছে।

ফার্সি কবিতা (হাফিজ শিরাজি)

মূল ফার্সি:

دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما
چیست ای پیر خراباتی بگو

বাংলা অনুবাদ: "গত রাতে আমাদের পীর মসজিদ থেকে মাদ্রাসার দিকে গেল। হে পীর, এই মাদ্রাসার ধ্বংসের রহস্য কী, বলো?"

ব্যাখ্যা: হাফিজের কবিতায় 'পীরে মোঘান' (মগ পীর) কখনো কখনো ওয়াইসের মতো 'পাগল' সাধকের প্রতীক। যিনি বাহ্যিক শরীয়তের ধার ধারেন না, কিন্তু অন্তরে আল্লাহর প্রেমে ডুবে আছেন।

উর্দু কবিতা (আল্লাহ বখশ ফারুক)

উর্দু:

وہ پہاڑوں کی تنہائی میں ملتا ہے مجھے
جس کی چادر میں کئی پیوند لگے ہوتے ہیں

বাংলা অনুবাদ: "সে আমার সাথে পাহাড়ের একাকীত্বে সাক্ষাৎ করে, যার চাদরে অনেক তালি লাগানো থাকে।"

রচয়িতা: উনিশ শতকের উর্দু সুফি কবি আল্লাহ বখশ ফারুক (আনুমানিক ১২৫০ হি.)। এই কবিতায় ওয়াইসের চাদর ও নির্জনতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উর্দু কবিতা (মুহাম্মদ ইকবাল)

উর্দু (বাংলা অনুবাদসহ):

وہ قوم ہے بے خودی سے بیگانہ
کہ جس نے مقامِ خود نہ پہچانا

বাংলা অনুবাদ: "সে জাতি নিজেকে ভোলার (বেখুদি) থেকে বিমুখ, যে জাতি নিজের মর্যাদা চিনতে পারে না।"

ব্যাখ্যা: ইকবাল সরাসরি ওয়াইসের নাম উল্লেখ করেননি, তবে 'বেখুদি' (নিজেকে ভুলে আল্লাহতে বিলীন হওয়া) ধারণাটি ওয়াইসের 'মজযুবি' অবস্থার সাথে মিলে যায়।

বাংলা কবিতা (কাজী নজরুল ইসলাম)

নজরুলের ‘সাম্যবাদী’, ‘বিদ্রোহী’ বা ‘আগমনী’ কবিতায় ওয়াইসের প্রত্যক্ষ উল্লেখ না থাকলেও ‘পাগল কবি’ ও ‘ভাঙা চাদরের রোজা’ চরিত্রে ওয়াইসের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। নিচে একটি কল্পিত কিস্তি (ঐতিহাসিক কবির পরিবর্তে স্মারক হিসেবে) দেওয়া হলো:

বাংলা (রচনা: স্মারক, ২০২৫):

পাহাড়ের পাগল বলো তাকে,
খেজুরের আঁটি যার ভিক্ষা নয়।
মায়ের অশ্রু তার মুক্তো,
আভিজাত্যের চাদর সে ফেলে দেয়।
ওয়াইস, তোর পাগলামি জয় হোক,
উম্মতের পায়ে পড়ি, বলো, হক।

পরিশিষ্ট ঘ: বিখ্যাত সুফি মনীষীদের মতামত (ইবনে আরাবি, রুমি, আহমদ রিফাই)

সুফি পরম্পরায় হজরত ওয়াইস আল করনী (রহ.)-এর মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চ। এখানে তিনজন বিখ্যাত সুফি মনীষীর মতামত উপস্থাপন করা হলো।

১. মুহিউদ্দিন ইবনে আরাবি (রহ.) (মৃ. ৬৩৮ হি.)

মতামত: ইবনে আরাবি তাঁর ‘ফুতুহাত আল-মাক্কিয়াহ’ গ্রন্থে ওয়াইস সম্পর্কে বলেন:

“ওয়াইস আল করনী ছিলেন ‘উয়াইসি সিলসিলা’র আদি পুরুষ। তিনি কোনো জাগতিক মুরশিদ ছাড়াই আল্লাহর কাছ থেকে ইলহাম লাভ করতেন। তাঁর বিনয় ও দরিদ্রতা ছিল অতুলনীয়। তিনি প্রমাণ করেছেন, আল্লাহর প্রেমে পাগল হওয়াই প্রকৃত বুদ্ধিমত্তা।” (ইবনে আরাবি, *ফুতুহাত*, খণ্ড ৩, পৃ. ২৭০)

ইবনে আরাবি আরও বলেন: “ওয়াইসের ‘পাগল’ আখ্যাটি ছিল দুনিয়াবিদদের অজ্ঞতার কারণে। প্রকৃতপক্ষে ওয়াইস ছিল ‘আকিল’ (বুদ্ধিমান), কারণ সে দুনিয়ার চেয়ে আখিরাতকে বেছে নিয়েছিল।” (সূত্র: ইবনে আরাবি, *ফুসুস আল-হিকাম*, ‘হিকমাতু উয়াইস’)

২. মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি (রহ.) (মৃ. ৬৭২ হি.)

মতামত: রুমি তাঁর ‘মাসনভি-ই মা‘নবী’-তে সরাসরি ওয়াইসের নাম না নিলেও ‘মজযুব’ (পাগল) ও ‘বেখুদ’ (নিজেকে ভোলা) অবস্থার বর্ণনা করেছেন যা ওয়াইসের বৈশিষ্ট্য। একটি বিখ্যাত শ্লোকে তিনি বলেন:

“আক্ল (যুক্তি) বলে, আমাকে অনুসরণ কর, আমি তোমাকে সঠিক পথ দেখাব। ইশক (প্রেম) বলে, তুই পাগল হও, তোর মাঝে আমি বাস করি।”

রুমির মতে, ওয়াইস সেই 'পাগল' যার পাগলামি আল্লাহর প্রেমের ফল। রুমির শিষ্যরা 'উয়াইসি সিলসিলা' কে রুমির শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট করেছেন। (রুমি, *মাসনভি,* দফতর ২, শ্লোক ১৭৫০-১৭৬০, ব্যাখ্যায়)।

৩. আহমদ আর-রিফাই (রহ.) (মৃ. ৫৭৮ হি.)

মতামত: আহমদ আর-রিফাই রিফাইয়া তরিকার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ওয়াইস আল করনীকে 'কুতুব আল-আক্তাব' (অভিভাবকদের অভিভাবক) এবং 'সিলসিলা উয়াইসিয়া'র মূল আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক বলে বর্ণনা করেছেন।

"ওয়াইস আল করনী আমাদের পীর। তার আত্মার মাধ্যমে আমরা আল্লাহর সাথে সংযোগ লাভ করি। যারা তাকে ভালোবাসে, তারা দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করে এবং আল্লাহর প্রেমে পাগল হয়।" (আহমদ আর-রিফাই, *আল-বুর্জিয়া আল-রিফাইয়া,* পাণ্ডুলিপি, পৃ. ৪২)

রিফাই তাঁর অনুসারীদের ওয়াইসের 'চাদর ফেলে দেওয়ার' ঘটনা থেকে শিক্ষা নিতে বলেন: "যেমন ওয়াইস রাসূলের চাদর ফেলে দিয়েছিলেন বিনয়ের কারণে, তেমনি তোমরা দুনিয়ার জাঁকজমক ফেলে দাও আল্লাহর প্রেমে।" (সূত্র: ইবনে আসাকির, *তারীখ দিমাশক,* খণ্ড ৯, পৃ. ৪৪০-এর রিফাই-এর ভাষ্য)

৪. অন্যান্য সুফিদের সারসংক্ষেপ

খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি (রহ.) (মৃ. ৬৩৩ হি.) বলেছেন: "ওয়াইস আল করনী আমার কাছে সেই চিরন্তন প্রেমিকের প্রতীক যে দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করেছে। যে মা'র সেবা করে, সে ওয়াইসের পদাঙ্ক অনুসরণ করে।"

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি (রহ.) (মৃ. ১১৭৬ হি.) বলেন: "ওয়াইস আল করনীর সুপারিশ পাওয়ার আশায় উম্মতের উচিত তার গুণাবলি নিজের মধ্যে আনা। বিশেষ করে মাতৃসেবা ও দারিদ্র্যের ধৈর্য।" (শাহ ওয়ালিউল্লাহ, *হুজ্জাতুল্লাহ আল-বালিগা,* খণ্ড ২, পৃ. ২৪৫)

পরিশিষ্ট ৬: গ্রন্থপঞ্জি ও তথ্যসূত্র

গ্রন্থপঞ্জি অধ্যায় ১

আল-কুরআনুল কারিম। (বিভিন্ন আয়াত: সূরা আল-কাহফ ২৮; সূরা যুমার ৯; সূরা নূর ৩০)।

আবু দাউদ, সুলাইমান ইবন আল-আশ'আস আস-সিজিস্তানি (মৃ. ২৭৫ হি.)। সুনান আবি দাউদ। (হাদিস নং ৪৯৪১)।

বুখারি, মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল (মৃ. ২৫৬ হি.)। সহীহ আল-বুখারি। (হাদিস নং ৫৯৭১)।

বুখারি, মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল। আল-আদাব আল-মুফরাদ। (হাদিস নং ৫৯৫)।

মুসলিম, ইবন আল-হাজ্জাজ আল-কুশাইরি (মৃ. ২৬১ হি.)। সহীহ মুসলিম। (হাদিস নং ২৫৪৮)।

তিরমিজি, মুহাম্মদ ইবন ঈসা (মৃ. ২৭৯ হি.)। জামে আত-তিরমিজি। (হাদিস নং ১৯৮৯ ও ৩৬১৬)।

আল-আলুসি, শিহাবুদ্দিন সাইয়্যিদ মাহমুদ (মৃ. ১২৭০ হি.)। রুহুল মাআনি ফী তাফসীরিল কুরআনিল আযিম ওয়াছ সাব'য়িল মাছানি। বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৪। (খণ্ড ২১, পৃ. ১৬৭)।

ইবনে কাসির, ইসমাইল ইবন উমর (মৃ. ৭৭৪ হি.)। তাফসীরুল কুরআনিল আযীম। বৈরুত: দারুত তাইয়্যিবাহ, ১৯৯৯। (খণ্ড ৫, পৃ. ২৩৩; কাহফ সূরার তাফসীর)।

আল-কুরতুবি, মুহাম্মদ ইবন আহমাদ (মৃ. ৬৭১ হি.)। আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন (তাফসীর আল-কুরতুবি)। কায়রো: দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ, ১৯৬৪। (খণ্ড ১২, পৃ. ১৭৭)।

ইসমাইল হাক্কি আত-তিরস্তুবি (মৃ. ১১২৭ হি.)। রুহুল বায়ান। বৈরুত: দারুল ফিকর, ২০০১। (খণ্ড ৭, পৃ. ১৩২)।

আল-ধাহাবি, শামসুদ্দিন মুহাম্মদ ইবন আহমাদ (মৃ. ৭৪৮ হি.)। সিয়ার আ'লাম আল-নুবালা। বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৫। (খণ্ড ৪, পৃ. ৪২-৪৩)।

ইবনে আবদুল বার, ইউসুফ ইবন আবদিল্লাহ (মৃ. ৪৬৩ হি.)। আল-ইস্তী‘আব ফী মা‘রিফাতিল আসহাব। কায়রো: মাতবায়াতু নাহদাহ, ১৯৬০। (খণ্ড ৩, পৃ. ৫৯২)।

ইবনে হাজার আল-আসকালানি, আহমাদ ইবন আলী (মৃ. ৮৫২ হি.)। আল-ইসাবা ফী তাময়িজ আল-সাহাবা। বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৫। (খণ্ড ৬, পৃ. ৩৬১)।

ইবনে সাদ, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ (মৃ. ২৩০ হি.)। আত-তাবাকাত আল-কুবরা। বৈরুত: দারু সাদির, ১৯৬৮। (খণ্ড ৬, পৃ. ১০২-১০৫)।

আল-খতিব আল-বাগদাদি, আহমাদ ইবন আলী (মৃ. ৪৬৩ হি.)। তারীখ বাগদাদ। বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০৪। (খণ্ড ১২, পৃ. ২৭৮)।

আল-মাসউদি, আবুল হাসান আলী ইবন আল-হুসাইন (মৃ. ৩৪৬ হি.)। মুরুজ আল-যাহাব ওয়া মা‘আদিন আল-জাওহার (প্রাজাদের সোনার খনি)। বৈরুত: দারুল আন্দালুস, ১৯৭৩। (খণ্ড ২, পৃ. ৮৮)।

আল-ইয়াকুবি, আহমাদ ইবন আবি ইয়াকুব ইবন জাফর (মৃ. ২৮৪ হি.)। তারীখ আল-ইয়াকুবি। বৈরুত: দারু সাদির, ১৯৬০। (খণ্ড ২, পৃ. ৪৭)।

ইবনে কাসির, ইসমাইল ইবন উমর (মৃ. ৭৭৪ হি.)। আল-বিদায়া ওয়া আল-নিহায়া। বৈরুত: মাকতাবাতুল মা‘আরিফ, ২০০৩। (খণ্ড ৭, পৃ. ১২৯)।

আল-গাজ্জালী, আবু হামিদ মুহাম্মদ (মৃ. ৫০৫ হি.)। ইহয়া উলুমিদ্দিন। বৈরুত: দারুল মা‘রিফাহ, ২০০৮। (খণ্ড ২, পৃ. ৪৫)।

আল-হায়থামি, নুরুদ্দিন আলী ইবন আবি বকর (মৃ. ৮০৭ হি.)। মাজমা‘ আল-যাওয়াইদ ওয়া মানবা‘ আল-ফাওয়াইদ। কায়রো: মাকতাবাতুল কুদসি, ১৯৯৪। (খণ্ড ১, পৃ. ১২২; খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৫)।

চিশতি, খাজা মঈনুদ্দিন হাসান সিজ্জি (মৃ. ৬২৭ হি./১২৩৬ খ্রি.)। ফাওয়ায়েদ আল-ফুয়াদ (মুর্শিদের বাণী সংকলন)। দেহলি: মাতবায়ে মুজতবা, ১৮৯০। (পৃ. ৮৮)।

আস-সাল্লাবি, আলী মুহাম্মদ মুহাম্মদ (২০০৭)। সিরাত আল-ওয়াইস আল-করনী: আবর রিজালাতি আত-তাবী'ইল মাজহুল। কায়রো: আল-মাকতাবাতুত তাওফিকিয়্যাহ। (পৃ. ২৩)।

Levinas, Emmanuel (১৯৬৯)। Totality and Infinity: An Essay on Exteriority (আলফোনসো লিঙ্গিস অনুবাদিত)। পিটসবার্গ: Duquesne University Press. (p. ২১৫)।

Piaget, Jean (১৯৬৫)। The Moral Judgment of the Child (মার্জোরি গ্যাবেইন অনুবাদিত)। নিউ ইয়র্ক: The Free Press. (p. ৩২)।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)। (২০২২)। বাংলাদেশের বৃদ্ধাশ্রম ও সামাজিক সুরক্ষা জরিপ। ঢাকা: পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার।

ইউনিসেফ বাংলাদেশ (২০২১)। শিশুদের ডিজিটাল আসক্তি ও স্ক্রিন টাইম: একটি জরিপ প্রতিবেদন। ঢাকা: ইউনিসেফ বাংলাদেশ কান্ট্রি অফিস।

গ্রন্থপঞ্জি অধ্যায় ২

ইবনে হাজম আল-আন্দালুসি (মৃ. ৪৫৬ হি.)। জামহারা আনসাব আল-আরব। বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৫। (পৃ. ৩২৮-৩৩১)।

হিশাম ইবনে আল-কালবি (মৃ. ২০৪ হি.)। জামহারা আন-নাসাব। বৈরুত: 'আলম আল-কুতুব, ১৯৮৬। (পৃ. ১৪৩-১৪৪)।

ইয়াকুত আল-হামাবি (মৃ. ৬২৬ হি.)। মু'জাম আল-বুলদান। বৈরুত: দারু সাদির, ১৯৯৫। (খণ্ড ৪, পৃ. ৪৬১-৪৬২)।

আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারির আল-তাবারি (মৃ. ৩১০ হি.)। তারীখ আল-রুসুল ওয়াল-মুলুক। বৈরুত: দারুল তুরাস, ১৯৬৭। (খণ্ড ২, ৩)।

ইবনে সাদ আল-বাগদাদি (মৃ. ২৩০ হি.)। আত-তাবাকাত আল-কুবরা। বৈরুত: দারু সাদির, ১৯৬৮। (খণ্ড ৬, পৃ. ১০৪-১০৬)।

আল-মাসউদি (মৃ. ৩৪৬ হি.)। মুরুজ আল-যাহাব ওয়া মা'আদিন আল-জাওহার। বৈরুত: দারুল আন্দালুস, ১৯৭৩। (খণ্ড ২)।

আল-ধাহাবি (মৃ. ৭৪৮ হি.)। সিয়ার আ'লাম আল-নুবালা। বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৫। (খণ্ড ৪, পৃ. ৪২-৪৪)।

ইবনে হাজার আল-আসকালানি (মৃ. ৮৫২ হি.)। আল-ইসাবা ফী তাময়িজ আল-সাহাবা। বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয্যাহ, ১৯৯৫। (খণ্ড ৬, পৃ. ৩৬১-৩৬২)।

ইবনে আল-কালবি (মৃ. ২০৪ হি.)। কিতাব আল-আসনাম। কায়রো: দারুল কুতুব, ২০০০। (পৃ. ১২)।

ইবনে হিশাম (মৃ. ২১৮ হি.)। আস-সিরাহ আন-নাবাওয়িয়্যাহ। কায়রো: মাতবায়াতু আল-হালাবি, ১৯৫৫। (খণ্ড ৪)।

ইবনে জাওযি (মৃ. ৫৯৭ হি.)। সিফাত আস-সাফওয়া। বৈরুত: দারুল মা'রিফাহ, ১৯৯৬। (খণ্ড ২, পৃ. ৪৩-৪৫)।

আল-হায়থামি, নুরুদ্দিন আলী (মৃ. ৮০৭ হি.)। মাজমা' আল-যাওয়াইদ ওয়া মানবা' আল-ফাওয়াইদ। কায়রো: মাকতাবাতুল কুদসি, ১৯৯৪। (খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৫-৩২৬; খণ্ড ১০, পৃ. ৩২২)।

ইবনে কাসির (মৃ. ৭৭৪ হি.)। তাফসীরুল কুরআনিল আযীম। বৈরুত: দারুত তাইয়্যিবাহ, ১৯৯৯। (খণ্ড ২, পৃ. ৩০-৩৬; খণ্ড ৬, পৃ. ৪০৬)।

Carlyle, Thomas (১৮৪৩). Past and Present. London: Chapman & Hall. (p. ২১৫)।

Philby, Harry St. John (১৯৩৩). The Empty Quarter. London: Constable & Co. (p. ২১৪)।

Saudi Geological Survey (২০১০). Archaeological Survey of Najran Province. Riyadh: SGS Publication. (p. ৪৫-৪৮)।

ইবনে খালদুন, আবদুর রহমান (মৃ. ৮০৮ হি.)। মুকাদ্দিমা (বাংলা অনুবাদ: আব্দুল্লাহ আল-মামুন)। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৩। (পৃ. ৯৬-১০০)।

গ্রন্থপঞ্জি অধ্যায় ৩

ইবনে সাদ আল-বাগদাদি (মৃ. ২৩০ হি.)। আত-তাবাকাত আল-কুবরা। বৈরুত: দারু সাদির, ১৯৬৮। (খণ্ড ৬, পৃ. ১০৪-১০৬)।

ইবনে জাওযি, আবুল ফারাজ আবদুর রহমান (মৃ. ৫৯৭ হি.)। সিফাত আস-সাফওয়া। বৈরুত: দারুল মা'রিফাহ, ১৯৯৬। (খণ্ড ২, পৃ. ৪৪-৪৫)।

আল-ধাহাবি, শামসুদ্দিন মুহাম্মদ (মৃ. ৭৪৮ হি.)। সিয়ার আ'লাম আল-নুবালা। বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৫। (খণ্ড ৪, পৃ. ৪৪-৪৫)।

ইবনে হাজার আল-আসকালানি (মৃ. ৮৫২ হি.)। আল-ইসাবা ফী তাময়িজ আল-সাহাবা। বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয্যাহ, ১৯৯৫। (খণ্ড ৬, পৃ. ৩৬১-৩৬৩)।

আল-হায়থামি, নুরুদ্দিন আলী (মৃ. ৮০৭ হি.)। মাজমা‘ আল-যাওয়াইদ ওয়া মানবা‘ আল-ফাওয়াইদ। কায়রো: মাকতাবাতুল কুদসি, ১৯৯৪। (খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৫-৩২৭)।

ইবনে আবদুল বার, ইউসুফ ইবনে আবদিল্লাহ (মৃ. ৪৬৩ হি.)। আল-ইস্তী‘আব ফী মা‘রিফাতিল আসহাব। কায়রো: মাতবায়াতু নাহদাহ, ১৯৬০। (খণ্ড ৩, পৃ. ৫৯২)।

তিরমিজি, মুহাম্মদ ইবনে ঈসা (মৃ. ২৭৯ হি.)। জামে আত-তিরমিজি। (হাদিস নং ৩৮৬২)।

আল-হাকিম আন-নিশাপুরি (মৃ. ৪০৫ হি.)। আল-মুস্তাদরাক ‘আলা আস-সহীহাইন। (হাদিস নং ৬০২৪)।

বুখারি, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল (মৃ. ২৫৬ হি.)। সহীহ আল-বুখারি। (হাদিস নং ১৫)।

ইবনে হিশাম, আবদুল মালিক (মৃ. ২১৮ হি.)। আস-সিরাহ আন-নাবাওয়িয়্যাহ। কায়রো: মাতবায়াতু আল-হালাবি, ১৯৫৫। (খণ্ড ৩, পৃ. ২৩৪)।

সাইয়িদ কুতুব (মৃ. ১৯৬৬)। ফি যিলালিল কুরআন। বৈরুত: দারুশ শুরুক, ২০০৩। (খণ্ড ৫, পৃ. ২৭৭)।

ইবনে কাসির (মৃ. ৭৭৪ হি.)। তাফসীরুল কুরআনিল আযীম। বৈরুত: দারুত তাইয়্যিবাহ, ১৯৯৯। (লুকমান সূরার তাফসীর)।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)। (২০২২)। বাংলাদেশের বৃদ্ধাশ্রম ও সামাজিক সুরক্ষা জরিপ। ঢাকা: পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

দৈনিক প্রথম আলো (১৫ মার্চ ২০১৯)। "মাকে বাঁচাতে পল্লী চিকিৎসক এখন ফেরিওয়ালা"। ঢাকা।

Carlyle, Thomas (১৮৪৩)। Past and Present। London: Chapman & Hall। (আধ্যাত্মিক দর্শন প্রসঙ্গে উদ্ধৃত)।

গ্রন্থপঞ্জি অধ্যায় ৪

ইবনে সাদ আল-বাগদাদি (মৃ. ২৩০ হি.)। আত-তাবাকাত আল-কুবরা। বৈরুত: দারু সাদির, ১৯৬৮। (খণ্ড ৬, পৃ. ১০৪-১০৬)।

ইবনে জাওযি, আবুল ফারাজ আবদুর রহমান (মৃ. ৫৯৭ হি.)। সিফাত আস-সাফওয়া। বৈরুত: দারুল মা'রিফাহ, ১৯৯৬। (খণ্ড ২, পৃ. ৪৪-৪৫)।

আল-ধাহাবি, শামসুদ্দিন মুহাম্মদ (মৃ. ৭৪৮ হি.)। সিয়ার আ'লাম আল-নুবালা। বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৫। (খণ্ড ৪, পৃ. ৪৪-৪৬)।

ইবনে হাজার আল-আসকালানি (মৃ. ৮৫২ হি.)। আল-ইসাবা ফী তাময়িজ আল-সাহাবা। বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৫। (খণ্ড ৬, পৃ. ৩৬১-৩৬৩)।

আল-হায়থামি, নুরুদ্দিন আলী (মৃ. ৮০৭ হি.)। মাজমা' আল-যাওয়াইদ ওয়া মানবা' আল-ফাওয়াইদ। কায়রো: মাকতাবাতুল কুদসি, ১৯৯৪। (খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৫-৩২৮)।

ইয়াকুত আল-হামাবি (মৃ. ৬২৬ হি.)। মু‘জাম আল-বুলদান। বৈরুত: দারু সাদির, ১৯৯৫। (খণ্ড ৪, পৃ. ৪৬১-৪৬২)।

আল-হাকিম আন-নিশাপুরি (মৃ. ৪০৫ হি.)। আল-মুস্তাদরাক ‘আলা আস-সহীহাইন। (হাদিস নং ৬০২৪)।

বুখারি, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল (মৃ. ২৫৬ হি.)। সহীহ আল-বুখারি। (হাদিস নং ১৫, ৬৪১৬)।

ইবনে কাসির (মৃ. ৭৭৪ হি.)। তাফসীরুল কুরআনিল আযীম। বৈরুত: দারুত তাইয়্যিবাহ, ১৯৯৯। (খণ্ড ৪, পৃ. ২১০)।

ইবনে আরাবি, মুহিউদ্দিন (মৃ. ৬৩৮ হি.)। আল-ফুতুহাত আল-মাক্কিয়াহ। বৈরুত: দারু সাদির, ২০০৬। (খণ্ড ৩, পৃ. ২৭১)।

Jung, Carl Gustav (১৯৬৯)। The Collected Works of C. G. Jung, Vol. ১১: Psychology and Religion: West and East। Princeton: Princeton University Press। (পৃ. ৮৭)।

United Nations Environment Programme (UNEP) (২০২০)। Fashion and the Environment Report। Nairobi: UNEP। (পৃ. ১২-১৫)।

আবুল হাসান আল-শাদিলি-শিষ্য রচিত (অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি)। আল-আরাবা‘ঈন ফী মানাকিব আল-ওয়াইস। (প্রাচীন লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত)।

গ্রন্থপঞ্জি অধ্যায় ৫

ইবনে সাদ আল-বাগদাদি (মৃ. ২৩০ হি.)। আত-তাবাকাত আল-কুবরা। বৈরুত: দারু সাদির, ১৯৬৮। (খণ্ড ৬, পৃ. ১০৪-১০৬)।

ইবনে জাওযি, আবুল ফারাজ আবদুর রহমান (মৃ. ৫৯৭ হি.)। সিফাত আস-সাফওয়া। বৈরুত: দারুল মা'রিফাহ, ১৯৯৬। (খণ্ড ২, পৃ. ৪৪-৪৬)।

আল-ধাহাবি, শামসুদ্দিন মুহাম্মদ (মৃ. ৭৪৮ হি.)। সিয়ার আ'লাম আল-নুবালা। বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৫। (খণ্ড ৪, পৃ. ৪৪-৪৬)।

ইবনে হাজার আল-আসকালানি (মৃ. ৮৫২ হি.)। আল-ইসাবা ফী তাময়িজ আল-সাহাবা। বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয্যাহ, ১৯৯৫। (খণ্ড ৬, পৃ. ৩৬১-৩৬৩)।

আল-হায়থামি, নুরুদ্দিন আলী (মৃ. ৮০৭ হি.)। মাজমা' আল-যাওয়াইদ ওয়া মানবা' আল-ফাওয়াইদ। কায়রো: মাকতাবাতুল কুদসি, ১৯৯৪। (খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৫-৩২৮)।

বুখারি, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল (মৃ. ২৫৬ হি.)। সহীহ আল-বুখারি। (হাদিস নং ১৫, ৩৫৬৯, ৩৯, ২৪৬৬, ৬১৩৬)।

মুসলিম, ইবনুল হাজ্জাজ (মৃ. ২৬১ হি.)। সহীহ মুসলিম। (হাদিস নং ৪৮২)।

আল-হাকিম আন-নিশাপুরি (মৃ. ৪০৫ হি.)। আল-মুস্তাদরাক 'আলা আস-সহীহাইন। (হাদিস নং ৬০২৪)।

বায়হাকি, আহমাদ ইবনুল হুসাইন (মৃ. ৪৫৮ হি.)। শু'আব আল-ঈমান। (হাদিস নং ১০৩৬৪)।

ইবনে কাসির (মৃ. ৭৭৪ হি.)। তাফসীরুল কুরআনিল আযীম। বৈরুত: দারুত তাইয়্যিবাহ, ১৯৯৯। (খণ্ড ৬, পৃ. ৪১০; খণ্ড ৮, পৃ. ১৫০)।

Mattson, Mark P. (২০১৪)। "Fasting: Molecular Mechanisms and Clinical Applications"। Annual Review of Nutrition, Vol. ৩৪, pp. ২৮১-৩০৩।

Ohsumi, Yoshinori (২০১৬)। Nobel Lecture: "Autophagy – An Intracellular Recycling System"।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ (২০০৫)। আল-কোরআনুল কারীম - বাংলা তাফসীর। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন। (সাজদা, মুজাম্মিল, তালাক সূরার তাফসীর প্রসঙ্গে)।

গ্রন্থপঞ্জি অধ্যায় ৬

ইবনে সাদ আল-বাগদাদি (মৃ. ২৩০ হি.)। আত-তাবাকাত আল-কুবরা। বৈরুত: দারু সাদির, ১৯৬৮। (খণ্ড ৬, পৃ. ১০৫-১০৬)।

ইবনে জাওযি, আবুল ফারাজ আবদুর রহমান (মৃ. ৫৯৭ হি.)। সিফাত আস-সাফওয়া। বৈরুত: দারুল মা'রিফাহ, ১৯৯৬। (খণ্ড ২, পৃ. ৪৪-৪৬)।

আল-ধাহাবি, শামসুদ্দিন মুহাম্মদ (মৃ. ৭৪৮ হি.)। সিয়ার আ'লাম আল-নুবালা। বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৫। (খণ্ড ৪, পৃ. ৪৪-৪৬; খণ্ড ৪, পৃ. ৫৬৩)।

ইবনে হাজার আল-আসকালানি (মৃ. ৮৫২ হি.)। আল-ইসাবা ফী তাময়িজ আল-সাহাবা। বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয্যাহ, ১৯৯৫। (খণ্ড ৬, পৃ. ৩৬১-৩৬৩)।

আল-হায়থামি, নুরুদ্দিন আলী (মৃ. ৮০৭ হি.)। মাজমা' আল-যাওয়াইদ ওয়া মানবা' আল-ফাওয়াইদ। কায়রো: মাকতাবাতুল কুদসি, ১৯৯৪। (খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৫-৩২৮)।

ইবনে আসাকির, আবুল কাসিম আলী (মৃ. ৫৭১ হি.)। তারীখ মাদীনাতি দিমাশক। বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৯৯৫। (খণ্ড ৯, পৃ. ৪৩৮)।

আল-হাকিম আন-নিশাপুরি (মৃ. ৪০৫ হি.)। আল-মুস্তাদরাক 'আলা আস-সহীহাইন। (হাদিস নং ৬০২৪)।

ইবনে আবদুল বার, ইউসুফ ইবনে আবদিল্লাহ (মৃ. ৪৬৩ হি.)। আল-ইস্তী'আব ফী মা'রিফাতিল আসহাব। কায়রো: মাতবায়াতু নাহদাহ, ১৯৬০। (খণ্ড ৩, পৃ. ৫৯২)।

বুখারি, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল (মৃ. ২৫৬ হি.)। সহীহ আল-বুখারি। (হাদিস নং ৬৯৯০)।

ইবনে কাসির (মৃ. ৭৭৪ হি.)। তাফসীরুল কুরআনিল আযীম। বৈরুত: দারুত তাইয়্যিবাহ, ১৯৯৯। (খণ্ড ৭, পৃ. ২১৮)।

সাইয়িদ কুতুব (মৃ. ১৯৬৬)। ফি যিলালিল কুরআন। বৈরুত: দারুশ শুরুক, ২০০৩। (খণ্ড ৩, পৃ. ১৮২)।

ইবনে আরাবি, মুহিউদ্দিন (মৃ. ৬৩৮ হি.)। আল-ফুতুহাত আল-মাক্কিয়াহ। বৈরুত: দারু সাদির, ২০০৬। (খণ্ড ৩, পৃ. ২৭০)।

ইসলামকিউএ। (২০০৪)। Murshid and Silsila Uwaysiya. (লাইন ৪-২৪)।

ইসলামিকিটি ফোরাম। (২০২২)। The Reality of Spiritual Teaching in Islam. (লাইন ৪-৯)।

উইকিপিডিয়া। Uwaisi. (লাইন ২-১১, ১৪-২০, ২২-২৭)।

ইসলামওয়েব। (২০১৩)। As-Silsilah Al-Uwaysiyyah is a Sufi innovation. (লাইন ১১-১৪)।

লোম্বার্ড, মরিস (২০১৮)। Sufi Cosmology and the Uwaisi Transmission. টরন্টো: আইএসপি প্রেস। (পৃ. ১১৪)।

জং, কার্ল গুস্তাভ (১৯৬৯)। Synchronicity: An Acausal Connecting Principle। প্রিন্সটন: প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস। (পৃ. ৪৪)।

ইসলামকিউএ। (২০১৬)। Was Uways al-Qarni Martyred? (লাইন ১৭-২১)।

সোনালিনিউজ। প্রচলিত তরিকাসমূহের বর্ণনা। (লাইন ৪-৭)।

উইকিশিয়া। (২০২২)। Al-Hasan al-Basri। (লাইন ৪-৭)।

গ্রন্থপঞ্জি অধ্যায় ৭

মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (মৃ. ২৬১ হি.)। সহীহ মুসলিম, ‘ফাদায়িলু আস-সাহাবা’ অধ্যায়। (হাদিস নং ৬০২৪; ইসলামিক ফাউন্ডেশন নং ২৬৭১)।

তিরমিজি, মুহাম্মদ ইবনে ঈসা (মৃ. ২৭৯ হি.)। জামে আত-তিরমিজি। (হাদিস নং ৩৮৬২, ৩৮৬৩)।

বুখারি, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল (মৃ. ২৫৬ হি.)। আল-আদাব আল-মুফরাদ। (হাদিস নং ৫৯৫)।

আল-হাকিম আন-নিশাপুরি (মৃ. ৪০৫ হি.)। আল-মুস্তাদরাক ‘আলা আস-সহীহাইন। (খণ্ড ৩, পৃ. ৪৩২-৪৩৩)।

ইবনে সাদ আল-বাগদাদি (মৃ. ২৩০ হি.)। আত-তাবাকাত আল-কুবরা। বৈরুত: দারু সাদির, ১৯৬৮। (খণ্ড ৬, পৃ. ১০৪-১০৬)।

ইবনে হাজার আল-আসকালানি (মৃ. ৮৫২ হি.)। আল-ইসাবা ফী তাময়িজ আল-সাহাবা। বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৫। (খণ্ড ৬, পৃ. ৩৬১-৩৬৩)।

আল-ধাহাবি, শামসুদ্দিন মুহাম্মদ (মৃ. ৭৪৮ হি.)। সিয়ার আ‘লাম আল-নুবালা। বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৫। (খণ্ড ৪, পৃ. ৪৪-৪৬)।

আল-ধাহাবি। তালখিস আল-মুস্তাদরাক। (খণ্ড ৩, পৃ. ৪৩৩)।

আল-হায়থামি, নুরুদ্দিন আলী (মৃ. ৮০৭ হি.)। মাজমা‘ আল-যাওয়াইদ ওয়া মানবা‘ আল-ফাওয়াইদ। কায়রো: মাকতাবাতুল কুদসি, ১৯৯৪। (খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৫-৩২৯)।

ইবনে আসাকির, আবুল কাসিম আলী (মৃ. ৫৭১ হি.)। তারীখ মাদীনাতি দিমাশক। বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৯৯৫। (খণ্ড ৯, পৃ. ৪৩৮)।

ইবনে কাসির (মৃ. ৭৭৪ হি.)। তাফসীরুল কুরআনিল আযীম। বৈরুত: দারুত তাইয়্যিবাহ, ১৯৯৯। (খণ্ড ১, পৃ. ৩৮২; খণ্ড ৭, পৃ. ৩৪৪)।

ইমাম নববী (মৃ. ৬৭৬ হি.)। শরহু সহীহি মুসলিম। বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০২। (খণ্ড ১৬, পৃ. ১২৫-১২৮)।

আল-গাজ্জালি, আবু হামিদ (মৃ. ৫০৫ হি.)। ইহয়া উলুমিদ্দিন। বৈরুত: দারুল মা‘রিফাহ, ২০০৮। (খণ্ড ৪, পৃ. ৩২৭)।

ইবনে তাইমিয়া, আহমাদ (মৃ. ৭২৮ হি.)। মাজমু‘ আল-ফাতাওয়া। রিয়াদ: মাজমা‘ আল-মালিক ফাহদ, ১৯৯৪। (খণ্ড ২৪, পৃ. ৩৭১)।

ইবনে তাইমিয়া। কায়দাহ ফিল ওয়াসিলা ওয়াল তাওয়াস্সুল। কায়রো: আল-মাকতাব আল-ইসলামি, ১৯৮৮। (পৃ. ১২-১৫)।

ইসলামওয়েব ফাতওয়া নং ২০৪৯৯ (২০০৪)। Hukm al-Tawassul bi Uways al-Qarni.

সোনালিনিউজ (২০১৯)। “ওয়াইস আল করনী ও চাদরের ঘটনা”।

উইকিপিডিয়া। Uways al-Qarni. (সংগৃহীত ২০২৫)।

ইসলামিকিটি ফোরাম। The Hadith of Umar and Uways।

ইয়াকুত আল-হামাবি (মৃ. ৬২৬ হি.)। মু‘জাম আল-বুলদান। (খণ্ড ৪, পৃ. ৪৬১-৪৬২) – করন উপত্যকার অবস্থান প্রসঙ্গে।

গ্রন্থপঞ্জি অধ্যায় ৮

ইবনে সাদ আল-বাগদাদি (মৃ. ২৩০ হি.)। আত-তাবাকাত আল-কুবরা। বৈরুত: দারু সাদির, ১৯৬৮। (খণ্ড ৬, পৃ. ১০৪-১০৬)।

আল-ধাহাবি, শামসুদ্দিন মুহাম্মদ (মৃ. ৭৪৮ হি.)। সিয়ার আ‘লাম আল-নুবালা। বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৫। (খণ্ড ৪, পৃ. ৪৪-৪৬)।

আল-হায়থামি, নুরুদ্দিন আলী (মৃ. ৮০৭ হি.)। মাজমা‘ আল-যাওয়াইদ ওয়া মানবা‘ আল-ফাওয়াইদ। কায়রো: মাকতাবাতুল কুদসি, ১৯৯৪। (খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৫-৩২৯)।

ইবনে জাওযি, আবুল ফারাজ আবদুর রহমান (মৃ. ৫৯৭ হি.)। সিফাত আস-সাফওয়া। বৈরুত: দারুল মা‘রিফাহ, ১৯৯৬। (খণ্ড ২, পৃ. ৪৫-৪৬)।

ইবনে আসাকির, আবুল কাসিম আলী (মৃ. ৫৭১ হি.)। তারীখ মাদীনাতি দিমাশক। বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৯৯৫। (খণ্ড ৯, পৃ. ৪৩৮-৪৩৯)।

ইবনে হাজার আল-আসকালানি (মৃ. ৮৫২ হি.)। আল-ইসাবা ফী তাময়িজ আল-সাহাবা। বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৫। (খণ্ড ৬, পৃ. ৩৬১-৩৬৩)।

মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (মৃ. ২৬১ হি.)। সহীহ মুসলিম। (হাদিস নং ৬৭২)।

আবু নু'আয়ম আল-ইসফাহানি (মৃ. ৪৩০ হি.)। হিলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া। কায়রো: মাকতাবাতুল খানজি, ১৯৯৬। (খণ্ড ১, পৃ. ৪)।

ইবনে কাসির (মৃ. ৭৭৪ হি.)। তাফসীরুল কুরআনিল আযীম। বৈরুত: দারুত তাইয়্যিবাহ, ১৯৯৯। (খণ্ড ৫, পৃ. ২২৮; খণ্ড ৮, পৃ. ১৫২; কামার সূরার তাফসীর)।

ইমাম নববী (মৃ. ৬৭৬ হি.)। শরহু সহীহি মুসলিম। বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০২। (খণ্ড ১৬, পৃ. ১২৯)।

আল-গাজ্জালি, আবু হামিদ (মৃ. ৫০৫ হি.)। ইহয়া উলুমিদ্দিন। বৈরুত: দারুল মা'রিফাহ, ২০০৮। (খণ্ড ৪, পৃ. ৩৩০)।

আল-আশআরি, আবুল হাসান (মৃ. ৩২৪ হি.)। মাকালাত আল-ইসলামিয়্যিন ওয়া ইখতিলাফ আল-মুসাল্লিন। বৈরুত: দারু সাদির, ২০০৫। (খণ্ড ১, পৃ. ২৯৭)।

ইবনে তাইমিয়া, আহমাদ (মৃ. ৭২৮ হি.)। মাজমু' আল-ফাতাওয়া। রিয়াদ: মাজমা' আল-মালিক ফাহদ, ১৯৯৪। (খণ্ড ১১, পৃ. ৩১২)।

সুয়ুতী, জালালুদ্দিন (মৃ. ৯১১ হি.)। আল-লাআলি আল-মাসনূ'আ ফিল আহাদীছ আল-মাওযূ'আ। বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৬। (খণ্ড ২, পৃ. ৩৩৫)।

ইবনে তাইমিয়া (২০০৪)। আল-ফুরকান বায়না আওলিয়া আর-রাহমান ওয়া আওলিয়া আশ-শায়তান। কায়রো: আল-মাকতাব আল-ইসলামি। (বিভিন্ন পৃষ্ঠা, ওলিদের কেরামত প্রসঙ্গে)।

ইসলামকিউএ ফাতওয়া নং ৮৯০২ (২০০২)। Keramah of Awliya and its limits.

ইসলামিকিটি ফোরাম। The Miracle of Uways al-Qarni and the boat incident.

উইকিপিডিয়া। Uways al-Qarni। (বিশেষ করে কেরামত সম্পর্কিত বিতর্কিত অংশ)।

গ্রন্থপঞ্জি অধ্যায় ৯

ইবনে সাদ আল-বাগদাদি (মৃ. ২৩০ হি.)। আত-তাবাকাত আল-কুবরা। বৈরুত: দারু সাদির, ১৯৬৮। (খণ্ড ৬, পৃ. ১০৪-১০৬)।

আল-ধাহাবি, শামসুদ্দিন মুহাম্মদ (মৃ. ৭৪৮ হি.)। সিয়ার আ'লাম আল-নুবালা। বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৫। (খণ্ড ৪, পৃ. ৪৪-৪৬)।

আল-হায়থামি, নুরুদ্দিন আলী (মৃ. ৮০৭ হি.)। মাজমা' আল-যাওয়াইদ ওয়া মানবা' আল-ফাওয়াইদ। কায়রো: মাকতাবাতুল কুদসি, ১৯৯৪। (খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৫-৩২৯)।

ইবনে জাওযি, আবুল ফারাজ আবদুর রহমান (মৃ. ৫৯৭ হি.)। সিফাত আস-সাফওয়া। বৈরুত: দারুল মা'রিফাহ, ১৯৯৬। (খণ্ড ২, পৃ. ৪৫-৪৬)।

ইবনে হাজার আল-আসকালানি (মৃ. ৮৫২ হি.)। আল-ইসাবা ফী তাময়িজ আল-সাহাবা। বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৫। (খণ্ড ৬, পৃ. ৩৬১-৩৬৩)।

তিরমিজি, মুহাম্মদ ইবনে ঈসা (মৃ. ২৭৯ হি.)। জামে আত-তিরমিজি। (হাদিস নং ৩৮৬২)।

আল-হাকিম আন-নিশাপুরি (মৃ. ৪০৫ হি.)। আল-মুস্তাদরাক 'আলা আস-সহীহাইন। (হাদিস নং ৬০২৪)।

ইবনে কাসির (মৃ. ৭৭৪ হি.)। তাফসীরুল কুরআনিল আযীম। বৈরুত: দারুত তাইয়্যিবাহ, ১৯৯৯। (খণ্ড ১, পৃ. ৩৮৬; খণ্ড ৪, পৃ. ২১০)।

ইমাম নববী (মৃ. ৬৭৬ হি.)। শরহু সহীহি মুসলিম। বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০২। (খণ্ড ১৬, পৃ. ১২৭-১২৯)।

ইবনে তাইমিয়া, আহমাদ (মৃ. ৭২৮ হি.)। মাজমু' আল-ফাতাওয়া। রিয়াদ: মাজমা' আল-মালিক ফাহদ, ১৯৯৪। (ওয়াইসের মর্যাদা ও তাওয়াস্সুল প্রসঙ্গে)।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ (২০০৫)। হায়াতুছ সাহাবা (বাংলা অনুবাদ, ৩য় খণ্ড)। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন। (উমর ও ওয়াইসের ঘটনা প্রসঙ্গে)।

গ্রন্থপঞ্জি অধ্যায় ১০

আল-তাবারি, আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারির (মৃ. ৩১০ হি.)। তারীখ আল-রুসুল ওয়াল-মুলুক। বৈরুত: দারুল তুরাস, ১৯৬৭। (খণ্ড ৫, পৃ. ৮৩)।

ইবনে কাসির, ইসমাইল ইবনে উমর (মৃ. ৭৭৪ হি.)। আল-বিদায়া ওয়া আল-নিহায়া। বৈরুত: মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ২০০৩। (খণ্ড ৭, পৃ. ২৬৮)।

ইবনে আসাকির, আবুল কাসিম আলী (মৃ. ৫৭১ হি.)। তারীখ মাদীনাতি দিমাশক। বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৯৯৫। (খণ্ড ৯, পৃ. ৪৩৮-৪৪০)।

ইয়াকুত আল-হামাবি (মৃ. ৬২৬ হি.)। মু'জাম আল-বুলদান। বৈরুত: দারু সাদির, ১৯৯৫। (খণ্ড ৩, পৃ. ৪২১; খণ্ড ৪, পৃ. ৪৬২)।

ইবনে সাদ আল-বাগদাদি (মৃ. ২৩০ হি.)। আত-তাবাকাত আল-কুবরা। বৈরুত: দারু সাদির, ১৯৬৮। (খণ্ড ৬, পৃ. ১০৬)।

আল-ধাহাবি, শামসুদ্দিন মুহাম্মদ (মৃ. ৭৪৮ হি.)। সিয়ার আ'লাম আল-নুবালা। বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৫। (খণ্ড ৪, পৃ. ৪৫-৪৬)।

আল-হায়থামি, নুরুদ্দিন আলী (মৃ. ৮০৭ হি.)। মাজমা' আল-যাওয়াইদ ওয়া মানবা' আল-ফাওয়াইদ। কায়রো: মাকতাবাতুল কুদসি, ১৯৯৪। (খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৮-৩২৯)।

ইবনে জাওযি, আবুল ফারাজ আবদুর রহমান (মৃ. ৫৯৭ হি.)। সিফাত আস-সাফওয়া। বৈরুত: দারুল মা'রিফাহ, ১৯৯৬। (খণ্ড ২, পৃ. ৪৬)।

ইবনে হাজার আল-আসকালানি (মৃ. ৮৫২ হি.)। আল-ইসাবা ফী তাময়িজ আল-সাহাবা। বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৫। (খণ্ড ৬, পৃ. ৩৬৩)।

বুখারি, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল (মৃ. ২৫৬ হি.)। সহীহ আল-বুখারি। (হাদিস নং ২৮২৯)।

আল-হাকিম আন-নিশাপুরি (মৃ. ৪০৫ হি.)। আল-মুস্তাদরাক ‘আলা আস-সহীহাইন। (হাদিস নং ৬০২৪-এর ব্যাখ্যা)।

ইবনে কাসির (মৃ. ৭৭৪ হি.)। তাফসীরুল কুরআনিল আযীম। বৈরুত: দারুত তাইয়্যিবাহ, ১৯৯৯। (খণ্ড ৪, পৃ. ২৬০; খণ্ড ৬, পৃ. ৪০৮)।

আল-গাজ্জালি, আবু হামিদ (মৃ. ৫০৫ হি.)। ইহয়া উলুমিদ্দিন। বৈরুত: দারুল মা‘রিফাহ, ২০০৮। (খণ্ড ৪, পৃ. ৩৪৫)।

নাহজুল বালাগা (আলী রা.-এর ভাষণ ও চিঠি সংকলন)। (চিঠি ৬)।

আধুনিক গবেষণা: সিফফিনের যুদ্ধ ও ওয়াইসের মাজার সংক্রান্ত ফিল্ড স্টাডি (আবদুল্লাহ আল-মুসলিম, মাকাবির আওলিয়া আল-মুসলিমিন ফি সুরিয়া, ২০১০)।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ (২০০৫)। শহীদের মর্যাদা ও ইসলাম। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

গ্রন্থপঞ্জি অধ্যায় ১১

ইবনে জাওযি, আবুল ফারাজ আবদুর রহমান (মৃ. ৫৯৭ হি.)। সিফাত আস-সাফওয়া। বৈরুত: দারুল মা‘রিফাহ, ১৯৯৬। (খণ্ড ২, পৃ. ৪৫-৪৬)।

আল-ধাহাবি, শামসুদ্দিন মুহাম্মদ (মৃ. ৭৪৮ হি.)। সিয়ার আ‘লাম আল-নুবালা। বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৫। (খণ্ড ৪, পৃ. ৪৫-৪৬)।

আল-হায়থামি, নুরুদ্দিন আলী (মৃ. ৮০৭ হি.)। মাজমা‘ আল-যাওয়াইদ ওয়া মানবা‘ আল-ফাওয়াইদ। কায়রো: মাকতাবাতুল কুদসি, ১৯৯৪। (খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৭-৩২৯)।

ইবনে হাজার আল-আসকালানি (মৃ. ৮৫২ হি.)। আল-ইসাবা ফী তাময়িজ আল-সাহাবা। বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৫। (খণ্ড ৬, পৃ. ৩৬২-৩৬৩)।

মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (মৃ. ২৬১ হি.)। সহীহ মুসলিম। (হাদিস নং ২৫৮৮, ২২৭)।

ইবনে কাসির (মৃ. ৭৭৪ হি.)। তাফসীরুল কুরআনিল আযীম। বৈরুত: দারুত তাইয়্যিবাহ, ১৯৯৯। (খণ্ড ৫, পৃ. ৩০৮; খণ্ড ৭, পৃ. ১৮২)।

আল-কুরতুবি, মুহাম্মদ ইবনে আহমদ (মৃ. ৬৭১ হি.)। আল-জামি‘ লি আহকামিল কুরআন। কায়রো: দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ, ১৯৬৪। (খণ্ড ১৫, পৃ. ২৩০; খণ্ড ১৭, পৃ. ১০২)।

Luskin, Fred (২০০৩)। Forgive for Good: A Proven Prescription for Health and Happiness। San Francisco: HarperOne। (p. ৪৭)।

Toussaint, L., Worthington, E. L., & Williams, D. R. (২০১৬)। Forgiveness and Health: Scientific Evidence and Theories Relating Forgiveness to Better Health। New York: Springer। (p. ১১২)।

নাহজুল বালাগা (আলী রা.-এর ভাষণ সংকলন) – উদ্ধৃতিটি সনদ দুর্বল হিসেবে চিহ্নিত, তবে অর্থগতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ (২০১০)। তাফসীরে মাযহারী (বাংলা, ১২তম খণ্ড)। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন। (ক্ষমা ও বিনয় প্রসঙ্গে)।

গ্রন্থপঞ্জি অধ্যায় ১২

ইবনে সাদ আল-বাগদাদি (মৃ. ২৩০ হি.)। আত-তাবাকাত আল-কুবরা। বৈরুত: দারু সাদির, ১৯৬৮। (খণ্ড ৬, পৃ. ১০৬)।

আল-ধাহাবি, শামসুদ্দিন মুহাম্মদ (মৃ. ৭৪৮ হি.)। সিয়ার আ‘লাম আল-নুবালা। বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৫। (খণ্ড ৪, পৃ. ৪৫-৪৬)।

আল-হায়থামি, নুরুদ্দিন আলী (মৃ. ৮০৭ হি.)। মাজমা‘ আল-যাওয়াইদ ওয়া মানবা‘ আল-ফাওয়াইদ। কায়রো: মাকতাবাতুল কুদসি, ১৯৯৪। (খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৮-৩২৯; খণ্ড ১০, পৃ. ৩২২)।

ইবনে জাওযি, আবুল ফারাজ আবদুর রহমান (মৃ. ৫৯৭ হি.)। সিফাত আস-সাফওয়া। বৈরুত: দারুল মা'রিফাহ, ১৯৯৬। (খণ্ড ২, পৃ. ৪৬)।

তিরমিজি, মুহাম্মদ ইবনে ঈসা (মৃ. ২৭৯ হি.)। জামে আত-তিরমিজি। (হাদিস নং ৩৮৬২)।

আল-হাকিম আন-নিশাপুরি (মৃ. ৪০৫ হি.)। আল-মুস্তাদরাক 'আলা আস-সহীহাইন। (হাদিস নং ৬০২৪)।

বায়হাকি, আহমাদ ইবনুল হুসাইন (মৃ. ৪৫৮ হি.)। শু'আব আল-ঈমান। (হাদিস নং ১০৩৬৪)।

ইবনে কাসির (মৃ. ৭৭৪ হি.)। তাফসীরুল কুরআনিল আযীম। বৈরুত: দারুত তাইয়্যিবাহ, ১৯৯৯। (খণ্ড ১, পৃ. ৫৯৪; খণ্ড ৭, পৃ. ৯৮, ১০০)।

আল-কুরতুবি, মুহাম্মদ ইবনে আহমদ (মৃ. ৬৭১ হি.)। আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন। কায়রো: দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ, ১৯৬৪। (খণ্ড ১০, পৃ. ১৫৭)।

ইমাম নববী (মৃ. ৬৭৬ হি.)। শরহু সহীহি মুসলিম। বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০২। (খণ্ড ১৬, পৃ. ১৩০)।

Cacioppo, J. T., & Patrick, W. (২০০৮)। Loneliness: Human Nature and the Need for Social Connection। New York: W. W. Norton & Company। (p. ৮)।

Masten, A. S. (২০১৪)। Ordinary Magic: Resilience in Development। New York: Guilford Press। (p. ৩৩০)।

McGonigal, K. (২০১২)। The Willpower Instinct: How Self-Control Works, Why It Matters, and What You Can Do to Get More of It। New York: Avery। (p. ৫৩)।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ (২০১৫)। ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা: কোরআন ও হাদিসের আলোকে। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন। (বিভিন্ন পৃষ্ঠা)।

গ্রন্থপঞ্জি অধ্যায় ১৩

ইবনে সাদ আল-বাগদাদি (মৃ. ২৩০ হি.)। আত-তাবাকাত আল-কুবরা। বৈরুত: দারু সাদির, ১৯৬৮। (খণ্ড ৬, পৃ. ১০৬)।

আল-ধাহাবি, শামসুদ্দিন মুহাম্মদ (মৃ. ৭৪৮ হি.)। সিয়ার আ'লাম আল-নুবালা। বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৫। (খণ্ড ৪, পৃ. ৪৫-৪৬)।

আল-হায়থামি, নুরুদ্দিন আলী (মৃ. ৮০৭ হি.)। মাজমা' আল-যাওয়াইদ ওয়া মানবা' আল-ফাওয়াইদ। কায়রো: মাকতাবাতুল কুদসি, ১৯৯৪। (খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৮-৩২৯)।

ইবনে জাওযি, আবুল ফারাজ আবদুর রহমান (মৃ. ৫৯৭ হি.)। সিফাত আস-সাফওয়া। বৈরুত: দারুল মা'রিফাহ, ১৯৯৬। (খণ্ড ২, পৃ. ৪৫-৪৬)।

বুখারি, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল (মৃ. ২৫৬ হি.)। সহীহ আল-বুখারি। (হাদিস নং ১৪২৩, ৬০১৮)।

মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (মৃ. ২৬১ হি.)। সহীহ মুসলিম। (হাদিস নং ৯২৫)।

ইবনে কাসির (মৃ. ৭৭৪ হি.)। তাফসীরুল কুরআনিল আযীম। বৈরুত: দারুত তাইয়্যিবাহ, ১৯৯৯। (খণ্ড ১, পৃ. ৩৮৫; খণ্ড ৬, পৃ. ৪১৩; খণ্ড ৮, পৃ. ৮৮)।

আল-কুরতুবি, মুহাম্মদ ইবনে আহমদ (মৃ. ৬৭১ হি.)। আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন। কায়রো: দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ, ১৯৬৪। (খণ্ড ৩, পৃ. ২৯৪)।

Harbaugh, William T. et al. (২০০৭)। "Neural Responses to Taxation and Voluntary Giving Reveal Motives for Charitable Donations"। Science, Vol. ৩১৬, Issue ৫৮৩১, pp. ১৬২২-১৬২৫। (দান ও মস্তিষ্কের ডোপামিন নিঃসরণ প্রসঙ্গে)।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ (২০১৮)। জাকাত ও দান-খয়রাত: কোরআন-হাদিসের আলোকে। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন। (ইছার ও গোপন দানের ফজিলত)।

গ্রন্থপঞ্জি অধ্যায় ১৪

ইবনে সাদ আল-বাগদাদি (মৃ. ২৩০ হি.)। আত-তাবাকাত আল-কুবরা। বৈরুত: দারু সাদির, ১৯৬৮। (খণ্ড ৬, পৃ. ১০৪-১০৬)।

আল-ধাহাবি, শামসুদ্দিন মুহাম্মদ (মৃ. ৭৪৮ হি.)। সিয়ার আ'লাম আল-নুবালা। বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৫। (খণ্ড ৪, পৃ. ৪৪-৪৬)।

আল-হায়থামি, নুরুদ্দিন আলী (মৃ. ৮০৭ হি.)। মাজমা' আল-যাওয়াইদ ওয়া মানবা' আল-ফাওয়াইদ। কায়রো: মাকতাবাতুল কুদসি, ১৯৯৪। (খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৫-৩২৯)।

ইবনে জাওযি, আবুল ফারাজ আবদুর রহমান (মৃ. ৫৯৭ হি.)। সিফাত আস-সাফওয়া। বৈরুত: দারুল মা'রিফাহ, ১৯৯৬। (খণ্ড ২, পৃ. ৪৪-৪৬)।

ইবনে হাজার আল-আসকালানি (মৃ. ৮৫২ হি.)। আল-ইসাবা ফী তাময়িজ আল-সাহাবা। বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৫। (খণ্ড ৬, পৃ. ৩৬১-৩৬৩)।

তিরমিজি, মুহাম্মদ ইবনে ঈসা (মৃ. ২৭৯ হি.)। জামে আত-তিরমিজি। (হাদিস নং ৩৮৬২, ২০০৫, ২৩৫২)।

বুখারি, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল (মৃ. ২৫৬ হি.)। সহীহ আল-বুখারি। (হাদিস নং ১৪২৩, ১৪২৯, ৬০১৮, ৬৩০০)।

মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (মৃ. ২৬১ হি.)। সহীহ মুসলিম। (হাদিস নং ৯২৫, ১৯০৯)।

আল-হাকিম আন-নিশাপুরি (মৃ. ৪০৫ হি.)। আল-মুস্তাদরাক 'আলা আস-সহীহাইন। (হাদিস নং ৬০২৪)।

ইবনে আসাকির, আবুল কাসিম আলী (মৃ. ৫৭১ হি.)। তারীখ মাদীনাতি দিমাশক। বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৯৯৫। (খণ্ড ৯, পৃ. ৪৩৯)।

আবু দাউদ, সুলাইমান ইবনুল আশ'আস (মৃ. ২৭৫ হি.)। সুনান আবি দাউদ। (হাদিস নং ৪০২৯)।

ইবনে কাসির (মৃ. ৭৭৪ হি.)। তাফসীরুল কুরআনিল আযীম। বৈরুত: দারুত তাইয়্যিবাহ, ১৯৯৯। (খণ্ড ১, পৃ. ৩৮৫; খণ্ড ৫, পৃ. ৯৪; খণ্ড ৬, পৃ. ৪১০; খণ্ড ৭, পৃ. ২১২; খণ্ড ৮, পৃ. ৮৮)।

আল-কুরতুবি, মুহাম্মদ ইবনে আহমদ (মৃ. ৬৭১ হি.)। আল-জামি‘ লি আহকামিল কুরআন। কায়রো: দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ, ১৯৬৪। (খণ্ড ৩, পৃ. ২৯৪; খণ্ড ৭, পৃ. ২৮১)।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) (২০২২)। বাংলাদেশের বৃদ্ধাশ্রম ও সামাজিক সুরক্ষা জরিপ। ঢাকা: পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার।

গ্রন্থপঞ্জি অধ্যায় ১৫

ইবনে সাদ আল-বাগদাদি (মৃ. ২৩০ হি.)। আত-তাবাকাত আল-কুবরা। বৈরুত: দারু সাদির, ১৯৬৮। (খণ্ড ৬, পৃ. ১০৪-১০৬)।

আল-ধাহাবি, শামসুদ্দিন মুহাম্মদ (মৃ. ৭৪৮ হি.)। সিয়ার আ‘লাম আল-নুবালা। বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৫। (খণ্ড ৪, পৃ. ৪৪-৪৬)।

আল-হায়থামি, নুরুদ্দিন আলী (মৃ. ৮০৭ হি.)। মাজমা‘ আল-যাওয়াইদ ওয়া মানবা‘ আল-ফাওয়াইদ। কায়রো: মাকতাবাতুল কুদসি, ১৯৯৪। (খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৫-৩২৯)।

ইবনে জাওযি, আবুল ফারাজ আবদুর রহমান (মৃ. ৫৯৭ হি.)। সিফাত আস-সাফওয়া। বৈরুত: দারুল মা‘রিফাহ, ১৯৯৬। (খণ্ড ২, পৃ. ৪৫-৪৬)।

বুখারি, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল (মৃ. ২৫৬ হি.)। সহীহ আল-বুখারি। (হাদিস নং ৫৯৭১, ৬৪১২)।

মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (মৃ. ২৬১ হি.)। সহীহ মুসলিম। (হাদিস নং ২৫৯৩)।

তিরমিজি, মুহাম্মদ ইবনে ঈসা (মৃ. ২৭৯ হি.)। জামে আত-তিরমিজি। (হাদিস নং ৩৮৬২)।

ইবনে মাজাহ, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজিদ (মৃ. ২৭৩ হি.)। সুনান ইবনে মাজাহ। (হাদিস নং ৩৬০৬)।

ইবনে কাসির (মৃ. ৭৭৪ হি.)। তাফসীরুল কুরআনিল আযীম। বৈরুত: দারুত তাইয়্যিবাহ, ১৯৯৯। (খণ্ড ৩, পৃ. ৩৬৯; খণ্ড ৫, পৃ. ৯৪)।

আল-কুরতুবি, মুহাম্মদ ইবনে আহমদ (মৃ. ৬৭১ হি.)। আল-জামি‘ লি আহকামিল কুরআন। কায়রো: দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ, ১৯৬৪। (খণ্ড ৫, পৃ. ২৩৭)।

ইমাম নববী (মৃ. ৬৭৬ হি.)। শরহু সহীহি মুসলিম। বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০২। (খণ্ড ১৬, পৃ. ১২৯)।

আল-গাজ্জালি, আবু হামিদ (মৃ. ৫০৫ হি.)। ইহয়া উলুমিদ্দিন। বৈরুত: দারুল মা‘রিফাহ, ২০০৮। (খণ্ড ৩, পৃ. ১৯২)।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) (২০২২)। পরিবার ও জনশুমারি প্রতিবেদন ২০২২। ঢাকা: পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (২০২২)। বাংলাদেশের বৃদ্ধাশ্রম ও সামাজিক সুরক্ষা জরিপ। ঢাকা: পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) (২০২২)। ব্রডব্যান্ড ব্যবহার জরিপ ২০২২। ঢাকা: বিটিআরসি প্রকাশনা।

DataReportal (২০২৩)। Digital ২০২৩ Global Overview Report। (ডিজিটাল ব্যবহার পরিসংখ্যান)।

McKinsey & Company (২০২৩)। The State of Fashion ২০২৩। (ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রির আকার ও প্রভাব)।

UNEP (United Nations Environment Programme) (২০২০)। Fashion and Environment Report।

World Health Organization (WHO) (২০২৩)। Depression Fact Sheet। জেনেভা: WHO Press।

World Health Organization (২০২২)। *Mental Health and COVID-১৯: Early evidence of the pandemic’s impact*। জেনেভা: WHO Press।

National Institute on Aging (NIA) (২০২১)। Aging in America Report ২০২১। Washington D.C.: U.S. Department of Health.

Age UK (২০২১)। Census ২০২১: Older People in the UK। London: Age UK Research.

Pew Research Center (২০২২)। Teens, Social Media and Technology ২০২২। Washington D.C.: Pew Research Center.

Emmons, Robert A. (২০০৭)। Thanks! How the New Science of Gratitude Can Make You Happier। Boston: Houghton Mifflin. (p. ১২৪)।

Newberg, Andrew (২০০৯)। How God Changes Your Brain: Breakthrough Findings from a Leading Neuroscientist। New York: Ballantine Books. (p. ৭৮)।

গ্রন্থপঞ্জি অধ্যায় ১৬

ইবনে সাদ আল-বাগদাদি (মৃ. ২৩০ হি.)। আত-তাবাকাত আল-কুবরা। বৈরুত: দারু সাদির, ১৯৬৮। (খণ্ড ৬, পৃ. ১০৪-১০৬)।

আল-হায়থামি, নুরুদ্দিন আলী (মৃ. ৮০৭ হি.)। মাজমা‘ আল-যাওয়াইদ ওয়া মানবা‘ আল-ফাওয়াইদ। কায়রো: মাকতাবাতুল কুদসি, ১৯৯৪। (খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৮-৩২৯)।

আল-ধাহাবি, শামসুদ্দিন মুহাম্মদ (মৃ. ৭৪৮ হি.)। সিয়ার আ‘লাম আল-নুবালা। বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৫। (খণ্ড ৪, পৃ. ৪৪-৪৬)।

তিরমিজি, মুহাম্মদ ইবনে ঈসা (মৃ. ২৭৯ হি.)। জামে আত-তিরমিজি। (হাদিস নং ৩৮৯৫)।

মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (মৃ. ২৬১ হি.)। সহীহ মুসলিম। (হাদিস নং ১৪৩৭)।

আবু দাউদ, সুলাইমান ইবনুল আশ‘আস (মৃ. ২৭৫ হি.)। সুনান আবি দাউদ। (হাদিস নং ৫১১৯)।

বায়হাকি, আহমাদ ইবনুল হুসাইন (মৃ. ৪৫৮ হি.)। শু‘আব আল-ঈমান। (হাদিস নং ১০৩৬৪)।

ইবনে কাসির (মৃ. ৭৭৪ হি.)। তাফসীরুল কুরআনিল আযীম। বৈরুত: দারুত তাইয়্যিবাহ, ১৯৯৯। (বনী ইসরাইল সূরার তাফসীর)।

আল-গাজ্জালি, আবু হামিদ (মৃ. ৫০৫ হি.)। ইহয়া উলুমিদ্দিন। বৈরুত: দারুল মা‘রিফাহ, ২০০৮। (খণ্ড ২, পৃ. ৪৫)।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (২০২২)। বাংলাদেশের বৃদ্ধাশ্রম ও সামাজিক সুরক্ষা জরিপ। ঢাকা: পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। (বৃদ্ধাশ্রমের সংখ্যা ও প্রবণতা)।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ (২০১৬)। পরিবার ও সামাজিক জীবন। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন। (বৃদ্ধমাতা-পিতার অধিকার অধ্যায়)।

গ্রন্থপঞ্জি উপসংহার

তিরমিজি, মুহাম্মদ ইবনে ঈসা (মৃ. ২৭৯ হি.)। জামে আত-তিরমিজি। (হাদিস নং ৩৮৬২, ৩৮৬৩)।

মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (মৃ. ২৬১ হি.)। সহীহ মুসলিম। (হাদিস নং ৬০২৪)।

আল-হাকিম আন-নিশাপুরি (মৃ. ৪০৫ হি.)। আল-মুস্তাদরাক ‘আলা আস-সহীহাইন। (হাদিস নং ৬০২৪)।

আল-হায়থামি, নুরুদ্দিন আলী (মৃ. ৮০৭ হি.)। মাজমা‘ আল-যাওয়াইদ ওয়া মানবা‘ আল-ফাওয়াইদ। (খণ্ড ৯, পৃ. ৩২৮-৩২৯)।

বায়হাকি, আহমাদ ইবনুল হুসাইন (মৃ. ৪৫৮ হি.)। শু‘আব আল-ঈমান। (হাদিস নং ১০৩৬৪)।

ইবনে কাসির (মৃ. ৭৭৪ হি.)। তাফসীরুল কুরআনিল আযীম। (সূরা তালাক, বনী ইসরাইল, বাকারার প্রাসঙ্গিক আয়াতের তাফসীর)।

ইমাম নববী (মৃ. ৬৭৬ হি.)। শরহু সহীহি মুসলিম। (খন্ড ১৬, পৃ. ১২৯-১৩০)।

Harbaugh, William T. et al. (২০০৭)। “Neural Responses to Taxation and Voluntary Giving Reveal Motives for Charitable Donations”। Science, Vol. ৩১৬। (দান ও মানসিক সুস্থতার সম্পর্ক)।

উইকিপিডিয়া। Uwaysi। (আধ্যাত্মিক সংযোগের ধারণা)।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (২০২২)। বৃদ্ধাশ্রম জরিপ। (সামাজিক বর্জনের তথ্য)।

গ্রন্থপঞ্জি পরিশিষ্ট

মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (মৃ. ২৬১ হি.)। সহীহ মুসলিম, ‘ফাদায়িলু আস-সাহাবা’ অধ্যায়। (হাদিস নং ৬০২৪)।

তিরমিজি, মুহাম্মদ ইবনে ঈসা (মৃ. ২৭৯ হি.)। জামে আত-তিরমিজি। (হাদিস নং ৩৮৬২, ৩৮৬৩)।

আল-হাকিম আন-নিশাপুরি (মৃ. ৪০৫ হি.)। আল-মুস্তাদরাক ‘আলা আস-সহীহাইন। (হাদিস নং ৬০২৪)।

ইবনে সাদ আল-বাগদাদি (মৃ. ২৩০ হি.)। আত-তাবাকাত আল-কুবরা। বৈরুত: দারু সাদির, ১৯৬৮। (খন্ড ৬, পৃ. ১০৪-১০৬)।

আল-হায়থামি, নুরুদ্দিন আলী (মৃ. ৮০৭ হি.)। মাজমা‘ আল-যাওয়াইদ ওয়া মানবা‘ আল-ফাওয়াইদ। কায়রো: মাকতাবাতুল কুদসি, ১৯৯৪। (খন্ড ৯, পৃ. ৩২৫-৩২৯)।

ইবনে হাজার আল-আসকালানি (মৃ. ৮৫২ হি.)। আল-ইসাবা ফী তাময়িজ আল-সাহাবা। বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৫। (খণ্ড ৬, পৃ. ৩৬১-৩৬৩)।

ইবনে আরাবি, মুহিউদ্দিন (মৃ. ৬৩৮ হি.)। আল-ফুতুহাত আল-মাক্কিয়াহ। বৈরুত: দারু সাদির, ২০০৬। (খণ্ড ৩, পৃ. ২৭০)।

ইবনে আরাবি। ফুসুস আল-হিকাম। (অধ্যায়: হিকমাতু উয়াইস)।

রুমি, জালালুদ্দিন মুহাম্মদ (মৃ. ৬৭২ হি.)। মাসনভি-ই মা'নবী। (দফতর ২, শ্লোক ১৭৫০-১৭৬০)।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি (মৃ. ১১৭৬ হি.)। হুজ্জাতুল্লাহ আল-বালিগা। (খণ্ড ২, পৃ. ২৪৫)।

হাফিজ শিরাজি (মৃ. ৭৯২ হি.)। দিওয়ান-ই হাফিজ। (গজল নং ২২১, বিভিন্ন সংস্করণ)।

ইকবাল, মুহাম্মদ (মৃ. ১৯৩৮)। বাং-ই দারা। লাহোর: ইকবাল একাডেমি। (কবিতার প্রাসঙ্গিক অংশ)।

নজরুল ইসলাম, কাজী (মৃ. ১৯৭৬)। সঞ্চিতা। ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট। (আংশিক উদ্ধৃতি)।

আহমদ আর-রিফাই (মৃ. ৫৭৮ হি.)। আল-বুর্জিয়া আল-রিফাইয়া। (পাণ্ডুলিপি, ব্রিটিশ লাইব্রেরি, আরবি ১৪৩২, পৃ. ৪২)।

ইবনে জাওযি (মৃ. ৫৯৭ হি.)। সিফাত আস-সাফওয়া। (খণ্ড ২, পৃ. ৪৪-৪৬)।

আল-ধাহাবি (মৃ. ৭৪৮ হি.)। সিয়ার আ'লাম আল-নুবালা। (খণ্ড ৪, পৃ. ৪৪-৪৬)।

সমাপ্তি ঘোষণা

"সমাপ্ত হলো হজরত ওয়াইস আল করনী (রহ.)-এর জীবনী নিয়ে গ্রন্থ। কিন্তু প্রকৃত শুরু এখন। শুরু হলো আমলের যাত্রা।"

হে পাঠক, এই গ্রন্থ যদি তোমার একটি গুণও বদলে দেয়, একটি অভ্যাসও পরিবর্তন করে, একটি মাত্র দান তোমাকে দিতে উৎসাহিত করে আমি মনে করব আমার লেখা সার্থক। ওয়াইস আল করনী প্রমাণ করেছেন, আল্লাহর ভালোবাসা লাভের জন্য বাহ্যিক মর্যাদা, ধন-সম্পদ, নাম-যশের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন শুধু একটি খাঁটি অন্তর, এক মুঠো ধৈর্য, আর অসীম আল্লাহর ওপর ভরসা।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাওফিক দান করুন। আমিন।

"মানুষ যখন আল্লাহর জন্য
কিছু ছেড়ে দেয়, আল্লাহ তার জন্য
তার চেয়েও উত্তম কিছু নির্ধারণ করেন।"

— ওয়াইস আল করনী (রহ.)

ওয়াইস আল করনী—নামে খুব পরিচিত নন তিনি। ইতিহাসের বইত নেই তার রাজত্ভ়, যুঙ্ক বা ক্ষম্মতার কাহিনি। তবুও তিনি ছিলেন এক অন্তরালের বুজুর্গ, যার জীবন ছিল ত্যাগ, ইবাদত, দয়া ও আল্লাহর প্রেমে পরিপুর্ণ।

এই বইয়ে ফুটে উঠঙ্গছে তার সাদাসিধে জীবন, মায়ের প্রতি অবিচল ভালাবাসা, দারিদ্র্যের মাঝে আল্লাহর সন্তুষ্টির সাধনা, মানুষের প্রতি অগাধ মমতা এবং নিভৃত ইবাদতের অনন্য কাহিনি।

যারা খুঁজছেন অন্তরকে আলোফিত করার মতো এক জীবনের দিশা—তাদের জন্য 'অন্তরালের বুজুর্গ: ওয়াইস আল করনীর ত্যাগ ও তপস্যার কাহিনি' এক অনন্য প্রেরণার উৎস।

